Social Engineering Series - Book 11

আমাদের মুসলিম পরিবারের ছেলেমেয়েরা কেন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে

(সমস্যা ও সমাধান)

আমির জামান

নাজমা জামান

সম্পাদনা পরিষদ

ড. কায়সার মামুন
শিক্ষামুলক ইসলামি গবেষক
সিংগাপুর

মেরিনা সুলতানা
আরলি চাইল্ডহুড এডুকেটর
ক্যানাডা

আব্দুর রাজ্জাক মিয়া
মমতাজুল মুহাদ্দিসীন (এম.এম)
সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা, সিলেট

জাবেদ মুহাম্মাদ
গবেষক, ইউনিভার্সিটি অব রেজাইনা
ক্যানাডা

আলী আকবর
শিক্ষামুলক ইসলামি গবেষক
আমেরিকা

ড. জাকারিয়া আমিন
ইসলামিক গবেষক
অস্ট্রেলিয়া

Published by
Institute of Social Engineering, Canada
www.isecanada.org

আমাদের মুসলিম পরিবারের ছেলেমেয়েরা কেন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে?

যোগাযোগ	আমির জামান নাজমা জামান 647-280-9835 (টরন্টো, ক্যানাডা) ইমেইল ঃ amiraway@hotmail.com www.themessagecanada.com

১ম প্রকাশ	জুলাই ২০১৩

© কপিরাইট	আই.এস.ই, ক্যানাডা

প্রাপ্তিস্থান	ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ১৫৪ ক, পিসি কালচার হাউজিং শ্যামলী, ঢাকা ০১৭১২৮৪৬১৬৪ আল মারুফ পাবলিকেশনস কাটাবন মসজিদ, ঢাকা ০২৯৬৭৩২৩৭, ০১৯১৩৫১০৯৯১ টরন্টো ইসলামিক সেন্টার ৫৭৫ ইয়াং স্ট্রিট, টরন্টো ৬৪৭-৩৫০-৪২৬২
মূল্য	দুইশত টাকা ৭ ডলার
Printed in	Canada

কেন এই বই?

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁরই সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বাংলাদেশের নাগরিকদের ৮৩% মুসলিম, বাকি ১৭% হিন্দু-বৌদ্ধ ও খৃষ্টান। স্পষ্টতঃই বাংলাদেশ একটা মুসলিম-প্রধান দেশ। মুসলিমরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী, তাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে আল-কুরআন যা রসূল মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর আল্লাহ নাযিল করেছিলেন আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে (৬১০-৬৩২ খৃষ্টাব্দে)। সেই আসমানী কিতাব আজো অবিকৃত, অপরিবর্তিত রয়ে গেছে আল্লাহরই সংরক্ষণে। তদুপরি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সহীহ হাদীসসমূহও সংরক্ষিত আছে। মূল ভাষা আরবী থেকে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় অনুবাদও হয়েছে সেসব কিতাব যা দেশের বা বিদেশের যে কোন বুক-ষ্টোরে কিনতে পাওয়া যায়। এখন প্রয়োজন শুধু সেগুলো সংগ্রহ করে পড়া এবং তাতে বর্ণিত আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চলে ইসলামি জীবনযাপন করা।

এখন ইনফর্মেশন টেকনলজির যুগ, ইসলামকে জানার জন্য তথ্যের কোন অভাব নেই। এখন দরকার শুধু সদিচ্ছা ও ইসলামকে জানার জন্যে আন্তরিক চেষ্টা। এতসব resources হাতের নাগালে থাকা সত্ত্বেও দেশে এবং বিদেশে বাংলাভাষী মুসলিম পরিবারগুলোতে হাহাকার -- তাদের ছেলেমেয়েরা ইসলাম ধর্ম-বিরোধী কার্যকলাপ করে যাচ্ছে, সলাত আদায় করছে না, সিয়াম পালন করছে না, হারাম-হালাল বেছে চলছে না, মা-বাবার কথা মানছে না, কুরআন-হাদীস-আল্লাহ-রসূল-হিজাব-দাড়ি-টুপি ইত্যাদি নিয়ে জনসমক্ষে ও টিভি-ইন্টারনেটে আপত্তিকর বিরূপ মন্তব্য অবলিলায় করে যাচ্ছে।

আমরা দেশে ও বিদেশে ইসলাম-বিরোধী মনোভাব ও কর্মকাণ্ডের কারণ অন্বেষণ করে যেসব বাস্তব তথ্য উদ্ধার করতে পেরেছি তাই অতি সংক্ষিপ্ত আকারে এই বইটাতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তবে বিষয়টা এমন নয় যে আমরা সব নূতন বা অজানা কথা বলতে বসেছি। না, তা নয়। আমরা চেষ্টা করেছি ইসলাম-বিদ্বেষী ও ইসলাম-বিরোধী শক্তিগুলোকে চিহ্নিত করে বাস্তব পরিস্থিতির দিকে মুসলিম সমাজের, বিশেষ করে প্রত্যেক পরিবারের মুসলিম মাতাপিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। কারণ আমরা দেখতে পেয়েছি যে আসলে আমাদের গোড়াতেই গলদ রয়েছে, সমাজ গঠনের মূল ভূমিকা পালন করে থাকে যে পরিবার সেই পরিবারেই আজ ইসলাম অনুপস্থিত-- সেখানে সলাত-সিয়াম-

কুরআন-হাদীস পাঠ, ইসলামের চর্চা, হারাম-হালাল বেছে চলা, নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনী পড়া, ইসলামি বইপত্র-ডিভিডি ইত্যাদি দেখা কোন গুরুত্ব পায় না বললেই চলে। পরিবারের সন্তানদের শিশুকাল থেকেই ইসলামকে জানার কোন সুযোগ সৃষ্টি করা হয় না। তারা জানতেই পারে না ইসলাম কী অথবা মুসলিম বলতে কী বোঝায়। তাহলে তারা কী শিখে বেড়ে উঠছে?

তারা তাদের বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সংগে বসে দিনরাত টিভি-ইন্টারনেটে ইসলামি আকীদা ও ঈমান ধ্বংসকারী কুরুচিপূর্ণ মুভি ও সিরিয়াল, নাটক-সিনেমা, নারীপুরুষের সম্মিলিত হৈ হল্লাপূর্ণ নাচগান, যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা ও অশ্লীলতাপূর্ণ commercials দেখে। এবং এসব দেখে দেখেই ওরা বড় হয়। ওরা 31st December night, Valentine's Day, পহেলা বৈশাখে ইত্যাদি ইসলাম পরিপন্থি অনুষ্ঠান নিয়ে মেতে থাকে। ঘরের বাইরে স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতেও সম্পূর্ণরূপে ইসলামবিহীন পরিবেশে সময় কাটায়। ইসলামি শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী ও পরিপন্থী মানসিকতা তাদের মাঝে পাকাপোক্তভাবে আসন গেঁড়ে বসে। স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীতে প্রকৃত ইসলামি শিক্ষা অনুপস্থিত। দেশে-বিদেশে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরাও জ্ঞাতসারে ইন্ধন জোগাচ্ছে তাদের ইসলাম-বিরোধী কবিতায়, গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে এবং ভাষণে।

চতুর্দিকে এই ইসলাম-বিরোধী প্রচারণার সর্বগ্রাসী আক্রমনে দিশেহারা আজ মুসলিম শিশু-যুবক ও এমনকি বয়স্করাও। সব অনাচারই আজ গ্রহণযোগ্য, এমন কি সমকামিতা, অবিবাহিত নারীপুরুষের একসাথে অবৈধ বসবাস, মদ খাওয়া, নেশা করা, বিবাহবহির্ভূত দৈহিক মিলন ইত্যাদি কোন কিছুই আর মুসলিমদের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে না!

অথচ ইসলামি আকীদা অনুসারে এসব হচ্ছে নিকৃষ্ট, জঘন্য গুনাহের কাজ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শিক্ষার (কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষার) সম্পূর্ণ বিরোধী, কঠিন শাস্তিযোগ্য গুনাহ। অথচ মুসলিমদের নীরবতা দেখেশুনে মনে হয় মুসলিম সমাজ-ই যেন মৃত্যুকে ভুলে গেছে, আখিরাতের শাস্তিকে তারা আর ভয় করে না, এই দুনিয়ার জীবনের কদর্য্য সুখ-বিলাসকেই তারা একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করেছে। শয়তান তাদের বিবেককে গ্রাস করে নিয়ে সব অনাচার ও পাপকে তাদের সামনে গ্রহণযোগ্য করে তুলছে। শিরক-বিদ'আতের মন কঠিন গুনাহ করতেও অদ্রনকের বুক কাপে না। তাগুতের ইবাদতে যেন সবাই আজ মগ্ন!

মুসলিম সমাজকে, তাদের দোষ-ক্রটি ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের এই বই প্রকাশ করছি। আমরা নারী-পুরুষ ও যুবক-যুবতী সকলকে ইসলামের শান্তিময় ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছি। প্রত্যেক পরিবারের পিতামাতাকে অনুরোধ জানাচ্ছি ইসলামকে ভালোমত জানার এবং নিজেদের সন্তানদের সহীহ ইসলামে দীক্ষা দেয়ার জন্যে। তা না করলে হাশরের দিনে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে, এবং সেটা হবে একটা ভীষণ কঠিন পরীক্ষা। আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের দিকে সকলকে দাওয়াত দিচ্ছি। এখনো সময় আছে সজাগ হওয়ার, তাওবা করে আল্লাহর ক্ষমা লাভের।

আমরা স্বপরিবারে বার বছর যাবত স্থায়ীভাবে ক্যানাডায় বসবাস করছি। আমরা কোন কবি বা সাহিত্যিক নই, আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জন মূলতঃ IT Professionals, আমাদের লেখা বইগুলোতে ভাষাগত দুর্বলতা থাকাটা খুব স্বাভাবিক। তবে এই বইটিতে অনেক কথাই এসেছে যা সরাসরি বাস্তব জীবন থেকে নেয়া, দীর্ঘ গবেষণার পরে তা এই বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। এই বইটিতে কোন theoretical কথা বলা হয়নি, বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে একের পর এক ঘটনা তুলে ধরে সব সমস্যার একটি সঠিক ও বাস্তবসম্মত সমাধান বের করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন, আ-মী-ন। সকল ভুলক্রটি ফোনে অথবা ইমেইলে জানালে তা আগামী সংস্করনে প্রতিফলিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

আমির জামান
নাজমা জামান
647-280-9835
Toronto, Canada
amiraway@hotmail.com

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

হে ঈমানদারগণ!
তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।
(সূরা আত তাহরীম ঃ ৬)

মুসলিম পরিবারের ছেলেমেয়েরা কেন নাস্তিক বা ইসলাম-বিদ্বেষী হচ্ছে? কেনইবা নন-প্র্যাক্টিসিং মুসলিম হচ্ছে?

হ্যাম্‌লিনের বংশীবাদকের মতো কেউ কি আমাদের বাংলাদেশের মুসলিম ঘরের ছেলেমেয়েদেরকে মোহগ্রস্ত করে দিন-দিন ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ইসলাম-বিদ্বেষী করে তুলছে, নাস্তিক বানিয়ে ফেলছে! এর রহস্যটা কী?

সূচীপত্র

আমরা কি চাই

- 🕮 আমরা কি চাই আমার সন্তান একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হোক?
- 🕮 আমরা কি চাই আমার সন্তানের অন্তরে সৎগুণাবলীর সমাবেশ ঘটুক?
- 🕮 আমরা কি চাই আমার সন্তানেরা দুনিয়া এবং আখিরাত দুই দিকেই সফলতা অর্জন করুক?

আসুন আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি

- ✍ আমাদের সন্তানের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী হবে?
- ✍ তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কী হবে?
- ✍ কোন ভাবাদর্শে আমরা তাকে গড়ে তুলবো?
- ✍ কোন মৌলিক উপাদান দিয়ে তার চিন্তা চেতনা গড়ে তুলবো?

এ যুগের
ছেলেমেয়েদের মানসিকতা

১. এখনকার ছেলেমেয়েরা বাবা-মার চেয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সিদ্ধান্তকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

২. এখন তারা ইন্টারনেটকেই সকল বিনোদনের উৎস বলে মনে করে।

৩. বলিউড-হলিউডকে সকল বিনোদনের প্রধান উৎস বলে মনে করে।

৪. টিভি চ্যানেলগুলোকে একমাত্র সুস্থ স্বাভাবিক শিক্ষার উৎস বলে মনে করে।

৫. আমেরিকান আইডল আর ইন্ডিয়ান আইডলকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্যই দর্শনীয় অনুষ্ঠান বলে মনে করে।

৬. ইউরোপ আমেরিকাকে সভ্যতা আর মানবাধিকারের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত তীর্থস্থান বলে মনে করে।

৭. তারা ফ্যাশন শোতে অংশগ্রহণ এবং মডেল হওয়াকে খুব গর্বের কাজ মনে করে।

৮. তারা ইসলামকে টেররিজম ভাবে, এবং ইসলাম পালন করাকে ব্যাকডেইটেড বা অপশনাল বলে মনে করে।

৯. তারা ব্যন্ড মিউজিক এবং হ্যাভিমেটাল মিউজিককে ইবাদত বলে মনে করে।

১০. তারা বিভিন্ন স্টারকে ফলো করে এবং তাদেরকে গুরু বলে মনে করে।

১১. তারা উল্টা-পাল্টা কাজ করাকে আধুনিকতা বলে মনে করে।

১২. তারা আল্লাহ, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং ইসলামকে অবমাননা করাটাকে আধুনিকতা বলে মনে করে।

১৩. তারা নাস্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকা, নেতা-নেত্রী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, নাট্যকার, গায়ক-গায়িকা, কবি-সাহিত্যিক, বাউল-সন্নাসীদেরকেই বেশী অনুসরণ করতে পছন্দ করে।

১৪. তারা শবে কদর-এর রাত্রির চাইতেও 31st December night-কে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

১৫. তারা Happy New Year, পহেলা বৈশাখ এবং Valentine’s Day পালন করা জরুরী বলে মনে করে।

আল কুরআনে
ইবলীস শয়তানের ঘোষণা

আল্লাহকে উদ্দেশ করে ইবলীস [শয়তান] বলল ঃ আমি এদের (মানব জাতির) সামনে থেকে আসবো, পিছন থেকে আসবো, ডান দিক থেকে আসবো, বাম দিক থেকে আসবো এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না। (সূরা আরাফ ৭ ঃ

সে [শয়তান] বলল ঃ হে আমার রব! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন তারজন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকাজকে শোভনীয় করে তুলবো এবং আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করবো। (সূরা হিজর ১৫ ঃ ৩৯)

সে [শয়তান] বলল ঃ আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবো, তবে ওদের মাঝে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের নয়'। (সূরা সা'দ ৩৮ ঃ ৮২-৮৩)

কিন্তু
মহান আল্লাহ বলছেন

হে মু'মিনগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবিষ্ট হও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।
(সূরা আল বাকারা ২ ঃ ২০৮)

মুসলিম কাকে বলে?

মানব শিশু মানুষই হয়, গরু বা ছাগল হয় না। কিন্তু একজন শিক্ষকের ছেলে কি জন্মগতভাবেই শিক্ষক হতে পারে? না। কারণ শিক্ষকতার জন্য যেসব গুণ থাকা দরকার তা অর্জন না করলে শিক্ষক হওয়া যায় না। মুসলিম পরিচয়টাও একটা গুণ। এটা জন্মগত কোন গুণ নয় বরং এটা চেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। প্রত্যেক গুণই অর্জন করতে হয়। নবীর ঘরে জন্ম নিয়েও নূহ (আলাইহিস সালাম)–এর ছেলে কাফির হয়েছিল। কারণ মুসলিম হবার গুণ সে অর্জন করেনি। তাই বুঝতে হবে যে কী কী গুণ থাকলে মুসলিম হিসেবে গণ্য হওয়া যায়।

ইসলাম শব্দটি আরবি। আমাদের দেশে মুসলমান শব্দটাই বেশী চালু। এ শব্দটি ফার্সী ভাষা থেকে এসেছে। ইসলাম শব্দ থেকেই মুসলিম শব্দটি এসেছে। যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তাকেই মুসলিম বলে। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ। নিজের খেয়াল খুশী ও প্রবৃত্তির মর্জি মতো না চলে যে আল্লাহর মর্জি ও পছন্দের নিকট আত্মসমর্পণ করে তারই পরিচয় হলো মুসলিম। এখন চিন্তা করি যে, আমরা যদি মুসলিম হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে চাই তাহলে আমাদের কী কী গুণ অর্জন করতে হবে।

প্রথমত ঃ আমাকে জানতে হবে যে, ইসলাম কী ?

দ্বিতীয়ত ঃ আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমি ইসলামকে মেনে চলতে প্রস্তুত আছি কিনা।

তৃতীয়ত ঃ ইসলামকে মেনে চলতে চাইলে সব ব্যাপারেই আল্লাহ ও রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদেশ নিষেধ কী তা জানতে হবে এবং তা পালন করে চলতে হবে।

আমি কি ইসলাম মেনে চলতে বাধ্য?

উপরে যে ৩টি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা অর্জন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বাধ্য করেন না। স্বাধীনভাবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার মানুষকে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

"বস্তুতঃ আমি তাকে (মানুষকে) দু'টি পথ [সরল পথ ও পাপের পথ] প্রদর্শন করেছি।" (সূরা আল-বালাদ ঃ ১০)

যদি কেউ ইসলামকে কবুল করতে না চায় তাহলে বুঝা গেল যে, সে নিজেকে মুসলিম বলে গণ্য করতে চায় না এবং সে আল্লাহ ও রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশ-নিষেধ পূর্ণভাবে পালন করতে রাযী নয়।

মানুষের এ স্বাধীন ইচ্ছার কারণেই সে মুসলিম হিসেবে চলার সিদ্ধান্ত নিলে আল্লাহর কাছে পুরষ্কার পাবে, আর অন্য সিদ্ধান্ত নিলে শাস্তি পাবে। এটা তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত। আল্লাহ তাকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেননি।

আমি কী সিদ্ধান্ত নেবো?

গতানুগতিকভাবে আমি নিজেকে যতই মুসলিম বলে মনে করি না কেন, ব্যাপারটা কিন্তু সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার বিষয়। যদি মুসলিম হিসেবেই জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নিতে চাই তাহলে ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে এবং মেনে চলার জন্য মনের দিক দিয়ে প্রস্তুত হতে হবে। এ মানসিক প্রস্তুতির নামই ঈমান। যখন নিজের মধ্যে ঈমান তৈরি হবে তখন আল্লাহ ও রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা কঠিন মনে হবে না।

সুতরাং নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করি যে, এ বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেবো? আমি কি কুরআনের কিছু অংশ মানবো আর কিছু অংশ মানবো না? আসুন দেখি এ ব্যাপারে আল্লাহ কী বলেছেন ঃ

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

"তোমরা কি কুরআনের কিছু অংশ মান আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এরূপ আচরণ হবে তাদের এছাড়া আর কী শাস্তি হতে পারে যে তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ অবগত আছেন।" (সূরা আল বাকারা ঃ ৮৫)

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এতটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে - তাদের পরীক্ষা নেয়া হবে না?

(সূরা আনকাবুত ঃ ২)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে পৌঁছে যাবে? (সূরা বাকারা ঃ ২১৪)

ইসলাম মানে কী?

প্রত্যেক সৃষ্টির কল্যাণের উদ্দেশ্যে তার জন্য সবচেয়ে উপযোগী বিধানই স্রষ্টা দিয়েছেন। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, গাছ-পালা, নদী-নালা, আকাশ-বাতাস, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ সকলেরই জন্য রচিত বিধান মেনে চলা বা না চলার কোনো অধিকার তাদেরকে দেননি। তিনি নিজেই সব বিধান সব সৃষ্টির উপর চালু করে দিয়েছেন। ঐসব বিধান নবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়নি, আল্লাহ নিজেই জারী করেছেন।

মানুষের দেহের জন্যও যেসব বিধান দরকার তাও নবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়নি। রক্ত চলাচলের নিয়ম, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের বিধি এবং অন্যান্য যাবতীয়

বিধান আল্লাহ নিজেই চালু করে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষের নৈতিক জীবনের সকল বিধি-বিধান, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ বিচার করে মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তুলবার জন্য যে জীবনবিধান প্রয়োজন তা-ই নবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। এসব মেনে চলার জন্য বাধ্য করা হয়নি। আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

"তোমরা কী আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করতে চাও? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তাঁরই আনুগত্য করে যাচ্ছে। আর সকলেই তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।"

(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩)

সুতরাং সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার রচিত বিধানই হলো ইসলাম। যে সৃষ্টির জন্য যে বিধান তা-ই ঐ সৃষ্টির ইসলাম। মানুষের উপযোগী যে বিধান তা-ই মানুষের ইসলাম। মানুষের দেহসহ সকল সৃষ্টির ইসলামই বাধ্যতামূলক এবং তার জন্য নবীর দরকার হয়নি। কিন্তু ভাল-মন্দ পার্থক্য করার মতো বুদ্ধি নিয়ে জন্মগ্রহণ করা মানুষের জন্য যে ইসলাম ~~তা~~ নবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে ~~তবে~~ তা পালন করতে মানুষকে বাধ্য করা হয়নি। এমন কি নবীকেও ক্ষমতা দেয়া হয়নি মানুষকে বাধ্য করতে।

যখন কেউ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর দেয়া বিধানই তার জন্য ভাল তখন বুঝা গেল যে, সে ঈমান এনেছে। অর্থাৎ সে ইসলামকে মেনে চলার জন্য মনের দিক দিয়ে প্রস্তুত হয়েছে বা মুসলিম হিসেবে জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মূল কথা ঃ

ইসলাম মানে হলো আল্লাহর ইচ্ছা এবং তাঁর বিধানের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন (complete submission)। তার মানে, আমার নিজের ইচ্ছায় আমি কিছুই করতে পারবো না। যা কিছু করবো তা যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইচ্ছায় বা তাঁরই দেয়া নিয়মে করতে হবে।

১ম পরিচ্ছেদ

সঠিক শিক্ষার অভাব

সঠিক শিক্ষার অভাব

পারিবারিক অসচেতনতা

- আমাদের মুসলিম ঘরের ছেলেমেয়েরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে পারিবারিক অসচেতনতা।
- পিতামাতা এজন্য অনেকাংশে দায়ী, কারণ তারা তাদের সন্তানদের ইসলাম চর্চা বা ইসলামিক জ্ঞান অর্জন নিয়ে খুব একটা চিন্তা করেন না।
- আমরা জানি বাংলাদেশের ৮৩% লোক মুসলিম। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এদের খুব অল্প সংখ্যকই ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো ভালো করে জানেন বা বুঝেন।
- সন্তানেরা নিজ ঘরে ছোটবেলা থেকেই তেমন একটা ইসলামিক পরিবেশ দেখে না।
- সন্তানরা জন্মের পর থেকে নিজ ঘরে বাবা-মাকে ঠিক মতো নামায-রোযা করতে দেখে না, যাকাত দিতে দেখে না। কুরআন-হাদীস পড়তে, ইসলামি বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করতে দেখে না।
- সন্তানেরা নিজ মা, ফুফু, খালাদেরকে পর্দা করতে দেখে না। কুরআন-হাদীস পড়তে দেখে না।
- সন্তানেরা নিজ ঘরে অনৈসলামিক অনুষ্ঠান ও কর্মকান্ড দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

আমাদের অতিরিক্ত ব্যস্ততার প্রভাব

কিছু হাদীস-

- ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে আদম সন্তান, আমার দ্বীনের কাজের জন্য তুমি (দুনিয়ার) ব্যস্ততা কমাও, আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার দরিদ্রতা ঘুচিয়ে দেব। আর যদি তা না কর, তবে তোমার হাত (আমি) ব্যস্ততায় ভরে দেব এবং তোমার অভাব দূর করব না।’ [তিরমিযী, মুসনাদ আহমদ, ইবন মাজাহ]
- যে ব্যক্তি দুনিয়াকে তার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহ তার (ভালো-মন্দের) দায়িত্ব থেকে পৃথক থাকেন। তিনি (আল্লাহ) তার (ঐ ব্যক্তির) চোখের সামনে দরিদ্রতাকে তুলে ধরেন, আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যা তাকদীরে লিখে রেখেছেন তা ব্যতীত ঐ ব্যক্তির জন্য আর কিছুই আসবে না। আর যে ব্যক্তি পরকালকে তার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির (ভাল-মন্দের) দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেন, তাকে অন্তরে সমৃদ্ধি দান করেন, আর পৃথিবী তার কাছে ছুটে আসে আকুল হয়ে। [ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান]
- আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন যে, যে ব্যক্তি পরকালকে তার জীবনের পরম ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহ তার যাবতীয় অভাব-অনটনের দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন; আর যে ব্যক্তির আগ্রহ-আরাধনা হয়েছে পার্থিব বিষয়াদি, আল্লাহ তার বিষয়ে কোনো জামিনদার নন। [ইবনে মাজাহ]

আল-কুরআন থেকে দূরে সরে থাকা

- ইসলামের মূল সোর্স আল-কুরআন হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান (Complete code of life) যার ছায়াতলে এসে এবং মর্ম বুঝে কোটি কোটি মানুষ মুসলিম হয়েছিলেন। সেই মুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া ছেলেমেয়েরা আজ কুরআনের মধ্যে কী আছে তা জানে না। তাদেরকে এর অর্থ ও ব্যাখ্যা জানানোর জন্যে ব্যাপক কোন ব্যবস্থা জাতীয়ভাবে করা হয়নি। এমনকি পারিবারিকভাবেও করা হয়নি।

- যারা কুরআনের অর্থ জানেন এবং বুঝেন, তারা নিজ দায়িত্বে এটা অন্যকে শিখানোর ব্যাপারে উদাসীন। চাকুরির বাইরে কুরআনের সঠিক শিক্ষা এবং প্রচারের কাজ আমরা কত জন করি?

- আল-কুরআনকে আমরা শুধু ব্যবহার করছি তিলাওয়াতের জন্য। যারাই কুরআন পড়ছি তাও শুধু মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছি, অর্থ বোঝার কোন চেষ্টা করছি না। যেন কুরআনের অর্থ বোঝার কোন প্রয়োজনই নেই!

- আশ্চর্যের বিষয়, আমরা অনেক বই পড়ি কিন্তু কোন বই পড়তে মাথা দুলাইনা কিন্তু এই একটি মাত্র বই যা পড়ার সময় কেন যেন মাথা দুলাই আর এর অর্থও বুঝি না এবং প্রয়োজনও মনে করি না।

- আল-কুরআন সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণা ঃ এক প্রতিবেশী আপা তার বাচ্চাদের অনেকগুলো সূরা মুখস্ত করিয়েছেন কিন্তু তিনি তার বাচ্চাদের ইয়াসীন সূরা মুখস্ত করতে দেন না। তার কারণে তিনি বলেন, ইয়াসীন সূরা খুব গরম তো তাই ওদেরকে পড়তে দেই না। কোথায় পেলেন তিনি এই গরম সূরার খবর?

- আল-কুরআনকে ব্যবহার করা হচ্ছে ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজের জন্য। আবার ব্যবহার করা হচ্ছে কেউ মারা গেলে মৃত মানুষের কল্যাণের জন্য, অথচ আল কুরআনে মৃত মানুষদের কল্যাণের জন্য একটি আয়াতও নেই। এটা সম্পূর্ণভাবেই জীবিতদের জন্যে উপদেশের ও তা যথাযথভাবে পালনের নির্দেশ বহনকারি কিতাব।

কুরআন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার পিছনে ইবলিস শয়তানের প্ররোচণা

- মুসলিমদেরকে কুরআন থেকে দূরে সরে থাকার জন্য যে বিষয়গুলো কাজ করে তার মধ্যে আর একটি বিশেষ কারণ হলো "অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না"। এটি ইবলিস শয়তানের একটি প্ররোচণা। তাই এই বিষয়ে আমাদের ভুল ধারণা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে কুরআন স্পর্শ করার জন্য অযুর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন 'পাক-পবিত্রতার কথা', অজুর কথা বলেননি। 'কুরআন পড়তে বা ধরতে অজু থাকতে হবে' এটি

শয়তানের একটি প্ররোচনা। কারণ শয়তান চায় না মানুষ বেশী বেশী কুরআন পড়ুক, বুঝুক এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করুক। মানুষের বেশীরভাগ সময়ই সাধারণত অজু থাকে না আর সেজন্য তারা ভয়ে কুরআনও স্পর্শ করে না। মানুষ কুরআন অর্থসহ বুঝে পড়লে এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করলে সেটাই হবে শয়তানের ব্যর্থতা। রসূল (সা.) কুরআনের আয়াত দিয়ে চিঠি লিখে বিভিন্ন দেশের অমুসলিম রাজাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছিয়েছেন। সেই সকল অমুসলিম রাজারা অজু ছাড়াই কুরআন স্পর্শ করেছেন। ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী একমাত্র নামায পড়তে ও কাবাঘর তাওয়াফ করতে অজু লাগে, এছাড়া আর কোন কাজে অজু লাগে না। এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য ডা. জাকির নায়েকের লিখা বই এবং ডা. মতিয়ার রহমানের লিখা বই পড়া যেতে পারে। "অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কিনা"।

- ২০১৩ সালে পাকিস্তানে এক লক্ষ ইমামের মধ্যে একটি সার্ভে করা হয়েছে যে তারা সলাতে (নামাযে) যা পড়ছে বা তিলাওয়াত করছে তা বুঝেন কিনা। এই এক লক্ষ ইমামই উত্তরে বলেছেন যে তারা যা তিলাওয়াত করেন তা বুঝেন না। শুধু পাকিস্তানেই নয়, বরং বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক মুসলিম অধ্যুষিত দেশেই এই অবস্থা বিরাজ করছে।

- অনেক হুজুররাই সাধারণ মুসলিমদের কুরআন বুঝে পড়তে নিরুৎসাহিত করেন। তারা বলেন কুরআন বুঝার প্রয়োজন নেই, কুরআন বুঝবে শুধু আলিমরা। তারা মুসলিমদেরকে শুধু তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান। অনেক সাধারণ শিক্ষিত লোকেরাই আরবী দেখে শুদ্ধমতো কুরআন পড়তে পারেন না, হয়তো অনেক জায়গায় ঠেকে যান, তাই তারা কুরআনই পড়েন না।

- এমন এক শ্রেণীর মানুষ-তো আছেই, যারা মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের প্রশ্নে শুধু অনীহ বা অনাগ্রহী নয়, রীতিমতো প্রতিশ্রুত শত্রুতা দ্বারা চালিত। এবং এইসঙ্গে একটি অতীব কৌতুককর বাস্তবতা হলো, এমন অসংখ্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আছেন, যারা দলবদ্ধভাবে একটি বিশেষ পুস্তক ছাড়া অন্য কোনো বই, এমনকি কুরআন হাদীস পাঠ করাকেও নিরুৎসাহিত করেন। তাঁদের বিশ্বাস, বই-পুস্তক পড়লে অন্তরে অহেতুক ফিতনা সৃষ্টি হয়, আখিরাতমুখী 'জিকির ফিকির'-এর খুব ক্ষতি হয়। আর এই কারণে একটি বিরাট

ইসলামপ্রেমী দল আজ বই-পুস্তক থেকে সতর্কভাবে দূরে থাকাই সমীচীন জ্ঞান করছেন!

- অনেক প্রকাশনী শুধু আরবী টেক্সট দিয়ে আল কুরআন ছাপিয়ে বাজারে ছাড়েন, তাতে কোন অর্থ বা সংক্ষিপ্তি তাফসীর থাকে না। যার কারণে যারা তিলাওয়াত করেন তারা ঐ তিলাওয়াতের বাইরে এক অক্ষরও কুরআনের অর্থ জানার সুযোগও পান না আর জানেনও না। তারা শুধু নিজেদেরকে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন, আর মনে করেন অনেক সওয়াব হচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে, আল-কুরআন শুধু সওয়াবের জন্য আসেনি, এসেছে মানব জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্য।

- অনেক প্রকাশনী খুবই ছোট সাইজের কুরআন ছাপিয়ে বাজারে ছাড়েন যা চশমা বা খালি চোখে দেখে পড়া যায় না। এতো ছোট সাইজ যে পড়তে হলে ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাগে। তারা এই কুরআন হয়তো ছাপায় মুসলিমদের গলায় ঝুলানোর জন্য বা পকেটে রাখার জন্য যাতে ভূত-প্রেত কাছে আসতে না পারে। এই ধরণের আচরণের সমর্থনে কোন দলিল কুরআন বা হাদীসে নেই। সঠিক ব্যবহার বাদ দিয়ে আজ কুরআনকে শুধু ব্যবহার করা হচ্ছে তাবিজ হিসেবে।

- অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোকেরা সারা জীবন মোটা মোটা বই পড়ছেন এবং বড় বড় ডিগ্রি নিচ্ছেন, নিজেরাও বড় বড় বই লিখছেন কিন্তু কুরআন পড়ার কোন সময় করতে পারলেন না। যার কারণে উচ্চ শিক্ষিত লোকদের মধ্যে একটি বিশাল অংশ আল কুরআন বুঝেন না এবং সৃষ্টি কর্তা কী বলেছেন তা জানেনও না। তবে জাতি গঠনের জন্য এই শিক্ষিত শ্রেণীর কুরআন বুঝা খুবই জরুরী।

- বাংলাদেশের প্রতিটি মুসলিম শিক্ষক-শিক্ষিকার আল কুরআনের উপর ভাল জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তারা যদি আল-কুরআন না বুঝে থাকেন তাহলে তারা কীভাবে কুরআনের আলোকে যুব সমাজ গঠন করবেন? কীভাবে জাতি গঠন করবেন? তারাই তো জাতির ফাউন্ডেশন তৈরী করেন। আমরা জানি যে স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের একেকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা একেক বিষয়ের উপর পারদর্শি। যেমন, সমাজ-বিজ্ঞান, পৌরনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, অংকবিদ্যা, রসায়ান বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের একেকজন শিক্ষক যদি আল কুরআনের সঠিক শিক্ষা পেতেন এবং গোটা কুরআন যদি বুঝতেন তাহলে তাদের

প্রতিটি বিষয়ের সাথে কুরআনকে সম্পৃক্ত করে ক্লাশে বুঝাতে পারতেন। এতে ছোটবেলা থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা আল কুরআনের সাথে পরিচিত হয়ে যেত।

- আমাদের ভুল ধারণা যে আল-কুরআন বুঝবেন শুধু স্কুলের ধর্ম শিক্ষক, এটা তার বিষয়। আর স্কুলের মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত বিষয় হচ্ছে এই ইসলাম ধর্ম। আমি সমাজ-বিজ্ঞানের শিক্ষক, আমি কুরআন নিয়ে মাথা ঘামাবো কেন? এই ধরণের চিন্তা সম্পূর্ণরূপে ভুল। আমি সমাজ-বিজ্ঞানের শিক্ষক হয়ে যদি আল-কুরআন না বুঝি তাহলে কীভাবে কুরআনের আলোকে সমাজ গঠন করবো? কীভাবে ক্লাশে সুষ্ঠ সমাজনীতি শিখাবো? আমার কাজ তো সমাজ নিয়ে। অথচ ১৪শত বছর আগে আল্লাহর রসুল (সা.) তো আল কুরআন দিয়েই তখনকার বর্বর সমাজের পরিবর্তন এনেছিলেন।

রসূল (সা.)-কে না চেনা এবং তার জীবনী না জানা

- আমাদের সন্তানেরা জানে না নবী মুহাম্মাদ কে? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি কে তারা চেনে না। তারা জানে না রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন শ্রেষ্ঠ পিতা, শ্রেষ্ঠ স্বামী, শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী, শ্রেষ্ঠ দরদী, শ্রেষ্ঠ বিচারক, শ্রেষ্ঠ দানশীল, শ্রেষ্ঠ সংগঠক, শ্রেষ্ঠ সমর নায়ক, শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী এবং আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব।

- বাংলাদেশের বেশীরভাগ ছেলেমেয়েরাই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিস্তারিত জীবনী জানে না, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গী-সাথী অর্থাৎ সাহাবাদের জীবনী জানে না। ইসলামের সঠিক ইতিহাস জানে না। এমনকি বাবা-মায়েরাও জানেন না। অথচ যার মাধ্যমে এই পৃথিবীতে ইসলাম এসেছে এবং ইসলাম বাস্তবায়িত হয়েছে তার জীবনী জানা আমাদের খুবই জরুরী।

- আমাদের দেশে রবীন্দ্র, নজরুল, লালন, জসিম উদ্দিন, মাইকেল মধুসুদন দত্ত, আব্বাস উদ্দিন, জয়নুল আবেদীন, শামসুর রহমান, হুমায়ুন আহমেদ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিভাদের নিয়ে নানা রকম সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ, সপ্তাহব্যাপী আলোচনা অনুষ্ঠান ইত্যাদি দেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিগুলোতে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে, উসমানি মিলনায়তনে,

টিএসসিতে বছরের বিভিন্ন সময়ে উৎযাপিত হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানগুলোতে বুদ্ধিজীবী, কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কবি-সাহিত্যিক, লেখক-লেখিকা, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার লোকেরা খুবই আগ্রহের সাথে অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

- কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই ধরণের আয়োজকরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নিয়ে কোন সেমিনার-ওয়ার্কশপ করেন না। তাই ঐ শ্রেণীর নাগরিকগণ রসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে তেমন কিছু একটা জানেন না। মাদ্রাসার হুজুর শ্রেণীরা শীতকালে প্যান্ডেল করে যে ওয়াজ মাহফিল করেন তাতে ঐ শ্রেণীর নাগরিকগণ অংশগ্রহণও করেন না। আর ঐ ওয়াজ মাহফিলের পরিবেশও তাদের জন্য মানানসই নয়।

- বাংলাদেশে নজরুল একাডেমী, বাংলা একাডেমী, ভাষা ইনস্টিটিটিউট, রবীন্দ্র কুঠি বাড়ি মিউজিয়াম ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা পরিষদ এবং গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। অনেকে নজরুল ইসলামের উপর বা কবীগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর পি.এইচ.ডি করেন। কিন্তু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নিয়ে কোন গবেষণার সুযোগ নেই, ইনস্টিটিউটও নেই। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নিয়ে টিভিতে কোন টক শো হয় না। টি.এস.সিতে সপ্তাহব্যাপী কবিতা উৎসবের মতো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জীবনী নিয়ে কোন উৎসব হয় না। যার কারণে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি সম্পর্কে এযুগের আধুনিক ছেলেমেয়েরা অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে।

সাহাবা (রা.)-দের সম্পর্কে না জানা

- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চারজন সফল রাষ্ট্রপ্রধান আবুবকর, ওমর, উসমান, আলী (রাদিআল্লাহু আনহুম) সম্পর্কেও আধুনিক যুগের ছেলেমেয়েরা তেমন কিছু একটা জানে না। এই চারজনকেই আল্লাহ তাদের জীবিত অবস্থায় জান্নাতের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু)-র সময়কে বলা হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুগ। তিনি প্রশাসন সিস্টেম প্রবর্তন করেন, যেমন ঃ তিনি যাকাতের মাল সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যাংক এবং রিজার্ভ ফান্ড চালু করেন,

স্বেচ্ছাসেবকদের ভাতা প্রদান এবং নীতিমালা প্রণয়ন করেন। এছাড়া বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা, ভূমি কর ও অন্যান্য কর নির্ধারণ করেন, চাষাবাদের জন্য খাল খনন করেন। তিনি কুফা, বসরা, ফুসতাত, মুওতাত, মুওসাল শহরগুলোতে কৃষি উন্নয়ন করেন। বিজিত রাষ্ট্রসমূহকে প্রাদেশিক রাজ্যে বিভক্ত করেন। উশর আদায়ের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করেন। জেলখানা ও পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। মুক্ত আবহাওয়ার পরিবেশে সৈন্যদের জন্য শেল্টার তৈরী করেন। দেশের খবরাখবরের জন্য পত্রিকার ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন শহরে সার্কিট হাউজ তৈরী করেন। দরিদ্র উহুদী-খ্রীষ্টানদের জন্য ফুড ব্যাংক চালু করেন। শিক্ষকদের জন্য বেতন ধার্য করেন। মদীনা হতে মক্কার পথে রেষ্ট হাউজ তৈরী এবং বিনা মূল্যে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। আজকের উন্নত দেশগুলোর যে ওয়েলফেয়ার সিস্টেম আছে তা ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থার আদলে তৈরী।

বাংলা একাডেমীর বই মেলা

- প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলা একাডেমীতে এক মাস ব্যাপী বই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই বই মেলাতে হাজার হাজার বই প্রকাশিত হয়। শতশত বইয়ের দোকানের মাঝে কোন ইসলামিক বইয়ের দোকান থাকে না। শোনা যায় শুধু মাত্র ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একটি স্টল থাকে। যাহোক, এই বই মেলাতে লক্ষ লক্ষ আধুনিক ছেলেমেয়েদের সমাগম ঘটে, তারা নানা রকম গল্প সমগ্র, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি কিনে এবং আগ্রহ করে পড়ে।
- যদি এই বই মেলাতে কিছু উন্নতমানের এবং সহি (অথেন্টিক) ইসলামিক বইপত্র পাওয়া যেতো তাহলে আমাদের ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই তা থেকে উপকৃত হতো। এছাড়া অন্যান্য উপন্যাসের পাশাপাশি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তথ্যবহুল জীবনী পাওয়া গেলে অনেকেই মানব জাতির জন্য তাঁর অবদানের কথা জানতে পারতো। তাহলে হয়তো (তথাকথিত) আধুনিক ছেলেমেয়েরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি সম্পর্কে আজেবাজে কটুক্তি করতো না।

হুমায়ুন আহমেদের লিখা রসূল (সা.)-এর জীবনী

- আমরা জানি যে হুমায়ুন আহমেদ ছিলেন একজন সফল কথা সাহিত্যিক। যার লেখা উপন্যাস বাজারে প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা কেনার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তার উপন্যাস ছাপানোর জন্য প্রকাশকরা স্ক্রিপ্ট লিখার আগেই অগ্রিম টাকা দিয়ে বুক করে রাখেন। যার বই বাংলা একাডেমীর বই মেলায় সর্বোচ্চ সংখ্যক কপি বিক্রি হয়। যাহোক হুমায়ুন আহমেদের মতো জনপ্রিয় লেখকরা যদি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী লিখতেন তাহলে তরুণ সমাজের অনেক বড় উপকার হতো। তারা তাদের লেখকের প্রতি ভক্তির কারণে তার লেখা উপন্যাসের পাশাপাশি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জীবনীও কিনতো এবং খুবই আগ্রহভরে পড়তো। এতে সারা দেশের তরুণ সমাজ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে খুব ভাল করে চিনতো, তার অবদানের কথা জানতো। এতে করে তারা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাবাপন্ন না হয়ে দরদী হতো। হুমায়ূন আহমেদ দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, কিন্তু অন্য যে সকল জনপ্রিয় উপন্যাসিক গল্পকার আছেন তাদের আজ এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসা উচিৎ।

আলিমদের গাফিলতি

- মুসলিম আলিমগণ (যারা ইসলাম মানেন, বুঝেন ও পালন করেন) আজকালকার আধুনিক ছেলেমেয়েদের কাছাকাছি আসতে পারছেন না। এইসব ছেলেমেয়েরা ইসলামের প্রতিনিধি অর্থাৎ আলেমদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্ট্যাটাস অত ভালো নয় বলে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হন না।

- ইসলামকে এই ছেলেমেয়েরা যেমন জানেন না বা ইসলামের আসল রূপ ও সৌন্দর্য্য দেখার সৌভাগ্য তাদের হয়নি, ঠিক তেমনি আমরা যারা ইসলাম জানি, বুঝি, মানি ও ভালোবাসি, তারাও ইসলাম প্রচারের দায়িত্বকে ফরয মনে করে ইসলামকে তাদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করিনি অথচ বিশাল অংকের টাকার চুক্তিতে ওয়াজ মাহফিল করে বেড়াচ্ছি।

ইসলামিক লাইব্রেরীর অভাব

- আমেরিকা, ক্যানাডা, সিঙ্গাপুরে দেশের প্রতিটি এলাকায় একটি করে উন্নতমানের রেফারেন্স লাইব্রেরী রয়েছে। অর্থাৎ পুরো দেশের আনাচে কানাচে শতশত লাইব্রেরী রয়েছে। যে কেউ বিনা পয়সায় মেম্বার হতে পারেন এবং লাইব্রেরীতে বসে পড়া-লেখা এবং রিসার্চ করতে পারেন এবং প্রয়োজনে বই, ডিভিডি বাসায় নিয়ে যেতে পারেন। প্রতিটি লাইব্রেরীতেই কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে। সব সার্ভিসই ফ্রী। এই লাইব্রেরীগুলোতে বিভিন্ন ধর্মের উপর নানা ভাষায় বই রয়েছে।

- কিন্তু আমাদের দেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একটি লাইব্রেরী ছাড়া দেশের আর কোথাও কোন ইসলামিক লাইব্রেরী নেই। অনেক এলাকাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বা কোন সোসাল অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে লাইব্রেরী থাকতে পারে কিন্তু তা রয়েছে শুধুমাত্র গল্প-উপন্যাসে ভরপুর। সেখানে শুধু অথেন্টিক ইসলামিক বইয়ের অভাব।

- বাংলাদেশ এখন মসজিদের জন্য বিখ্যাত এবং এই দেশ মসজিদের দেশ হিসেবে সারা পৃথিবীতে প্রথম স্থান পেয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কোটি কোটি টাকা খরচ করে মসজিদ বানানো হচ্ছে কিন্তু মসজিদগুলোর তাকে হয়তো কিছু আরবী কুরআন রয়েছে তাও শুধু তিলওয়াত করার জন্য। কিন্তু ইসলামকে জানার জন্য, কুরআনকে জানার জন্য কোন ইসলামি সাহিত্য এবং তাফসীর নেই। রসূল (সা.)-কে জানার জন্য কোন সীরাত গ্রন্থ নেই।

- প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত পরিবারের ড্রইংরুমে একটি বইয়ের আলমিরা থাকে এবং সেখানে অনেক সাহিত্যের বই-ই থাকে কিন্তু শুধু থাকে না ইসলামের উপর অথেন্টিক বই। যদিও কারো কারো ঘরে 'মকসুদুল মোমিনুন' বা 'নিয়ামুল কুরআন' এই জাতীয় দুই একটা বই থাকে যা মানুষকে সঠিক ইসলাম থেকে আরো দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং ইসলামের নামে কিছু বিদ'আত ঘরের মধ্যে পালিত হয়।

- আমরা যদি ইতিহাস দেখি যে মুঘল সম্রাটরা কোটি কোটি রুপি খরচ করে প্রাসাদ বানিয়েছে, প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ তাজমহল নির্মাণ করেছে, মার্বেল পাথর দিয়ে খুবই চাকচিক্যময় মসজিদ নির্মাণ করেছে কিন্তু তারা

মুসলিমদের সঠিক ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য কোন ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেননি, লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেননি, ইসলামিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেননি।

- ধনী আরব দেশগুলো ডোনেশন দিয়ে আমাদের মতো গরীব দেশেগুলোতে পাঁচওয়াক্ত সলাত আদায় করার জন্য অনেক মসজিদ তৈরী করে দিয়েছে, যা সলাত শেষে তালা মেরে রাখা হচ্ছে অন্য কোন কাজে লাগছে না। তারা আমাদের প্রতি দয়া পরবেশ হয়ে দেশের আনাচে কানাচে অনেক মসজিদ তৈরী করে দিয়েছে ঠিকই কিন্তু এই মসজিদগুলো আবাদ করার জন্য লোক তৈরীর ব্যবস্থা করেনি, কোন লাইব্রেরী বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেনি।

ভালর সাথে খারাপ মিলিয়ে ফেলা

- সবকিছুতে আমরা ভাল-খারাপ তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি, মিক্সআপ করে ফেলেছি। আমরা অনেক অন্যায়কেই আর অন্যায় বলে মনে করি না। আমাদের বিবেক ভোতা হয়ে গেছে। সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া আজ একটা সাধারণ ও গ্রহণযোগ্য ব্যাপার। বাবা ঘুষ খান, ঘুষ দেন, সুদ খান, সুদ দেন, মিথ্যা বলেন, আমানত খেয়ানত করেন, অন্যের ক্ষতি করেন, সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি দেন, গ্যাস-পানি-বিদ্যুতের বিল ঠিক মতো পরিশোধ করেন না। সন্তানরা এগুলো জন্মের পর থেকে দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এসবকে এরা আর অন্যায় বলে মনে করে না।
- আমরা নামাযও পড়ছি আবার ব্যবসায় মানুষকে ঠকিয়ে যাচ্ছি, রোযাও রাখছি আবার অশ্লীল নাটক-সিনেমাও দেখছি, বেপর্দা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, অন্যের গীবত করে বেড়াচ্ছি, পরনিন্দা-পরচর্চা করে বেড়াচ্ছি। ভাল-মন্দ আলাদা করতে পারছি না। সমাজের সবাই এভাবেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সন্তানরাও জন্মের পর থেকে এগুলো দেখে আসছে। ওদের চোখে এসবই স্বাভাবিক, গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে। এসব অন্যায়কে এরা ঘৃনা করতে শিখছে না, মাবাবাও তা শেখাচ্ছেন না।

ইসলামকে নিজেদের সুবিধামত কাস্টমাইজ করে নেয়া বা ব্যাখ্যা করা

- যদিও কোন পরিবার ইসলাম পালন করার চেষ্টা করেন তাদের মধ্যে থেকে অনেকেই ইসলামকে নিজেদের মতো করে কাস্টমাইজ করে নিয়েছেন। অর্থাৎ ইসলামের যা যা নিজের পালন করা সহজ হয় সেগুলো শুধু পালন করেন, আর ইসলামের যেগুলো পালন করা কঠিন বা যেগুলো পালন করতে গেলে কিছু সামাজিক ও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করতে হয় সেগুলো ইসলাম থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন।
- সারা দিনে কিছু সময় ইসলাম পালন করেন আর কিছু সময় পালন করেন না। যেমন একজন মহিলা সাধারণত পর্দা করে চলেন কিন্তু যখন কোন অনুষ্ঠানে যান তখন আর পর্দা করেন না বরং পর্দা খুলে সেখানে সাজগোজ করে নিজেকে উপস্থাপন করেন।
- যখন ঘরে থাকেন তখন সলাত আদায় করেন কিন্তু যখন শপিংয়ে যান, সারাদিন মার্কেটে ঘুরে বেড়ান তখন আর সলাত আদায় করেন না। মনে হয় সলাতটা শুধু বাসায় থাকলে পড়তে হয়, বাইরে গেলে প্রয়োজন নেই।
- রমাদান মাসে ঢাকার গাউসিয়া-নিউমার্কেটে মহিলাদের চাপে ঢুকাই যায় না। সম্মানিত মহিলারা রোযাও রেখেছেন কিন্তু সারা দিন বেপর্দা হয়ে শপিং করছেন এবং যোহর-আসর-মাগরিবের সলাত আদায় করছেন না।

ব্রিটিশ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন

- ভারতবর্ষ প্রায় দুইশত বৎসর খ্রীষ্টানদের অধীনে থাকাকালে তৎকালীন এক ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মি. গ্ল্যাডষ্টোন (১৮০৯-৯৮) একদিন একটি কুরআন উঁচু করে ধরে হাউজ অফ কমন্সে বলেছিলেন, - "দেখ, এটা হচ্ছে মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন, মুসলিমগণ যদি এই কুরআনের সঠিক শিক্ষা লাভ করে তবে তোমরা কোন মুসলিম দেশেই তোমাদের শাসন চালাতে সক্ষম হবে না। তোমরা যদি মুসলিম দেশগুলির উপর নিরাপদে রাজত্ব করতে চাও, তাহলে এই কুরআনের শিক্ষা হতে মুসলিমদেরকে দূরে রাখতে হবে।" তাদের প্ল্যান অনুযায়ী মুসলিমদের মধ্যে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিলেন যে-

"মানুষের জীবনে দুইটি অংশ, একটি হলো দ্বীনদারী এবং আর অপরটি হলো দুনিয়াদারী ।" দ্বীনদারী এবং দুনিয়াদারীর মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই, একটা থেকে অন্যটা সম্পূর্ণ আলাদা। দ্বীনদারীর ব্যাপার শুধু দেখবে মাদ্রাসার হুজুররা এবং দুনিয়াদারী হলো কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষিত মানুষের জন্য ।

- তাদের আরো পরিকল্পনা হলো ঃ মাদ্রাসার সিলেবাস তৈরী করা এবং সেই সিলেবাসে যেন আল-কুরআন বলতে শুধু পরকাল সম্পর্কিত বিষয় ছাড়া অন্য কিছু না থাকে । তখন থেকেই মাদ্রাসায় শিক্ষায় বাস্তব জীবন সম্পর্কিত আল-কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সুকৌশলে বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে । চালু হলো না বুঝে কুরআনে হাফিজ, বিভিন্ন রকম কুরআন খতম, কুরআন দিয়ে নানা রকম তাবিজ-কবচ, চাল পড়া দিয়ে চোর ধরা, কুলখানী, মিলাদ, সবিনা খতম, হালাকা যিকর, মোরাকাবা, আওলীয়া হওয়ার জন্য সংসার ত্যাগ, পীর-মুরীদি, পীরদের জান্নাতের নিশ্চয়তা দান, কলব পরিষ্কার, নানারকম চিল্লা লাগানো, মাজারের খেদমত করা, মাজারে শির্ণি দেয়া, ফুল-ফল দেয়া, আগর বাতি জ্বালানো ।
- ইংরেজরা সুকৌশলে শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে এমন দুই মেরুতে ভাগ করে দিলেন যে যারা মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হবে তারা administration-এ আসতে পারবেন না অর্থাৎ দেশ চালানোর মতো তাদের কোন যোগ্যতা থাকবেনা । যারা মাদ্রাসা থেকে পাশ করে বের হবে তাদের পেশা হবে সাধারণতঃ মুসলমানী করানো, বিয়ে পড়ানো, তারাবী সলাত পড়ানো, ইমামতি করা, মুয়াজ্জিনগিরী করা, জানাজা পড়ানো, খতম পড়ানো, মিলাদ পড়ানো, জীন-ভূত তাড়ানো, মাদ্রাসায় পড়ানো, এতিমখানার প্রিন্সিপাল ইত্যাদি ইত্যাদি । অন্যদিকে তারা সাধারণ স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজালেন যেন তার মধ্যে আল-কুরআনের কোন প্রকৃত শিক্ষা না থাকে কারণ কুরআন হচ্ছে complete code of life । তাই যারা দেশ চালাবে, পার্লামেন্টে বসবে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় চালাবে, ইন্ডাসট্রিজ, ব্যাংক, কোর্ট, থানা, ক্যান্টনমেন্ট ইত্যাদির দায়িত্বে থাকবে তাদের মধ্যে থাকবে না কোন কুরআনের সঠিক শিক্ষা ।

ইসলামের অনুসরণ করা অপশনাল বা ঐচ্ছিক ভাবা

- **আমাদের ইসলামের জ্ঞান** ঃ আমরা যারা general education-syllabus-এ শিক্ষা লাভ করেছি, যেমন ঃ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, একাউনটেন্ট, পাইলট, লইয়ার, সাংবাদিক, আর্মি অফিসার, এমপি, মন্ত্রী ইত্যাদি প্রোফেশনে আছি তাদের ইসলামের উপর একাডেমিক জ্ঞান আসলে কতটুকু? বিষয়টি একটু গভীরভাবে ভেবে দেখা যাক। স্কুলের প্রাইমারী ক্লাশ থেকে শুরু করে এসএসসি পর্যন্ত আমাদের "ইসলাম ধর্ম" নামে একটি সাবজেক্ট ছিল। ঐ বইতে কী পড়েছিলাম তা হয়তো অনেকেরই পরিষ্কার মনে নেই, তাছাড়া ঐ "ইসলাম ধর্ম" নামের বইটির মধ্যে আল-কুরআনের বাস্তব এপ্লিকেশন সম্পর্কে কতটুকু বর্ণনা ছিল তাও ভেবে দেখার বিষয়। এবার আসি নবম ও দশম শ্রেণীতে আমরা এই বিষয়টি পড়েছি খুবই গুরুত্বসহকারে যার বেশীরভাগ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিল এস.এস.সি.তে লেটার মার্কস পাওয়া, ইসলামকে ভালভাবে জানা নয়। কারণ এই একটি বিষয়েই খুব সহজে লেটার মার্কস পাওয়া যায়।

- যাহোক, এস.এস.সি. পাশ করার পর কলেজ, তারপর ইউনিভার্সিটি, তারপর প্রফেশনাল লাইফ, তারপর বিয়ে-শাদী ঘর-সংসার। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এস.এস.সি.র পর থেকে শুরু করে বাকী জীবনের অংশটুকুতে ইসলামিক এডুকেশনের কোন ব্যবস্থা নেই। যে কুরআন guideline for whole mankind বাকী জীবনে সেই কুরআনিক শিক্ষার কোন ছিটাফোঁটাও নেই। তাহলে আমরা আমাদের জীবন পরিচালনা করছি কীভাবে? তাহলে কি আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান ছাড়াই জীবন পরিচালনা করে যাচ্ছি? কিন্তু রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকটি মুসলিম নরনারীর জন্য ফরয। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

- আবার যারা ইসলামিক স্টাডিস বা ইসলামিক হিস্ট্রিতে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি এবং পাশ করছি তাদের বেশীরভাগই এই বিষয় বেছে নিয়েছি কারণ ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষায় অন্য কোন ভাল বিষয়ে চান্স পাইনি বলে। তার মানে এই বিষয়ে পড়ছি ইসলামকে জানার জন্যে নয়, একরকম মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং শুধু মাত্র ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি অর্জনের জন্য। আমাদের পরিচিত একজন শিক্ষিকার ঘটনা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষণীয় হিসেবে তুলে ধরা যাক। তিনি ঢাকার প্রাণ কেন্দ্রের একটি

কলেজের ইসলামিক স্টাডিসের প্রফেসর। আমরা তার বাসায় প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। তাকে দেখতাম তিনি আমাদের সাথে গল্প করছেন আর ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার খাতা কাটছেন এবং নম্বর দিচ্ছেন। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা না পড়েই একটা করে পাতা উল্টাচ্ছেন আর খাতায় দাগ দিচ্ছেন। এভাবে তিনি একের পর এক খাতা দেখে যাচ্ছেন আর আমাদের সাথে গল্প করছেন। আমরা তাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে তিনি তো লেখা না পড়েই নম্বর দিচ্ছেন। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে ইসলামিক স্টাডিস বা ইসলামিক হিস্ট্রির খাতা এভাবেই দেখতে হয়, কোন পড়ার প্রয়োজন হয় না আর এই বিষয়ের খাতা সব examiner-রাই এভাবে দেখে থাকেন, এটাই নিয়ম।

- **বাস্তবতা** ঃ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে আমরা আমাদের মূল শিক্ষা জীবনে ইসলামের উপর একাডেমিক কোন শিক্ষা পাচ্ছি না। এদিক সেদিক থেকে বা কোন হুজুর থেকে কিছু সূরা-কারাত পড়েছি, দেখাদেখি ওযু-সলাত শিখেছি, অনেকে হয়তো ছোট বেলায় কায়দা পড়েছি, তারপর কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি। এই হলো আমাদের ইসলামের উপর সত্যিকার জ্ঞান। আরো যারা একটু আগ্রহী তারা ইন্টারনেট থেকে মাঝে মধ্যে দু একটা ইসলামিক ভিডিও দেখি বা এক দুই পাতা আর্টিক্যাল পড়ি বা কোন ইসলামিক সেমিনার বা ওয়াজ মাহফিলে যাই। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে একটা বিষয়কে ভালভাবে জানার জন্য ধারাবাহিকভাবে কোন সিলেবাসভিত্তিক পড়াশোনা নেই। কিন্তু প্রফেশনাল লাইফে একটা বিষয়কে ভালভাবে জানার জন্য এবং আরো উন্নতির জন্য নানারকম শর্টকোর্স বা লংকোর্স করছি। যেমন ঃ যিনি আইটি প্রফেশনাল তিনি কোন ইউনিভার্সিটি থেকে এই বিষয়ে মাসটার্স-গ্রাজুয়েশন তো করেছেনই তারপরও আরো ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য আপগ্রেড কোর্স করেন, ডিপ্লোমা করেন বা পোষ্ট-গ্রাজুয়েশন করে থাকেন।

- কিন্তু যে ইসলাম আমাদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যে কুরআন আমাদের জীবন পরিচালনার গাইডলাইন, সেটা জানার জন্য কোন উদ্দ্যোগ কি আমরা নিয়েছি? তাহলে কি আমরা কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান ছাড়াই জীবন চালিয়ে যাচ্ছি? প্রফেশনাল লাইফে যদি একটা বিষয়কে জানার জন্য মাস্টার্স, গ্রাজুয়েশন, শর্টকোর্স, সার্টিফিকেশন কোর্স ইত্যাদি করতে হয় তাহলে আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান জানার জন্য মাঝে মধ্যে দুই একটা হাদীস বা দুই একটা ইসলামের বই পড়লেই কি যথেষ্ট? বিষয়টা কি

এতোই সহজ? ইসলামকে জানার জন্য মিনিমাম তো একটা সিলেবাস ভিত্তিক পড়াশোনা করা প্রয়োজন। তা না হলে কীভাবে নিজ পরিবারকে গাইড করবো? কীভাবে সন্তানদের প্রশ্নের উত্তর দেবো?

- ইসলামকে জানার জন্য যে গতানুগতিক মাদ্রাসার ডিগ্রি অর্জন করতে হবে তাও বলা হচ্ছে না। কারণ আমাদের দেশের মাদ্রাসার সিলেবাসের মধ্যেও একটা বড় ধরনের গ্যাপ রয়েছে যা পারিবারিক জীবন পরিচালনা থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়। কারণ একজন মাদ্রাসার গ্রাজুয়েট একটি ফাইন্যানসিয়াল ইনিষ্টিটিউট চালাতে পারবেন না, তিনি একটি মালটিন্যাশনাল কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হতে পারবেন না বা তিনি প্লেন চালাতে পারবেন না বা তিনি ডাক্তারী করতে পারবেন না বা তিনি আর্কিটেক্চারাল ডিজাইন করতে পারবেন না অর্থাৎ মাদ্রাসা গ্রাজুয়েটেরা দেশ পরিচালনার জন্য এডমিনিস্ট্রেশনে আসতে পারবেন না। আবার যারা এডমিনিষ্ট্রেশনে আছেন তারা নিজ পিতা বা মাতা মারা গেলে নিজে তাদের জানাযার সলাত পড়াতে পারবেন না, এমনকি কবরে লাশ নামানোর সময় কী বলতে হবে তাও জানবেন না। তাই এই দুই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই একটা বড় ধরনের গ্যাপ রয়েছে। আমাদের প্রয়োজন এই দুই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন। যেমন ঃ একজন থানার ওসি সলাতের ওয়াক্ত হলে থানার সকলকে নিয়ে ইমামতি করে জামাতের সাথে সলাত আদায় করবেন। বা একজন এমপি তার এলাকায় জুমার সলাতের খুতবা দিবেন এবং সলাত পড়াবেন।

ইবাদত সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা

- আমরা অনেকেই মনে করি যে শুধু নামায-রোযা-হাজ্জ-যাকাতই ইবাদত। এর বাইরে আর কোন ইবাদত নেই। আসলে ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মুসলিমের প্রতিটি কাজই ইবাদত যদি তা আল্লাহ ও তার রাসূলের নিয়ম অনুসারে করা হয়।

হুজুরদের স্বরণাপন্ন হওয়া

- ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে যখন সাভারের রানা প্লাজা (কয়েকটি গার্মেন্স) ধ্বসে পরলো, আমরা সবাই জানি ঘটনা। শতশত লোক ধ্বংসস্তুপের নিচে

চাপা পরে রয়েছে এবং আর্মিরা খুবই আন্তরিকতার সহিত উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতি মধ্যে অনেকেই ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পরে মারাও গেছে। আমরা টিভিতে দেখেছি যে, মৃতদের আত্মার মাগফিরাতের জন্য ধ্বংসস্তুপের পাশেই আর্মিরা প্যান্ডেল করে দিয়েছেন এবং হুজুর ভাড়া করে এনে মাইকে কুরআন তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করেছেন। হুজুররা সুর করে কুরআন তিলাওয়াত করে ডেডবডিদেরকে শুনাচ্ছেন! অথচ কুরআনে একটি আয়াতও নেই ডেডবডির জন্য।

- চিন্তা করার বিষয় যে, আমরা জানি আর্মি অফিসাররা হচ্ছেন একটি ভাল লেভেলের মেধাবি শিক্ষিত শ্রেণী। যারা পৃথিবীর যেকোন দুযোর্গ মোকাবেলা করার জন্য ক্ষমতা রাখেন, এমনকি একেকজন আর্মি অফিসার দেশের প্রধান হওয়ার মতোও যোগ্যতা রাখেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এখানেও তাদের ইসলামিক নলেজের দূর্বলতা, তারা এতো যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া সত্যেও হয়তো এই বিষয়ে কোন হুজুরের স্বরণাপন্ন হয়েছেন যে মৃতদের জন্য কী করা যেতে পারে। তাই তারা যা ইসলামে নেই তা মৃতদের মাগফিরাতের জন্য করছেন।

সলাতে (নামাযে) কী পড়ি তা না বুঝা

- আমরা দৈনিক ১৭ রাকআত ফরয সলাত এবং ১২ রাকআত সুন্নাত সলাত আদায় করি। কিন্তু খুব কম লোকই অর্থ বুঝে সলাত আদায় করি। আমরা জানি না যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সলাতের মধ্যে কী বলছি, কী পড়ছি! রুকুতে "সুবহানা রব্বিআল আজিম" মানে কী? সিজদায় "সুবহানা রব্বিআল আলা" মানে কী? তা জানি না। সলাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে কী কথোপোকথোন হচ্ছে তা জানি না। আল্লাহর কাছে কী চাচ্ছি তা নিজেই জানি না। অথচ আমরা সলাত আদায় করছি। যেসব কথার অর্থই জানা নেই, সেসব কথা যত ভালোই হোক না কেন তার কোন আসর আমাদের চরিত্রে আসবে কি করে?

ইসলামিক নিয়মের অপব্যবহার

- আমাদের ইসলামের বুঝ বা understanding-টা এমন যে, রাস্তায় দেখা যায় বৃদ্ধা মা বোরকা পরে যাচ্ছে আর তার পাশে তার ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া

যুবতী মেয়ে বেপর্দা হয়ে তার সাথে চলছে। দেখে মনে হচ্ছে যে ইসলাম পর্দার ব্যবস্থা করেছে বৃদ্ধাদের জন্য, আর যুবতীদের জন্য পর্দা নয়, তারা পর্দা করবে বৃদ্ধা হলে।

- আমাদের দেশের মুসলিমগণ সাধারণত হজ্জ পালন করে থাকেন বৃদ্ধ বয়সে। নামায-রোযা যেমন প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরয, তেমনি হজ্জও প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরয যদি আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য থাকে। যখন সামর্থ হবে হাজ্জও তখনই ফরয হবে। বেশীরভাগ সময় দেখা যায় যে আর্থিক স্বচ্ছলতা বা দৈহিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা হজ্জে না গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি বৃদ্ধ বয়সের জন্য, রিটায়ার্মেন্টের জন্য।

- একইভাবে আমাদের দেশে মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় এবং দাড়ি রাখা, তাও রেখে দেই বৃদ্ধ বয়সের জন্য, রিটায়ার্মেন্টের জন্য। ইসলামিক নিয়ম অনুযায়ী জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় এবং দাড়ি রাখার সাথে বৃদ্ধ-যুবক কোন বিষয় নেই, অথচ এ দুটোই ওয়াজিব।

- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, হাশরের ময়দানে ৫টি প্রশ্নের উত্তর দেয়া না পর্যন্ত কোন আদম সন্তানই এক কদমও নড়তে পারবে না। (আত-তিরমিযী)

    ১. তার জীবনকাল সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে?
    ২. যৌবনের শক্তি-সামর্থ্য সে কোন কাজে লাগিয়েছে?
    ৩. কোন উপায়ে সে টাকা-পয়সা উপার্জন করেছে?
    ৪. এবং কোন পথে সে সেই টাকা-পয়সা খরচ করেছে?
    ৫. অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী সে কতটুকু আমল করেছে?

ফরয সলাত (নামায) আদায় না করা

- আমাদের দেশে কোন কলেজ বা ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া ছেলেমেয়ে যদি পাচঁ ওয়াক্ত সলাত আদায় করে, তার উপর কোন ছেলে যদি মসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করে তাহলে তো সেই বাবামায়ের দুঃশ্চিন্তার অন্ত নেই ঃ আমার সন্তান এই বয়সে মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করে কেন? সে কোন জঙ্গিদলের সাথে যোগ দেয়নিতো? আর যদি ছেলে

মসজিদে গিয়ে প্রতিদিন ফজরের সলাত আদায় করে থাকে তাহলে তো কোন কথাই নেই! চিন্তা আরো বেশী!

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন সারা দেশব্যাপী নামাযের উপর একটি সার্ভে করেছিল, পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে বাংলাদেশের ৯৮% মুসলিম নামায পড়ে না। অথচ আল্লাহ সূরা আনকাবুতের ৪৫ নং আয়াতে বলছেন "নিশ্চয়ই সলাত মানুষকে সমস্ত পাপকাজ ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে"। যে দেশের ৯৮% মুসলিম নামায পড়ে না তাহলে কিভাবে তারা পাপ কাজ থেকে দূরে থাকবে? পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার হাতিয়ারই তো তারা ব্যবহার করে না।

- ইসলামের শারীআত অনুসারে ৭ বছর বয়স থেকে সলাতের অভ্যেস গড়ে তুলতে হয়। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ "সাত বছর বয়স হলে তোমাদের সন্তানদের সলাত আদায়ের নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়স হওয়ার পর এজন্য তাদের প্রতি কঠোর হয় এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।" (আবু দাউদ)

- সন্তানদের পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের ব্যাপারে নিজ ঘরে একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে পারিনি। ছোট ছোট সন্তানদের নিয়ে পিতা, ভাই, মামা, চাচা ইত্যাদি পরিবারের পুরুষরা সলাত আদায়ের জন্য মসজিদে যাওয়ার অভ্যেস করিনি। সন্তানদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করিনি।

- যদি ছোট বাচ্চারা সলাতের জন্য মসজিদে যায় তাহলে দেখা গেছে যে, বড়রা তাদেরকে সাথে নিয়ে এক কাতারে দাঁড়ান না, তাদেরকে পিছনে ঠেলে দেয়া হয়। এমনকি মসজিদের মুয়াজ্জিন বা ইমাম সাহেব ও ছোট বাচ্চাদের মসজিদে দেখলে একরকম বিরক্তই হন। অথচ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সলাতে সিজদায় যেতেন তখন তাঁর দুই নাতি তাঁর ঘাড়ের উপরে উঠে খেলা করতো।

- নফল সলাতের প্রতি গুরুত্ব দেয়া। যেমন সারারাত ধরে শবে বরাতে নফল ইবাদত করা হয় কিন্তু দেখা গেছে যে ফজরের ফরয নামায না পড়েই সে ঘুমিয়ে পড়েছে। নফলের উদ্দেশ্যে ফরয ত্যাগ!

জুমা'র খুৎবা থেকে কোন শিক্ষাগ্রহণ না করা

- জুমা'র নামাযের প্রতিটি খুৎবা হওয়া উচিত একেকটা শিক্ষণীয় বিষয়। মুসল্লিরা জুমা'র নামায শেষে ঘরে ফিরবে ইসলামি শিক্ষা নিয়ে। প্রতি সপ্তাহে খুৎবা শুনে মুসলিমদের ঈমান হবে মজবুত। কিন্তু আমাদের দেশে বাস্তাবে তার উল্টো, প্রতি সপ্তাহে গতানুগতিক খুৎবা শুনে কেউই তেমন কিছু একটা শিখে না। এছাড়া খুৎবা আরবী ভাষায় হওয়াতে সবাই বসে বসে ঝিমায়। ছেলেরা একে অপরে গল্প করে সময় কাটায়। অথচ খুৎবা মাতৃভাষায় অথবা মুসল্লীদের বোধগম্য ভাষাতেই দেয়া উচিৎ।
- আর একটা সমস্যা হচ্ছে যে, আমাদের দেশের মসজিদগুলোতে মহিলাদের কোন নামাযের ব্যবস্থা নেই। মহিলারা এমনকি খুৎবা শোনার জন্য জুমা'র নামাযেও মসজিদে যেতে পারেন না।
- ইউরোপ আমেরিকার মসজিদগুলো হচ্ছে একেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখান থেকে ছেলেমেয়েরা নিয়মিত Moral Education-এ শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে। এখানে জুমা'র নামাযের খুৎবাগুলো আরবীতে না দিয়ে ইংরেজীতে দেয়া হয় যাতে সবাই বুঝে এবং সেখান থেকে ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য শিক্ষাগ্রহণ করে।

মসজিদ ফ্যাসিলিটির সঠিক ব্যবহার না করা

- আমাদের দেশে কোটি কোটি টাকা খরচ করে মসজিদ বানানো হয় কিন্তু তার কোন সঠিক ব্যবহার নেই। অমুসলিম দেশ যেমন ঃ ইউরোপ-আমেরিকা-ক্যানাডা-অস্ট্রেলিয়া থেকে আমরা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি। এখানে প্রায় প্রতিটি এলাকাতেই মুসলিমদের জন্য মসজিদ রয়েছে। এই মসজিদগুলো আমাদের দেশের মসজিদের মতো পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের পর তালা দিয়ে রাখা হয় না। এই মসজিদগুলোতে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত সলাতই হয় না এছাড়া রয়েছে নানা রকম কমিউনিটি সার্ভিসেস। একেকটা মসজিদ একেকটা কমিউনিটি সেন্টারও বটে। যেমন ঃ এখানে বিয়ে-সাদী হয়, বিয়ের অনুষ্ঠান হয়, আকীকা হয়, কনফারেন্স হয়, সেমিনার হয়, ওয়ার্কশপ হয়। এখানকার ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া উচ্চ শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকেই মানসিকভাবে গড়ে উঠে যে মসজিদ হচ্ছে সবচেয়ে

উন্নত স্থান। বিয়ের সময় তারা মনে করে না যে তাদের বিয়ে কোন আধুনিক কমিউনিটি সেন্টার বা হোটেলে হচ্ছে না কেন! বিয়ে ছাড়াও কমিউনিটির অন্যান্য প্রোগ্রামও মসজিদগুলোতে নিয়মিত হয়। প্রায় সকল মুসলিম পরিবারগুলোই এই মসজিদগুলোর সাথে নিয়মিত সংস্পর্শে থাকে।

- ইউরোপ-আমেরিকা-ক্যানাডা-অস্ট্রেলিয়ার একেকটা মসজিদ একেকটা ইনস্টিটিউট অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বটে। প্রায় প্রতিটি মসজিদের সাথেই রয়েছে অত্যাধুনিক ইংলিশ-আরবি মিডিয়াম স্কুল। এই স্কুলগুলো আমাদের দেশের গতানুগতিক মাদ্রাসার মতো নয়। এখান থেকে ছেলেমেয়েরা একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহর নৈতিক শিক্ষাও গ্রহণ করে থাকে। একটি ছেলে বা মেয়ে আল-কুরআনে হাফিজও হয় আবার তার পাশাপাশি একজন সফল ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারও হয়। এই ধরণের ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারাই মসজিদগুলোতে ইমামতি করেন, জুম্মার খুতবা দেন।

- এখানকার মসজিদগুলোতে ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা নানারকম রিক্রিয়েশনের ব্যবস্থা থাকে। যেমন ঃ মুসলিম বাবা-মায়েরা বিকেলে এবং বন্ধের দিনগুলোতে সন্তানদের নিয়ে মজজিদে চলে যান। সেখানে ছেলেরা আলাদা এবং মেয়েরা আলাদা টেবিল টেনিস, বাসকেট বল, ব্যাডমিন্টন, ফুটবল, হকি ইত্যাদি খেলে সময় কাটায়। এছাড়া রয়েছে কম্পিউটার ও ইন্টার্নেট ফ্যাসিলিটি।

- প্রতিটি মসজিদে রয়েছে মহিলাদের জন্য সলাতের খুব ভাল ব্যবস্থা। পিতা-মাতারা সন্তানদের সাথে নিয়ে পুরো পরিবারসহ মসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করেন। অনেক মহিলারাই ওয়াক্তের সলাত, জুমু'আর সলাত, রমাদানে তারাবীর সলাত এবং রমাদানের শেষ দশদিনে তাহাজ্জুদের সলাত মসজিদে গিয়ে আদায় করেন। বিশেষ করে ইউনিভার্সিটির মুসলিম মেয়েরা শুক্রবারে তাদের ক্লাশের ফাঁকে মসজিদে গিয়ে জুম্মার নামায পড়ে আসে। জামাতে সলাতের সময় বড়রা শিশু-কিশোরদেরকে একই লাইনে তাদের সাথে দাঁড় করান, পিছনে ঠেলে দেন না। অনেক মসজিদ থেকেই তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ সলাত ভিডিও টেলিকাস্ট করা হয়ে থাকে কারণ যে সকল মা-বোনরা এবং বয়স্করা মসজিদে আসতে পারেননি তারা যেন বাসায় বসে তা উপভোগ করতে পারেন। সবচেয়ে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, কোন কোন মসজিদে তারাবীর চেয়ে তাহাজ্জুদে মুসল্লি বেশী হয়।

- রসূল (সা.)-এর সময় এই মসজিদই ছিল পার্লামেন্ট, বঙ্গভবন, হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট, সেকরেটারিয়েট এবং নামাযের জায়গা ।

মৃতব্যক্তিকে নিয়ে নানা রকম কান্ড

- অনেকে জীবিত অবস্থায় ঠিক মতো ধর্ম-কর্ম পালন করেন না, বরং ধর্ম-কর্ম নিয়ে নানারকম বিপরীত লেখালেখি করেন, নানারকম আজেবাজে মন্তব্য করেন। যে নাকি জীবিত অবস্থায় এক ওয়াক্তও নামায পড়তো না কিন্তু দেখা যায় যে তার মৃত্যুর পর তার ভক্তরা এবং তার আত্মীয়-স্বজনরা তার জানাজার নামায নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়, তাকে মসজিদের পাশে কবর দেয়ার জন্য হৈ-হুল্লা করে ।
- মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় অর্থাৎ কবরে লাশ রাখার সময় আমরা বলি "*বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা সুন্নাতি রসূলিল্লাহি*" অর্থ ঃ (আমরা এই লাশ) আল্লাহর নামে এবং রসূল (সা.)-এর আদর্শের উপর রাখছি। অথচ এই লোকটি জীবিত থাকা অবস্থায় সারাজীবন আল্লাহর বিরোধীতা করেছে, ইসলামের বিরোধীতা করেছে, রাসূল (সা.)-এর আদর্শের বিরোধীতা করেছে। তার মৃত্যুর পর আমরা তার লাশকে কবরের মধ্যে রেখে যাচ্ছি আল্লাহ এবং রসূল (সা.)-এর আদর্শের উপর। বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখার ।

মৃত্যুর পর ইসলামের ব্যবহার

- আমাদের দেশের অবস্থা দেখে মনে হয় মানুষের মৃত্যুর পরই ইসলামের ব্যবহার বেশী হয়, যদিও ইসলাম এসেছে জীবিতদের জন্য। মৃতদের ঘিরে আমরা যেসকল কাজগুলো করি এর মধ্যে আবার অনেক কাজই ইসলামের অংশ নয়। যেমন ঃ
- কোন আত্মিয় মারা গেলে হুজুর ভাড়া করে এনে নানা রকম খতম পড়ানো যেমন ঃ জালালী খতম, সবীনা খতম ইত্যাদি। বা কেউ মৃত্যুশয্যায় থাকলে তার শিয়রে বসে সূরা ইয়াসিন পড়া, অনেকে মিলে সোয়া লক্ষবার খতমে ইউনুস পড়া, খতমে খাজেকান পড়া ।

- তারপর লাশ কাফন-দাফন করানো, টুপি না থাকলেও পকেটের রুমাল মাথায় বেধে টুপির কাজ চালিয়ে নেয়া। তারপর আগরবাতি, মোমবাতি এবং ফুল নিয়ে কবরস্থানে যাওয়া। কবরে সুন্দর করে বেড়া দেয়া ইত্যাদি।

- মৃতবাড়ির লোকজন কিছুদিন নামায পড়া, নফল রোযা রাখা, গরীব মিসকিনদের খাওয়ানো, দান-খয়রাত করা, মহিলারা কিছুদিন মাথায় গোমটা দেয়া, পুরুষরা কিছুদিন পাঞ্জাবী-পায়জামা ব্যবহার করা, মাঝে মাঝে মসজিদে গিয়ে জামাতে নামায পড়া, তছবি হাতে রাখা, সিডি-ডিভিডিতে কুরআন তিলাওয়াত বাজানো, কিছুদিন টিভিতে নাচ-গান-নাটক না দেখা বা কম দেখা, হাসি-তামাসা কম করা ইত্যাদি।

- তিনদিনের দিন গরু-ছাগল জবাই দিয়ে শতশত লোক দাওয়াত দিয়ে কুলখানি করা। তার পর একইভাবে চল্লিশ দিনের দিন চেহলাম বা চল্লিশা করা।

- তারপর প্রতি বছর বছর শতশত লোক দাওয়াত দিয়ে অনুষ্ঠান করে মৃতব্যক্তির স্মরণে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা।

- তারপর শ্বেত পাথর, মাবেল পাথর বা টাইলস দিয়ে কবরকে বাঁধাই করা। মাঝে মাঝে কিছু হুজুর ভাড়া করে নিয়ে গিয়ে কবরের কাছে কুরআন তিলালাওয়াত করানো এবং দু'আ-দুরুদ পড়ানো।

- কুরআনে একটি আয়াতও নেই মৃত মানুষের জন্য। যা আছে সব জীবিতদের জন্য। অথচ আমরা কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাচ্ছি ডেডবডিকে। ডেডবডিকে শুনাচ্ছি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ যা প্রয়োজন ছিল জীবিত অবস্থায়।

অন্যান্য ফরয হুকুম ঠিক মতো পালন না করা

- মুসলিমদের ঠিক মতো যাকাত না দেয়া, রমজানে ঠিক মতো রোযা (সিয়াম) পালন না করা, হজ্জের সামর্থ্য থাকা সত্বেও হজ্জ না করা, সাবালিকা হওয়ার পরও পর্দা না করা, হালাল-হারাম বেছে না চলা, ইসলামের দাওয়াতী কাজ না করা, প্রতিবেশীর হক আদায় না করা, বাবা-মার হক আদায় না করা, গরীব আত্মীয়ের হক আদায় না করা, এতিমের হক আদায় না করা ইত্যাদি।

ইসলামিক কালচার অনুসরণ না করা

- ইসলামিক কালচার একজন মুসলিমের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তাই ইসলাম মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর উপর খুব জোর দিয়েছে। আল্লাহর কুরআন ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসে এর নানাদিক বর্ণনা করা হয়েছে এবং নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলিমকে তা পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে কুরআন-হাদীস নির্দেশিত নিয়মগুলো মেনে চলার চর্চা যত অধিক করবে, একজন মুসলিম তত অধিক আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে পারবে। অন্যদিকে এই নিয়মগুলো অবহেলা করলে সে ইসলামের মূল শিক্ষা হতে দূরে সরে যাবে, ফলে আল্লাহর প্রিয় সে হতে পারবে না। এটা একটা সুস্পষ্ট ক্ষতি বটে। অথচ আমাদের দেশে খুব কম পরিবারই পাওয়া যাবে যেখানে ইসলামি কালচাবের প্রচলন রয়েছে। ইসলামি কালচারের মধ্যে রয়েছে যেমন ঃ

১. নবী মুহাম্মাদের নাম মুখে বললে অথবা অন্য কাউকে বলতে শুনলে “সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম” (তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলা। এটা একটা দু’আ রসূলের জন্যে। তাঁর সহীহ হাদীস মেনে চলা অতি জরুরী।

২. অন্য সব নবীদের নাম নিলে “আলাইহিস সালাম”(তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলা।

৩. সাহাবীদের কারো নাম মুখে বললে পুরুষ হলে “রাদিআল্লাহু আনহু” বলা এবং নারী হলে “রাদিআল্লাহু আনহা” (আল্লাহ তাদের উপর রাজী হোন) বলা।

৪. কিছু করার শুরুতে “বিসমিল্লাহ” (আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি) বলা। এবং নিজ বাসায় ঢুকার সময়ও বিসমিল্লাহ বলে ঢুকা।

৫. কোন সুসংবাদ শুনলে অথবা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে “আলহামদুলিল্লাহ” (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর) অথবা “মাশা-আল্লাহ” (আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন) বলা। আল্লাহর দেয়া সব নিয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ঘনঘন ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলা।

৬. কেউ বিদায় নেয়ার কালে তাকে “ফী আমানিল্লাহ” (আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখুন) বলা।

৭. আশ্চর্যজনক কিছু শুনলে অথবা প্রশংসা করতে চাইলে "সুবহান আল্লাহ" (আল্লাহ অতি পবিত্র ও মহান) বলা।

৮. কাউকে কিছুর জন্যে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানাতে হলে "জাযাকাল্লাহু খাইরান" (আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরষ্কার/বিনিময় দিন) বলা।

৯. কোন সমস্যায় পড়লে "তাওয়াক্কালুল্লাহ" (আমি আল্লাহর উপর নির্ভর করি) বলা।

১০. হাঁচি দিলে "আলহামদুলিল্লাহ" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য) বলা।

১১. অন্য কেউ হাঁচি দিতে শুনলে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" (আল্লাহ তোমার উপর রহমত করুন) বলা।

১২. কোন খারাপ কাজ করে ফেললে অথবা কোন নোংরা/আপত্তিকর কিছু হতে দেখলে অথবা তেমন সংবাদ শুনলে "আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ" (হে আল্লাহ! তোমার কাছে ক্ষমা চাই) বলা।

১৩. ঘৃণা প্রকাশ করতে হলে "নাউজুবিল্লাহ" (আমি আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি) বলা।

সালামের সঠিক ব্যবহার না করা

- আমাদের দেশে দেখা যায় যে, কোন অপরিচিত লোক কাউকে রাস্তা-ঘাটে সালাম দিলে ঐ ব্যক্তি সালামের উত্তর না দিয়ে সর্ব প্রথমে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন যে "ভাই আপনাকে তো চিনলাম না"! আমাদের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে সালাম শুধু দিবে চেনা লোককে। অথচ রসূল (সা.)-এর প্র্যাকটিস ছিল পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে বেশী বেশী সালাম দেয়া, কারণ সালাম হচ্ছে একে অপরের জন্য দু'আ। দু'আ করার জন্য পরিচয় জানা জরুরী নয়।

- আবার দেখা যায় যে, অপরিচিত কেউ সালাম দিলে আমরা উত্তর দিতে সংকোচ বোধ করি। তখন মনে হয় যে, লোকটি সালাম দেয় কেন? কোন উদ্দেশ্য আছে নাকি? আমাদের পরিচিত এক মাদ্রাসার শেষ বর্ষের ছাত্র দুঃখ করে বলেছিলেন যে, "আমরা কাউকে সালাম দিলে অপর পক্ষ সালামের উত্তর দিতে উৎসাহবোধ করেন না, হ্যান্ডসেক করতে গড়িমসি

করেন। তারা মনে করেন যে এই হুজুর প্রকৃতির লোকটি আবার কোন সাহায্য চাইবে নাতো?”

- সালাম দেয়াটাকে অনেকেই ইসলামি কালচার মনে করেন না, ভাবেন এটা সৌদি আরবের কালচার। যেমন অনেকে মনে করেন বোরকা পরাও সৌদি আরবের কালচার।

- আমাদের মধ্যে একটি ভুল ধারণা বিদ্যমান আছে যে বড়রা সবসময় ছোটদের থেকে সালাম আশা করেন। যেমন, শিক্ষক আশা করেন ছাত্রদের থেকে, বাবা-মা আশা করেন সন্তানদের থেকে, ইমাম সাহেব আশা করেন মুসল্লিদের থেকে। কিন্তু সালাম হচ্ছে একে অপরের জন্য দু'আ করা যার অর্থ হচ্ছে “তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।” রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কখনো কেউ আগে সালাম দিতে পারতেন না এবং তিনি ছোটদেরকেও সালাম দিতেন। যেমন ইসলামের নিয়ম অনুসারে সালামের প্রচলন হওয়ার কথা ছিল ঃ

১. সবাইকে সালাম দেয়ার অভ্যেস করতে হবে। হতে পারে সে ছোট বা বড় বা বন্ধু।

২. বাসায় ঢুকেই বাসার সকলকে সালাম দিতে হবে।

৩. খালি বাসায় ঢুকেও সালাম দিতে হবে, কারণ ঘরে রহমতের ফিরিশতা থাকে।

৪. ঘুম থেকে উঠে বাসায় যার সাথে দেখা হবে তাকেই সালাম দিতে হবে।

৫. ঘুমাতে যাওয়ার আগে সাবাইকে সালাম দিয়ে ঘুমাতে যেতে হবে।

৬. মসজিদে ঢুকেই সালাম দিতে হবে, কেউ ভেতরে থাকুক আর নাই থাকুক। খালি মসজিদেও ফিরিশতা থাকে।

৭. ফোন আসলে রিসিভার উঠিয়েই আগে সালাম দিতে হবে।

৮. কোথাও ফোন করলে সর্বপ্রথমে সালাম দিয়ে শুরু করতে হবে।

৯. ফোনে কথোপকথোন শেষ হলে সালাম দিয়ে ফোন রাখতে হবে।

১০. কারো বাসায় গেলে প্রথমে ঢুকেই সালাম দিতে হবে।

১১. রাস্তা-ঘাটে মুসলিম কারো সাথে দেখা হলেই তাকে সালাম দিতে হবে। হতে পারে সে অপরিচিত।

১২. কারো থেকে বিদায় নেয়ার সময় সালাম দিতে হবে।

১৩. ভুল সংশোধন ঃ সালামকে বিকৃত করা যাবে না অর্থাৎ "স্লামুয়ালাইকুম" বলা যাবে না, কারণ এই বিকৃত সালামের কোন অর্থ হয় না। তাদেরকে বলতে হবে সম্পূর্ণ সালাম পরিষ্কারভাবে দিতে "আস্সালামু আলাইকুম"।

ইসলাম যা বলে আমরা তার উল্টোটা করি

- **গোপনে দান** ঃ ইসলাম বলে ডান হাত দিয়ে দান করলে বাম হাত যেন না জানে। কিন্তু আমরা চাই সবাই যেন জানে, কোন না কোনভাবে যেন দানটা প্রকাশ পায়।

- **সদাকার প্রকৃত সওয়াব** ঃ দানকারী দান করে মনে করে যে সে গরীবের অনেক উপকার করছে। আসলে গরীব সদাকা গ্রহণ করে সদাকারীর উপকার করেন। কারণ সদাকা গ্রহণকারী সদাকা গ্রহণ না করলে দানকারী আল্লাহর থেকে পুরষ্কার পেতো না।

- **দানের বিনিময়** ঃ ইসলাম বলে পুরষ্কার যে দান করে তার বিনিময়ে দান গ্রহণকারীর নিকট হতে কোন প্রকার প্রতিদান আশা করা যাবে না। দান হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য। কিন্তু দান করে দাতা কোন না কোনভাবে দান গ্রহীতার নিকট থেকে প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, সম্মান ইত্যাদি আশা করে।

- **দান করে খোঁটা না দেয়া** ঃ আল কুরআনের কড়া নির্দেশ হচ্ছে দান করে কাউকে খোঁটা দেয়া যাবে না। যেমন, তোমাকে তো আমি অনেক দিয়েছি, তোমার জন্য তো আমি অনেক করেছি। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দান করে আবার খোঁটা দেই, তাদেরকে দানের কথা মনে করিয়ে দেই। এতে দানের ফযিলত বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

- **হাজ্জ ফরয হিসেবে আদায়** ঃ সলাত-সিয়াম-যাকাতের মতো হাজ্জও একটি ফরয ইবাদত, সামর্থ্যবানদের জন্য এটি জীবনে একবার ফরয। কিন্তু হাজ্জ আদায় করার পর কোন না কোন ভাবে আমরা চাই লোকে

আমাকে এখন আগের চেয়ে বেশী সম্মান করুক, বেশী পরহেজগার মনে করুক বা হাজী সাহেব বলে ডাকুক।

- **কুরবানী হতে হবে শুধু মাত্র আল্লাহর জন্য** ঃ যে কোন পশু কুরবানী করতে হবে একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য। মানুষকে দেখানোর জন্য এটা করা যাবে না। অনেকেই কুরবানী ঈদে কুরবানী নিয়ে এক প্রকার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠে যে, কে কত বড় গরু কুরবানী দিচ্ছে! কে কয়টি গরু কুরবানী দিচ্ছে!
- **বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্ব** ঃ বাবা-মা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাদেরকে এতো বেশী করে যত্ন করতে হবে যে তারা যেন উহ্ শব্দটিও না বলতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বাবা-মা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাদেরকে আমরা বোঝা মনে করি। সন্তানরা সবাই মিলে বৃদ্ধ বাবা-মাকে নিয়ে ঠেলা-ঠেলি করি যে কার কাছে থাকবে।
- **গীবত করা** ঃ গীবত করা একটি কবীরা গুনাহ এবং গীবত করা নিজ মরা ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সমতুল্য। অথচ অন্যের গীবত করতে আমাদের খুবই মজা লাগে। যে কোন আড্ডায় অনুপস্থিত কোন ভাই বা বোনকে নিয়ে সমালোচনা করতে খুবই আনন্দ উপভোগ করি।
- **হিংসা করা** ঃ হিংসা করা কবীরা গুনাহ এবং যার অন্তরে তিল পরিমান হিংসা থাকবে সে জান্নাতে যেতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবে অন্যের ভাল দেখলে সহ্য করতে পারি না। কেউ বাড়ি কিনলে, গাড়ী কিনলে, ভাল চাকুরী পেলে, সন্তানদের পরীক্ষায় ভাল ফলাফল দেখলে হিংসায় মরে যাই।
- **অন্যের প্রশংসা** ঃ অন্যের ভালোর জন্য দু'আ করতে হয় আরো ভাল করার জন্য প্রশংসা করতে হয়, উৎসাহ দিতে হয়। কিন্তু বাস্তবে অন্যের প্রশংসা শুনতেই পারি না, গা জ্বালা-পোড়া করে।
- **ভালটি অন্যের জন্য** ঃ ইসলাম বলে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অপর ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে যখন কোন কিছু কিনি তখন নিজের জন্য ভাল ভাল দেখে উৎকৃষ্টটা কিনি আর অপর ভাইয়ের জন্য উপহারস্বরূপ একটু কমদামী দেখে কিনি।

- **সত্য প্রকাশ করা** ঃ ইসলাম বলে সত্য বলা ফরয। কিন্তু বাস্তবে সত্য প্রকাশ করতে আমরা লজ্জা পাই। যেমন, আমি ছোট চাকুরী করি বা আমার ঢাকায় বাড়ি নেই বা আমার ডিগ্রি কম বা আমার শ্বশুর বাড়ি গরীব ইত্যাদি।

- **পর্দা করা ফরয** ঃ সলাত আদায় করা যেমন ফরয তেমনি নারীদের পর্দা করাও ফরয এবং তাদের সাজগোজ, রূপ-সৌন্দর্য্য পর পুরুষ থেকে ঢেকে রাখাও ফরয। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মেয়েরা সাধারণত সাজগোজ করে থাকে অন্যকে দেখানোর জন্য এবং রূপ-সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে কোন অনুষ্ঠানে গেলে। খুব কম মেয়েই আছে যে শুধু স্বামীকে দেখানোর জন্য সাজগোজ করে।

ভুল পন্থায় ঈদ উদযাপন ও রমাদানের পরের চিত্র

আমরা বিদায় জানাচ্ছি মহান রমাদানকে। এই তো বিদায় দিচ্ছি কুরআন তিলাওয়াত, তাকওয়ার অনুশীলন, ধৈর্য, রহমত, মাগফিরাত ও মুক্তি লাভের মুবারক মাসটিকে। তাহলে কি আমরা প্রকৃত তাকওয়া অর্জন করতে পেরেছি? যে ব্যক্তি মুবারক মাসটিতে নিজেকে সংশোধন করতে পারল না সে আর কখন নিজের জীবন গঠন করবে? মহান রমাদান এমন একটি মাস যাতে এ সময়টিকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে আমরা শরিয়ত-পরিপন্থী আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ ও চরিত্র সংশোধন করে নিজেদের আমল ঠিক নিতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ পর্যন্ত কোন জাতির পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করে নেয়।" (সূরা রা'দঃ ১১)

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা, লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো আমরা রমাদানে আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছি তা ভঙ্গ করার অনেক চিত্রই রমাদান শেষ হওয়ার সাথে সাথে সমাজে ফুটে উঠে। যেমন ঃ

- পুরো রমাদান মাস তারাবীহর (সুন্নত) সলাতে মুসল্লি দ্বারা মসজিদ পরিপূর্ণ থাকার পর অন্য মাসগুলোতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সলাতে মুসল্লির সংখ্যা

কমে যায়। তার মানে ফরযের চেয়ে সুন্নাতকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে তাই সুন্নাত সলাতে মসজিদ ভরে যাচ্ছে কিন্তু ফরয পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে এক কাতারও পূর্ণ হচ্ছে না!

- সারা রমাদান মাস তাকওয়া অর্জন করে ঈদ উদযাপন করা হচ্ছে নাচ-গান ও সিনেমা এবং ইসলাম-বিরোধী কর্মকান্ড দিয়ে। ঘরে ঘরে নারীপুরুষের ফ্রী মিক্সিংয়ের মাধ্যমে ঘরোয়া পার্টি দিয়ে।

- টিভি চ্যানেলগুলো সপ্তাহব্যাপী নানারকম অনুষ্ঠান প্রচার করে। এক চ্যানেলের সাথে অপর চ্যানেলের প্রতিযোগিতা, কে কত নাটক-সিনেমা-নাচ-গান, ফ্যাশন শো, ম্যাগাজিন ইত্যাদি দেখাতে পারে। সারা মাস রোযা রেখে ঈদের দিন থেকেই মুসলিমরা টিভির সামনে রিমোট হাতে বসে যায় অনৈসলামিক অনুষ্ঠান দেখতে।

- আমাদের দেশে দেখা যায় রমাদান মাসে জাঁকজমক করে পত্রিকায় এবং টিভিতে বিজ্ঞাপন দেয়া হয় যে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে এবার সারা দেশব্যাপী সিনেমা হলগুলোতে মুক্তি পাচ্ছে নাচেগানে মনমাতানো এবং প্রেমের ছবি "মাস্তান ও ধনীর দুলালীর প্রেম"। এই হচ্ছে একমাস তাকওয়া অর্জনের পর পবিত্র ঈদের উপহার।

- শুধু রমাদান মাসে পর্দা করা আর রমাদানের পরে ঈদের দিন থেকেই পর্দা ছেড়ে দেয়া। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় আমাদের দেশে টিভিতে রমাদান মাস এলে মহিলারা খবর পড়ার সময় মাথায় কাপড় দেন আর ঈদের দিন থেকে মাথার কাপড় সরিয়ে নেন।

- এত বড় নিয়ামতের এটাই কি শোকর আদায়, এটাই কি আমল কবুল হওয়ার নিদর্শন? নিশ্চয়ই নয়। বরং এটা আমল কবুল না হওয়ার আলামত। কেননা প্রকৃত সিয়াম পালনকারী ঈদের দিন সিয়াম ছেড়ে দিয়ে আনন্দিত হবে এবং সিয়াম পূর্ণ করার তাওফীক পাওয়ার দরুন তার প্রতিপালকের প্রশংসা করবে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সাথে সাথে এই ভয়ে কাঁদবে যে, না জানি আমার সিয়াম কবুল হয়নি। আমাদের পূর্বসূরীগণ রমাদানের পর ছয় মাস পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে সিয়াম কবুল হওয়ার দু'আ করতেন। আমল কবুল হওয়ার আলামত হল, পূর্ববর্তী অবস্থার চেয়ে বর্তমান অবস্থা উন্নত হওয়া। সত্যিকার মু'মিন বান্দা সর্বদাই

আল্লাহর ইবাদত করবে। কোন নির্দিষ্ট মাস, জায়গা অথবা জাতির সাথে মিলে আমল করবে না।

যাকাতের সঠিক ব্যবহার না করা

আল্লাহ বলেছেন ঃ তাদের জন্যে দুর্ভোগ যারা যাকাত দেয় না (কুরআন ৪১ ঃ ৭)

- বেশীরভাগ মুসলিমই প্রতি বছর হিসাব করে ঠিক মতো যাকাত আদায় করেন না। যাকাত যাতে আদায় না করতে হয় বা যত কম যাকাত দেয়া যায় সে জন্য হুজুরদের কাছে যাওয়া হয় নানা রকম ফতোয়ার জন্যে।
- অনেকেই যাকাত দিয়ে থাকেন কমদামি শাড়ি ও লুঙি। আর এই সকল নিম্নমানের শাড়ি ও লুঙি তৈরীর জন্য এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ফ্যাক্টরী খুলে বসেছে। তারা এই পণ্যের নামই দিয়েছে যাকাতের শাড়ি ও লুঙি। এতেই সবাই বুঝে যায় যে এই কাপড় সাধারণ লোকদের জন্য না। অথচ মহান আল্লাহ বলছেন তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ করবে তা অপর ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করবে। কিন্তু আমরা করছি তার উল্টো।
- যাকাতের এই কাপড় এতোই নিম্নমানের যে একবার বা দুবার ধোয়া হলেই দফা শেষ। এক শ্রেণীর বড়লোক ঘটা করে প্রচার করে যাকাতের এই নিম্মমানের শাড়ি-লুঙি বিতরণ করতে গিয়ে ভির সামলাতে না পেরে প্রতি বছর অনেক লোক মেরে ফেলেন।
- এই নিম্নমানের কাপড় বিতরণ ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না। আর যাকাত প্রদানের সাধারণ নিয়ম হলো কোন ব্যক্তি বা পরিবারকে যাকাতের টাকা দিয়ে এমনভাবে সাবলম্বী করে দেয়া যেন তার আর দ্বিতীয়বার যাকাত নিতে না হয় এবং তিনি যেন পরবর্তীতে অন্যকে যাকাত দিতে পারেন। কিন্তু আমরা যা করছি এতে গরীব গরীব-ই থেকে যাচ্ছে, সমাজের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না।

অনেক স্কুল-কলেজে মেয়েদের হিজাব ছিনিয়ে নেয়া হয়

- আজকাল দেখা যাচ্ছে অনেক স্কুল-কলেজেই মেয়েদেরকে হিজাব পরতে দেয়া হয় না, বোরকা পরতে দেয়া হয় না। অনেক জায়গায়ই হিজাব পড়ার

কারণে স্কুল-কলেজের কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদেরকে স্কুল-কলেজ থেকে বের করে দিয়েছেন। এমনও ঘটনা ঘটেছে যে ছাত্রীরা ফুল হাতা জামা পড়ে স্কুলে যাওয়ার কারণে স্কুলের প্রিন্সিপাল ও কর্তৃপক্ষ কেচি দিয়ে ছাত্রীদের জামার হাতা কেটে দিয়েছেন। আমরা জানি যে স্কুল-কলেজ হচ্ছে চরিত্র গঠনের প্রতিষ্ঠান। একটি মুসলিম মেয়ের হিজাব হচ্ছে তার চরিত্রের একটি মূল্যবান অংশ। আর যে স্কুল-কলেজের প্রিন্সিপাল বা শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রীদের চরিত্রের মূল্যবান অংশ পোষাক খুলে নেয় সেই জায়গাতো চরিত্র গঠনের জন্য নয় বরং চরিত্র হরণের জায়গা। তাই কুরআন-সুন্নাহ মতে ও ইসলামিক স্কলারদের মতে সেইসকল স্কুল-কলেজে মেয়েদের পড়ানো জায়েজ নেই। সন্তানদেরকে সেই সকল স্কুল-কলেজে পাঠনো ঠিক নয়। হতে পারে তাদের লেখা-পড়ার মান অনেক উন্নত। কিন্তু সন্তানের চরিত্রই যদি চলে যায় তাহলে আর ঐ উন্নতমানের পড়াশোনা দিয়ে কী হবে! যে স্কুল-কলেজ সন্তানদের চরিত্র গঠনের জন্য সহায়তা করে সেখানে পাঠাতে হবে। প্রয়োজনে নিজেদের এই ধরণের আরো অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

- শিক্ষণীয় হিসেবে ভুক্তভুগী একজন ছাত্রীর বক্তব্য তুলে ধরা হলো। আমরা পত্রিকায় দেখেছি যে, ঢাকার উত্তরার একটি স্কুলের কর্তৃপক্ষ হিজাব পরিহিতা মেয়েদেরকে স্কুল থেকে বহিস্কার করে দিয়েছে। স্কুলের কর্তৃপক্ষের অভিযোগ যে মেয়েদেরকে হিজাব পড়তেই হবে কেন? তখন তাদের মধ্য থেকে একটি মেয়ে উত্তরে বলেছিল যে,"যে মহান আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত (নামায) আদায় ফরয করেছেন, তিনিই মেয়েদের জন্য পর্দা বা হিযাব ফরয করেছেন, যার হুকুম পালন করার জন্য আমরা পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করি, তারই হুকুম পালন করার জন্য আমরা হিযাব বা পর্দা করি"।

তরুণদের ভাবনা

- এক তরুণের বক্তব্য। সে তার বন্ধু মহলে আড্ডার মাঝে কুরআন থেকে দু'একটা পয়েন্ট তুলে ধরেছে। এতে অন্যান্য বন্ধুরা মন্তব্য করছে যে, "তোর মাথায় ইসলামের ভূত চেপেছে, ইসলাম তোর ব্রেইন ওয়াশ করে দিয়েছে"। আমরা একটু গভীরে চিন্তা করে দেখি। যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই পৃথিবীতে সুখে শান্তিতে থাকার জন্য একটি সুন্দর

জীবন বিধান দিয়ে দিয়েছেন আর আমাদের তরুণ সমাজ তাকে বলছে ভূত, তাকে বলছে ব্রেইন ওয়াশ!

- আমাদের তরুণ সমাজ আজকাল ইসলামকে শত্রু ভাবছে। তারা ইসলামকে ভয় পায়। তাদের ধারণা ইসলাম পালন করলে হয়তো জীবনে অনেক কিছুই করা যাবে না। এখন যা ইচ্ছে করছি তা হয়তো আর করা যাবে না। তারা ইসলামিক বই পড়ে মজা পায় না, এছাড়া তারা ইসলামিক বই পড়তেও চায় না।

- আমাদের ট্রেডিশনাল হুজুররা অনেক সময় ইসলামকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন যে, তরুণ সমাজের কাছে তা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তারা সারাক্ষণ নেগেটিভ ওয়াজ করতে থাকেন যে এইটা করা যাবে না... ঐটা করা যাবে না... ইত্যাদি ইত্যাদি। তারা কোন আশার আলো দেখান না। যার কারণে তরুণরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। হুজুরদের বক্তব্যের মধ্যে হয়তো কোথাও একটা বড় ধরণের গ্যাপ রয়েছে, যার কারণে কঠিন মনে হয়। আসলে ইসলাম মানুষের জীবনকে কঠিন করার জন্য আসেনি, এসেছে আরো সহজ করার জন্য।

- আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে, ইসলাম Extremism সমর্থন করে না। ইসলাম আত্মঘাতি বোমা হামলা (Suicide bombing) সমর্থন করে না। এগুলো ইসলামের অংশ নয়। কেউ বা কোন দল যদি এই ধরণের সন্ত্রাসীমূলক কর্মকান্ড করে তাহলে বুঝতে হবে যে এর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই, এটা তার বা তাদের নিজস্ব বিষয় এবং এর জন্য সে নিজে বা তারা দায়ী। এর জন্য তাদেরকে আখিরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখিন হতে হবে। ইসলামের শত্রুরা মিডিয়ার মধ্যমে এই অপকর্মগুলোকে ইসলামের সাথে সংযুক্ত করে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায়।

‘মধ্যযুগ’ বা ‘আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ’ নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি

- প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় এবং টিভি চ্যানেলগুলোতে দেখা যায় যে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা বলেন যে ইসলাম দ্বারা দেশ চালালে দেশ আবার মধ্যযুগে

ফিরে যাবে, দেশ আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে চলে যাবে, দেশ ১৪শ বছর পিছিয়ে যাবে।

- আমাদের কাছে হয়তো এই বিষয়টা পরিষ্কার না যে, আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ বলতে আসলে কী বুঝায়? এই বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার জন্য আমাদের মুহাম্মাদ (সা.)-এর বিস্তারিত জীবনী পড়া প্রয়োজন। মুহাম্মাদ (সা.) ৪০ বৎসর বয়সে নবুওত পেয়েছেন (৬১১ খৃষ্টাব্দে)। নবুয়ত পাওয়ার বছর থেকে শুরু করে মোট ২৩ বছর সময় ধরে কুরআন নাযিল হয়েছে। আল কুরআনের একেকটা আয়াত নাযিল হয়েছে আর তিনি তা সমাজে বাস্তবায়ন করেছেন। আল কুরআনের এই একেকটা আয়াতই হচেছ ইসলাম। পরিপূর্ণ ইসলাম আসার আগ পর্যন্ত সময়টাকে বলা হয় আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ। আইয়ামে জাহিলিয়াত আরবী শব্দ এর মানে হচ্ছে অজ্ঞতার যুগ। ঐ সময়ে মানুষ ইসলাম বিরোধী সকল কাজ-কর্ম করতো। এখন আমরা নিজেদেরকে নিজে প্রশ্ন করতে পারি যে, ইসলাম সমাজে প্রতিষ্ঠা হলে কিভাবে দেশ আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে চলে যাবে? ইসলামের মাধ্যমেইতো আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ পরিবর্তন হয়ে সুস্থ সমাজে ফিরে এসেছে। আল কুরআনের একেকটা আয়াত নাযিল হয়েছে আর জাহিলিয়াতের যুগের একেকটা অন্যায় ও অপকর্ম দূর করা হয়েছে।

- ইসলাম আসার আগ পর্যন্ত সময়টা ছিল আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ। বরং এখন দেখা যাচ্ছে আমরা মুসলিমরা দিন দিন ইসলাম ত্যাগ করে সমাজকে আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। যেমন একটি বাস্তব উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরো পরিস্কার হবে। আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে মেয়েরা সংক্ষিপ্ত কাপড় পরতো, অশালিন পোষাক পরে পর পুরুষকে আকর্ষণ করতো। এতে পুরুষরাও উত্তেজিত হতো, মেয়েদেরকে রাস্তা-ঘাটে ইভটিজিং (Eve Teasing) করতো, অসম্মান করতো। ইসলাম এসে মেয়েদেরকে সঠিক কাপড় পরিয়েছে, শালিন পোষাক দিয়েছে, বখাটেদের হাত থেকে রক্ষা করে অসম্মান থেকে সম্মান দিয়েছে। আর আজকে এই শতাব্দিতে এসে আমাদের মেয়েরা আবার আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগের ন্যায় সংক্ষিপ্ত কাপড় পরছে, অশালিন পোষাক পরে বাইরে যাচ্ছে আর নিজেরা পরপুরুষের কাছে অসম্মানিত হচ্ছে, সমাজে ইভটিজিংয়ের পরিমান বাড়িয়ে দিচ্ছে, নিজেদের বিপদ ডেকে আনছে।

২য় পরিচ্ছেদ

বিজাতীয়দের প্রভাব

- আমাদের সন্তানদের ইসলাম বিমুখ করার পেছনে যতোগুলো শক্তি কাজ করছে তার মধ্যে অন্যতম হলো বিজাতীয় দেশ। ইসলামের শত্রুরা সুকৌশলে আমাদের মধ্যে তাদের অশ্লিল সংস্কৃতি ঢুকিয়ে দিচ্ছে।
- ডিস এবং ক্যাবল কানেকশনের কারণে শতশত বিজাতীয় চ্যানেল আমাদের দেশে প্রচারিত হচ্ছে। তাদের সিরিয়াল-নাটক-সিনেমা-নাচ-গান, ম্যাগাজিন, অখাদ্য-কুখাদ্য সব আমাদের মধ্যে চলে আসছে।
- এখন এমন হয়েছে যে, বাংলাদেশের একটি ছোট্ট শিশুও হিন্দিতে কথা বলতে পারে এবং হিন্দি কথা বুঝে। অথচ ১৯৫২-তে আমরা উর্দুর কালো থাবা থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষার জন্য জীবন দিয়েছি। আর আজ উর্দুর বদলে হিন্দি এসে বাংলা ভাষাকে আক্রমণ করছে।
- বিজাতীয় ফ্যাশন ও সংক্ষিপ্ত কাপড়-চোপড়ে আমাদের বাজার সয়লাব।

মিডিয়ার প্রভাব

- কিছু জ্ঞানপাপী এবং বুদ্ধিজীবী অর্থলিপ্সায় পড়ে মিডিয়ার মাধ্যমে নিয়মিত ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে যাচ্ছেন।
- নাটক-সিনেমায় সাধারণত খারাপ চরিত্রের অভিনেতাদের মুখে দাড়ি লাগিয়ে, মাথায় টুপি পরিয়ে, পায়জামা-পাঞ্জাবি পড়িয়ে, মাথায় পাগড়ী

পড়িয়ে দেখানো হচ্ছে। ভাবখানা এমন যে হুজুর-মাওলানারা হলেন যত বাজে কাজের মূল।

- নাটক-সিনেমায় কোন মহিলাকে বোরকা পরিয়ে তাকে দিয়ে খারাপ কাজের অভিনয় করাচ্ছে। সমাজকে বুঝাতে চাচ্ছে যারা পর্দা করে যারা বোরকা পরে আসলে তারা বোরকার আড়ালে খারাপ কাজ করে থাকে।
- টিভিতে যেসব বিজ্ঞাপন দেয়া হয় তার বেশীরভাগই আপত্তিজনক, আমাদের ছেলেমেয়েরা সেগুলো থেকে কী শিখে? দিন দিন এগুলো দেখে তাদের কোমল অন্তরে কু-প্রভাব ফেলছে, তাদেরকে কু-শিক্ষা দিচ্ছে। আজ একটি শিশু ছেলে ছোট বেলা থেকেই টিভিতে দেখছে একটি যুবতী মেয়ে অর্ধনগ্ন হয়ে সাবান দিয়ে গোসল করছে বা একটি যুবক অপর একটি যুবতীর হাত ধরে দৌঁড়াদৌঁড়ি করছে।
- টিভিতে প্রায় প্রতিটি নাটক-ই প্রেমের নাটক। এছাড়া পরিবারের সবাই মিলে দেখছি কীভাবে পরকীয়া প্রেম করতে হয়। এই বিষয়টা যেন আমাদের দেশে খুবই স্বাভাবিক, এতে আপত্তিকর কিছু নেই!
- মোবাইল ফোন কম্পানী বিজ্ঞাপন দিচ্ছে যে একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে রাতভর গল্প করছে কারণ রাত ১২টার পর বিল কম বা ফ্রী টক টাইম।
- আমরা কি কখনো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি যে আমার কলেজ পড়ুয়া মেয়ে গভীর রাত পর্যন্ত একটা ছেলের সাথে গল্প করছে এর ফলে তার নৈতিক চরিত্র কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে? আর আমরা পিতামাতা হয়েও এগুলোতে কিছুই মনে করছি না!
- প্রতিদিন অনেকগুলো দৈনিক পত্রিকা বের হয়, এছাড়া বের হয় বিনোদনমূলক সাপ্তাহিক ও মাসিক। এই পত্রিকাগুলোর অনেক অংশ জুড়েই থাকে মেয়েদের অশ্লীল ছবি, বিজ্ঞাপন এবং নিউজ। যা বাসার সকলেই ঐ টিভির মতো নিউজ পড়ার পাশাপাশি অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও পড়ে উপভোগ করে থাকে।
- সঠিক ইসলামকে তুলে ধরার জন্যে ভালো মিডিয়া ও পত্র-পত্রিকা বা বইপত্র তেমন একটা নেই। বাজারে অনেক বই পাওয়া যায়, কিন্তু মানসম্পন্ন ও রুচিশীল ইসলামি বইয়ের খুব অভাব।

ড. জাকির নায়েকের শর্ত

- ড. জাকির নায়েকের একটি উচুমানের ইসলামিক স্কুল আছে। ড. জাকির নায়েক ক্যানাডার একটি কনফারেন্সে বলেছিলেন যে, তার এই স্কুল থেকে তার চেয়েও আরো উন্নতমানের শতশত জাকির নায়েক প্রতিবছর বের হবে, ইনশাআল্লাহ। এই স্কুলে সন্তান ভর্তি করার পূর্বশর্ত হচ্ছে "বাড়ি থেকে ডিশ এন্টেনার লাইন আগে কাটতে হবে"।

- সন্তানের চরিত্র গঠনে একটি ভারসাম্যপূর্ণ স্ট্রাটেজীর অংশ হিসেবে হলিউড-বলিউডের কুখাদ্যের বিপরীতে যে সকল পদক্ষেপ আমরা নিতে পারি তার মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ হলো নিজ বাড়িতে একটি পারিবারিক পাঠাগার (Family Library) প্রতিষ্ঠা করা। ছোটদের উপযোগী ইসলামি ডিভিডি, ভিসিডি ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারি। আল-কুরআনের তাফসীর, সহীহ হাদীস গ্রন্থ, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনী, ইসলামি অর্থনীতি, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামি সমাজ, চার খলিফার বিস্ত ারিত জীবনী, সাহাবীদের জীবনী, অন্যান্য নবীদের জীবনী, Comparative religion, ইসলামি শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে নিজ ঘরে একটি পারিবারিক ইসলামিক লাইব্রেরী তৈরী করতে পারি। নিজে পড়তে পারি, সন্তানদেরও পড়ার উৎসাহ দিতে পারি।

টিভিতে নিউজ বা খবর দেখা

- অনেক ইসলামিক পরিবার বাসায় ডিস এন্টেনার লাইন নিয়েছেন খবর (নিউজ) দেখার জন্য। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে খবর হচ্ছে মাত্র অল্প কিছু সময়। আর বাকী পুরো সময়টাতেই প্রচার হচ্ছে আনইসলামিক অনুষ্ঠান। পরিবারে বাবা-মা, ছেলেমেয়ে সবাই মিলে আস্তে আস্তে খবরের পাশাপাশি অন্যান্য অনুষ্ঠান দেখাতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। এমন কি খবরের মাঝখানেও কয়েকবার বেপর্দা মেয়েদের বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে, তাও সবাই মিলে উপভোগ করছে!

- যে সকল মেয়েরা সাধারণত টিভিতে খবর পড়েন তারা দেখতে হয় খুবই সুন্দরী, আকর্ষণীয় ফিগার, কণ্ঠস্বর হয় খুবই আকর্ষণীয় আর বয়স তো অবশ্যই কম। তার উপর আকর্ষণীয় শাড়ি, ব্লাউজ এবং সাজগোজ। এটা

তাদের কোন দোষ নয়। টিভিতে আজকাল খবর পড়ার জন্য চাকুরীর যোগ্যতারই অংশ এটা। কারণ এ যুগটাই হচ্ছে কম্পিটিশনের যুগ, বেষ্ট কাষ্টমার সার্ভিসের যুগ। বাজারে এখন অনেক চ্যানেল, যে সবচেয়ে বেশী কাষ্টমার সার্ভিস দিতে পারবে তার দিকেই দর্শক বেশী ঝুঁকবে। কিন্তু সমস্যাটা হলো ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে। যারা খবর দেখতে বসেন তারাও খবর উপভোগ করার পাশাপাশি খবর পাঠিকাকেও দেখতে থাকেন।

- ইসলামের নামেও কিছু কিছু টিভি চ্যানেল বের হয়েছে। তারা ইসলামিক অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে নাচ-গান সম্মিলিত বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছে। কোথাও রেহাই নেই।

টক শো (Talk Show)

- প্রতিটি চ্যানেলে প্রতিদিন কয়েকটি করে টক শো হয়। এই টক শোগুলোতে যারা গেষ্ট স্পিকার হিসেবে আসেন তারা সবাই উচ্চ শিক্ষিত, সরকারের আমলা, এমপি, মন্ত্রী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, প্রফেসর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, ব্যরিষ্টার, রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার, রাজনীতিবিদ ইত্যাদি লেভেলের। আলহামদুলিল্লাহ, এই টক শোর মাধ্যমে দেশের অনেক উপকার হচ্ছে। আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে অনেক সমস্যা চিহ্নিত হচ্ছে এবং অনেক সমস্যার সমাধানও বের হয়ে আসছে। দুই গ্রুপের বা দুই বক্তার আলাপ আলোচনায় অনেক সত্য বের হয়ে আসছে এবং দেশের জনগণ যা জানতো না তা প্রকাশ্যে জেনে যাচ্ছে।

- যেহেতু এই অনুষ্ঠানটি খুবই জনপ্রিয় তাই পরিবার-পরিজন নিয়ে অনেকেই উপভোগ করেন। এই টক শোর মাধ্যমে আমাদের সন্তানেরাও অনেক সময় দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যায়। কারণ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই জাতির সামনে অবাধে মিথ্যা তথ্য তুলে ধরেন, অনেকে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষী মনোভাব প্রকাশ করেন, অনেকে ইসলামকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন।

- টক শোগুলোতে আরেকটি বিষয় প্রায় লক্ষ্য করা যায় যে, সকলের সামনেই একটি করে কফির কাপ থাকে। অনেক গেষ্ট স্পিকারই কফি পান করেন কিন্তু তা বাঁ হাতে। এটি হচ্ছে ইসলামি আদবের বহির্ভুত। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন বাঁ হাতে কোন কিছু না খেতে বা পান করতে, মানুষ যখন বাঁ হাতে কোন কিছু পান করে বা খায় তখন তার সাথে

সাথে শয়তানও সেটা খায় এবং ঐ খাবার থেকে ঐ ব্যক্তি কোন বারাকাহ পায় না। যাহোক আমাদের সন্তানেরাও গন্যমান্য ব্যক্তিদের দেখে শিখে কিভাবে বাঁ হাতে খেতে হয়।

- আরো দেখা যায় বেশীরভাগ বক্তারা কথা 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে শুরু করেন না। তারপর কথার মাঝে মাঝে জায়গা অনুযায়ী যেখানে বলা উচিত 'আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ' তা মোটেও উচ্চারণ করেন না। এগুলো হচ্ছে একজন মুসলিমের ইসলামি আদবের প্রকাশ। কথার মাঝে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রশংসা করতে হবে, ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন কথা বলতে হলে 'ইনশাআল্লাহ' বলতে হবে। প্রতি মুহূর্তে একজন মুসলিম আল্লাহর উপর ভরসা করে চলে আর তার প্রতিফলন তার কথাবার্তায় প্রকাশ পায়। আসলে আমাদের একাডেমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পারিবারিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাঝে ইসলামকে নিয়ে কোন সিলেবাস নেই। প্রতি মুহূর্তে যিনি আমাদেরকে অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন, নিরাপত্তা দিয়ে সুস্থ রেখেছেন সেই আল্লাহর তেমন একটা গুরুত্ব আমাদের কাছে নেই। যিনি আমাকে তৈরী করেছেন এবং বুদ্ধি বিবেক দিয়েছেন, আর সেই বুদ্ধির গৌরবে বুদ্ধিজীবী হয়ে আল্লাহর স্মরণ ভুলে গেছি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু আপত্তিকর দৃশ্য শিশুদের মনে কু-প্রভাব ফেলে

- পিতামাতারা যখন সন্তানদের নিয়ে বাহিরে বের হন তখন রাস্তা-ঘাটের নানা রকম আপত্তিকর দৃশ্য কোমল মনের সন্তানদের হৃদয়ে আঘাত হানে। যেমন ঃ

  – রাস্তা-ঘাটে, পার্কে, শপিং সেন্টারে, ইউনিভার্সিটিতে ইয়ং ছেলেমেয়েরা (বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড) সকলের সামনে একে অপরের হাত ধরে নির্দ্বিধায় হাঁটাহাঁটি করছে।

  – পার্কে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকছে বা একজন আরেক জনের কোলের উপর মাথা রেখে শুয়ে আছে।

  – এডাল্ট মেয়েরা অশালীন পোষাক পরে সর্বত্র চলাফেরা করছে।

– কমার্শিয়াল বিজ্ঞাপন হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় ব্যানার এবং পোষ্টারে মেয়েদের অশ্লীল ছবি টাঙানো আছে।

পর্নগ্র্যাফীর সহজলভ্যতা

- খুব সহজেই এখন বাংলাদেশে পর্নগ্র্যাফীর সিডি-ডিভিডি পাওয়া যায়। এছাড়া তো রয়েছে আনলিমিটেড ইন্টারনেট ভার্শন। আমাদের মেয়ে বা ছেলে সারারাত কম্পিউটারে কী এতো এসাইনমেন্ট করছে পিতামাতা হিসেবে আমরা কি কখনো খোঁজ-খবর নিয়ে দেখেছি?

- এখন পর্নগ্র্যাফী শুধু কম্পিউটারে নয়, এটি চলে এসেছে ছেলেমেয়েদের হাতের মুঠোতে, মোবাইলে। এমনও জানা যায় যে গ্রামের কৃষক ছেলেরাও এখন ধান ক্ষেতে বসে তার মোবাইলে পর্নগ্র্যাফী উপভোগ করে।

- ইউনিভার্সিটির কোন কোন হলের 'কমন রুমের' টিভিতে সকল ছাত্ররা একসাথে গ্রুপের সাথে বসে সারারাত পর্নগ্র্যাফী উপভোগ করে।

- আরো লোমহর্ষক ঘটনা হলো, আজকাল ইউনিভার্সিটি-কলেজের ছেলেরা বয়ফ্রেন্ড-গ্লার্লফ্রেন্ড জীবনের অংশ হিসেবে মাঝে মধ্যে সুযোগ পেলেই একান্তে সময় কাটায় এবং যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলে। অনেক ছেলেরাই তার গ্লার্লফ্রেন্ডের অজান্তে সেই দৃশ্য ওয়েব ক্যামেরা দিয়ে অথবা হিডেন ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ড করে ইন্টারনেটে আপলোড করে দিয়ে থাকে। আমাদের মুসলিম ঘরের ইউনিভার্সিটি-কলেজের অনেক ছেলেমেয়েদের পর্নগ্র্যাফীর ভিডিও ক্লিপ এখন ইন্টারনেটে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন স্টারদের অনুসরণ করার প্রবণতা

- আমাদের যুবতী মেয়ে ক্রিকেট তারকাদেরকে শয়নে-স্বপনে ধারণ করে, তাদের ছবি বালিশের নিচে নিয়ে ঘুমায়, তাদের পোষ্টার নিজ রুমের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখে, এতে আমরা পিতামাতারা কিছুই মনে করি না।

- আমাদের কলেজ বা ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া ছেলে ইন্ডিয়ান নায়িকাদের পোষ্টার ঘরে টাঙ্গিয়ে রেখেছে এতে আমরা কিছুই মনে করছি না। আমাদের মেয়ে কোন আধুনিক যুবক গায়কের আদর্শ অনুসরণ করছে তাতে আমরা কিছুই মনে করছি না।

- কোথাও একটি কন্সার্ট হচ্ছে, সেখানে লাইন দিয়ে উচ্চ মূল্য দিয়ে টিকেট কিনে আমাদের মেয়ে তা উপভোগ করে রাত বারটায় বাসায় ফিরছে এতে আমরা পিতামাতারা কিছুই মনে করছি না। কন্সার্ট দেখতে গিয়ে গানের সাথে সাথে ছেলেমেয়েরা একাকার হয়ে নাচানাচি করছে এতে আমরা কিছুই মনে করছি না।

ইসলাম পালন করাকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ভাবা

- ইসলাম সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা এমনই বেড়ে গেছে যে, কোন বাবা-মা যদি তাদের কলেজ বা ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া ছেলের পড়ার টেবিলে কোন হাদীসের বই বা কুরআনের এক খন্ড তাফসীর দেখেন তাহলেই তারা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। তারা ভাবেন, আমার ছেলে এই বয়সে কুরআনের তাফসীর বা হাদীস গ্রন্থ পড়ছে কেন? সে কোন জঙ্গি দলের সাথে জড়িয়ে যায়নি তো!

- বাবা-মায়েরা সন্তানদেরকে স্টুডেন্ট লাইফে কুরআন ও হাদীস পড়তে দেন না। তারা মনে করেন, এতে তার স্কুল-কলেজের পড়াশোনা নষ্ট হবে, সময় নষ্ট হবে। তাদের ভয়, হয়তো সে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়র-ব্যরিষ্টার হতে পারবে না।

- আমাদের এক আত্মীয় তিনি নিজে কুরআন-হাদীস পড়তেন কিন্তু তার কলেজে পড়ুয়া ছেলে মেয়েদের পড়তে দিতেন না, নিজের পড়া হয়ে গেলে ট্রাংকে ভরে রাখতেন। তিনি সন্তানদের বলতেন যে এগুলো এতো অল্প বয়সে পড়া ঠিক না, পড়লে ক্ষতি হতে পারে, জীবন ঐ দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। এগুলোর ভার এখন বইতে পারবে না। এতে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের ক্ষতি হবে। এখন জীবন গড়ার বয়স।

- পত্র-পত্রিকায় দেখা যায় পুলিশ যখন কোন কারণে একটি মাদ্রাসা তল্লাশি করে তখন পত্রিকাগুলো বিশেষ হাইলাইট করে লিখে কিছু জিহাদী বই পাওয়া গেছে এবং বেশ কিছু কুরআনের কপি জব্দ করা হয়েছে। আজকাল আল্লাহর কিতাব যা আমাদের ভাল থাকার জন্য গাইড বুক হিসেবে আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন তাও আমরা আইনের লোকেরা অফেন্স মনে করে তা জব্দ করছি!

- জিহাদ শব্দটা তো আজ শুধু অমুসলিম নয় মুসলিমদের নিকটও জঘন্য ঘৃণায় পরিণত হয়েছে। অথচ জিহাদ কুরআনেরই একটি শব্দ যার অর্থ প্রচেষ্টা (কোন ভাল কাজে সাফল্যের জন্য প্রচেষ্টা)। আর আমরা মিডিয়ার বুদ্ধিজীবীরা তাকে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বানিয়েছি সন্ত্রাস, মারামারী, কাটাকাটি, বোমাবাজি বা Holy war!

আইনের লোকের ক্ষমতার অপব্যবহার

- আমাদের দেশের অবস্থা এখন এমন হয়ে গেছে যে কেউ নিজ বাসায় আল-কুরআনের তাফসীর সমগ্র, হাদীস গ্রন্থ, ইসলামিক বইপত্র রাখতে রীতিমতো ভয় পান, কখন এসে পুলিশ হামলা করে!
- অনেকে কুরআন-হাদীস এবং ইসলামিক বইপত্র নিয়ে রাস্তা-ঘাটে চলাচল করতেও নিরাপদ মনে করেন না, কখন পুলিশ এরেষ্ট করে এবং জিহাদী বই পাওয়া গেছে বলে কোর্টে চালান করে দেয়!
- একজন মুসলিমের জন্য দাড়ি রাখা ওয়াজিব। কিন্তু দেশের পরিস্থিতি এখন এমন অবস্থানে দাঁড়িয়েছে যে পুরুষরা দাড়ি রাখতে ভয় পান কখন মৌলবাদী বলে পুলিশ এরেষ্ট করে ফেলেন। যুবকরাতো দাড়ির বিষয়ে আরো বেশী ভীত-সন্ত্রস্ত।

ফান্ডামেন্টালিষ্ট বা মৌলবাদী বলে গালি দেয়া

- দাড়ি-টুপি যেন আমাদের দেশে একটি অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক শ্রেণীর লোকের তো দাড়ি-টুপি দেখলেই শরীর জ্বালা-পোড়া করে। তারা পরিবেশটা এমন তৈরী করেছেন যে দাড়ি-টুপি মানেই ফান্ডামেন্টালিষ্ট, মৌলবাদী, সন্ত্রাসী।
- অথচ আমরা একটু গভীরভাবে চিন্তা এবং পড়ালেখা করলেই জানতে পারি যে ফান্ডামেন্টালিষ্ট বা মৌলবাদী কাকে বলে। যিনি কোন একটি বিষয়ের উপর খুব ভালভাবে গভীরভাবে জানেন অর্থাৎ যিনি কোন একটি বিষয়ের মূল বা ফান্ডামেন্টালস সম্পর্কে জ্ঞাত তাকেই ফান্ডামেন্টালিষ্ট বা মৌলবাদী বলা হয়। যেমন কেউ যদি অংকের মূল ফরমূলা বুঝেন এবং তা নিয়ে গবেষণা করেন তিনি অংকের ফান্ডামেন্টালিষ্ট বা মৌলবাদী। আবার যিনি

কেমিস্ট্রির মূল তথ্য ভাল করে বুঝেন তিনি কেমিস্ট্রির ফান্ডামেন্টালিষ্ট বা মৌলবাদী। আবার যিনি কোন একটি ধর্মের মূল বিষয়গুলো খুব ভাল করে বুঝেন এবং জানেন তিনি হচ্ছেন ঐ ধর্মের ফান্ডামেন্টালিষ্ট বা মৌলবাদী, হতে পারে সেটা হিন্দু ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম বা ইসলাম ধর্ম। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে মৌলবাদী বলে গালি দেয়া হচ্ছে শুধু মাত্র ইসলাম ধর্মের আলিমদেরকে।

- যে সকল মুসলিম নরনারী আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী অর্থাৎ আল-কুরআন এবং রসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী ইসলামের সকল নিয়ম কানুন মেনে জীবনযাপন করেন তাদেরকে ধিক্কার দিয়ে বলা হচ্ছে ধর্মীয় গোড়ামির শিকার, ফান্ডামেন্টালিষ্ট। অথচ যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি বলছেন তোমরা ততক্ষণ প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পরিপূর্ণভাবে ইসলাম মেনে চলবে।

টেকনোলজির অপব্যবহার

- আমরা আমাদের সন্তানদের পারসোনাল কম্পিউটার কিনে দিচ্ছি, ল্যাপটপ কিনে দিচ্ছি, নোটবুক কিনে দিচ্ছি, আইপ্যাড কিনে দিচ্ছি, ট্যাবলেট কিনে দিচ্ছি, আইফোন কিনে দিচ্ছি, আইপড কিনে দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের সন্তানেরা এগুলো দিয়ে কী করছে তার কি কোন খোঁজ- খবর রাখছি? এগুলো কতটুকু সঠিক কাজে ব্যবহার করছে আর কতটুকু বাজে কাজে ব্যবহার করছে তার কি কোন ট্র্যাক রাখি? বাস্তবে দেখা গেছে যে কলেজ-ইউনিভার্সিটির কাজের পাশাপাশি তারা এগুলোতে পর্ণগ্রাফী দেখছে, আজেবাজে নাচ-গান দেখছে, ইন্টারনেটে অবৈধ চ্যাটিং করছে, আল্লাহ রসূলের বিরুদ্ধে ব্লগিং করছে! মোবাইলে গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ডের সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করছে! আমরা বাবা-মারা এতে কিছু মনে করছি না।

- ডিশের লাইনের অপব্যবহার - বাংলাদেশে এখন এক ডজনেরও উপরে রয়েছে দেশী টিভি চ্যানেল। আর ক্যাবলের বদৌলতে তো রয়েছে শতশত আজেবাজে চ্যানেল। টিভি খুললেই অশ্লীলতা। আর এই অশ্লীলতা দেখতে দেখতে অবস্থাটা এমন হয়ে গেছে যে সকলের কাছে তা খুবই নরমাল। পরিবারের সবাই মিলে একসাথে দেখছে অশ্লীল হিন্দি নাচ-গান, সিনেমা আর পরকীয়া প্রেমের নাটক ইত্যাদি। এতে কেউ কিছু মনে করছে না।

Facebook-এর (ফেইসবুকের) অপব্যবহার

- আমাদের সন্তানেরা দিন-দিন ফেইসবুকের মাধ্যমে নানা অপসংস্কৃতিতে আসক্ত হয়ে পড়ছে। কিন্তু আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে এর নেগেটিভ দিকগুলো কী কী? অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে এই আসক্তি এতো প্রকট আকার ধারণ করেছে যে তা কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে। যেমন নিম্নে ফেইসবুকের কিছু নেগেটিভ দিক তুলে ধরা হলো। এই বিষয়ে আমাদের বাবা-মায়েদের সময় থাকতে সচেতন হওয়া উচিত।

১) অনেক ক্ষেত্রেই সন্তান তার আশেপাশের অন্যদের কেয়ার করে না। তখন সে শুধু তার নিজের জগৎ নিয়ে মত্ত থাকে।

২) সামাজিক বন্ধন কমে যেতে থাকে। সে আস্তেআস্তে তার সামাজিক দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।

৩) সময়ের অপব্যবহার। আমাদের সন্তানেরা যে কিভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা ফেইসবুকের মধ্যে সময় কাটায় তা হিসাব করলে দেখা যাবে যে তারা জীবনের একটা দীর্ঘ মূল্যবান সময় নষ্ট করে ফেলছে, যা অন্য কিছু দিয়ে ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়।

৪) দীর্ঘক্ষণ ফেইসবুকে সময় কাটানো মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

৫) পারিবারের অন্যান্যদের সাথেও সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। দিন-দিন তার কাছে পরিবারের সদস্যদের চেয়ে বন্ধু-বান্ধবদের গুরুত্ব বেশী হতে থাকে।

৬) তৃতীয় পক্ষের সাথে দ্বন্দ্ব। ফেইসবুকের মাধ্যমে অনেক অপরিচিত লোকদের সাথে বন্ধুত্ব হয়। এই গ্রুপে থাকে বিভিন্ন বয়সের পুরুষ ও মহিলা। কার চরিত্র কেমন কেউ জানে না। এমন অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে যে একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাতের মাধ্যমে বড় ধরণের ক্রাইমের সাথে জড়িয়ে পড়েছে।

৭) ব্ল্যাকমেইল। ফেইসবুকে সাধারণত সবাই তাদের নানা রকম নানা ভঙ্গির ছবি আপলোড করে দিয়ে থাকে। সকলেই সকলের ছবি দেখতে পায়। যেকেউ এখান থেকে ছবি ডাউনলোড করে নিয়ে cutting and

pasting এর মাধ্যমে বা এনিমেশনের মাধ্যমে অন্যান্য এডাল্ট ছবির সাথে মিলিয়ে পর্নগ্র্যাফি তৈরী করতে পারে।

৮) Islamic point of view। আমি যদি মেয়ে হয়ে থাকি তাহলে আমি আমার ছবি অন্যকে দেখাবো কেন? আমার ছবি দেখে পরপুরুষরা তো খারাপ চিন্তাভাবনা করতে পারে। যেখানে ইসলাম মেয়েদেরকে কোমল স্বরে পরপুরুষের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছে সেখানে নিজের নানা ভঙ্গির ছবি তো ওদের সামনে তুলে ধরার প্রশ্নই উঠে না।

- **ফেইসবুকের সঠিক ব্যবহার** ঃ উপরে আমরা ফেইসবুকের নেগেটিভ দিক সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরেছি। কিন্তু এর পজিটিভ দিকও রয়েছে। হ্যাঁ, আমরা এই ফেইসবুককে সঠিক কাজে লাগিয়ে আবার অনেক উপকারও পেতে পারি। যেমন ঃ কেউ ফেইসবুকের মাধ্যমে friend circle তৈরী করে তাদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াতি কাজ করতে পারে, তাদেরকে নিয়মিত সঠিক দ্বীন সম্পর্কে সচেতন করতে পারে, নানারকম ইসলামিক ডকুমেন্টারির ভিডিও ক্লিপ পাঠাতে পারে, ভাল ভাল স্কলারদের লেকচারের লিংক পাঠাতে পারে, বিভিন্ন রকম শিক্ষণীয় আর্টিক্যালস পাঠাতে পারে। এটাকে আমরা ডিজিটাল দাওয়া বলতে পারি। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আজকাল মানুষ পড়ার চাইতে ভিডিও দেখতে বেশী পছন্দ করে। তাই আমাদেরও উচিত এই সুযোগকে কাজে লাগানো। ইসলামের দাওয়াতি কাজে এই আধুনিক টেকনোলজির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা যেতে পারে। কারণ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন "আমার কাছ থেকে একটি বাক্য হলেও তা লোকদের কাছে পৌঁছে দাও" (সহীহ বুখারী)। এটা প্রতিটি মুসলিম নরনারীর জন্য সার্বক্ষণিক ফরয কাজ।

Blogging (ব্লগিং)-এর অপব্যবহার

- ইনফরমেশন টেকনোলজি কোম্পানীগুলো ব্লগিং কমিউনিকেশন ম্যাথড আবিষ্কার করেছিলেন ইউজারদের ভালোর জন্য। বিশেষ করে যারা গ্রুপিংয়ের মাধ্যমে রিসার্চ করেন, মতামত ব্যক্ত করেন, সাজেশন আদান-প্রদান করেন, নলেজ শেয়ার করেন ইত্যাদি। পৃথিবীর কোন দেশে এই ব্লগিংয়ের অপব্যবহার হয়নি যা বাংলাদেশীরা করেছে। ইনফরমেশন

টেকনোলজির একটা সুবিধাকে উন্নয়নের কাজে না লাগিয়ে নেগেটিভ কাজে ব্যবহার করে নিজেরা নিজেরা বিভেদ সৃষ্টি করে একরকম গৃহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

- মনে হচ্ছে বাংলাদেশে মানুষজন ব্লগিং ইনটারফেইস ব্যবহার করে-ই একজন আরেক জনের দোষ ধরার জন্য; খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এক ভাই অপর ভাইয়ের ভুল-ক্রুটি বের করার জন্য; একজন অপরজনকে গালি-গালাজ করার জন্য; অপমান করার জন্য; তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার জন্য; হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য। সামনা-সামনি যে কাজ করতে পারছে না সেই কাজ ইচ্ছে মতো ব্লগিংয়ের মাধ্যমে করে মনের ঝাল মিটাচ্ছে।
- ব্লগিংয়ের মাধ্যমে cyber bulling শুধু নিজেদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। একসময় একে অপরের ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত হানছে। বিশেষ করে ইসলামের উপর নানাভাবে আক্রমণ করছে! যা পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মের লোকেরা করছে না। কারা করছে এই কাজ? যারা মুসলিম ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছে তারাই তাদের সৃষ্টা মহান আল্লাহ তাআলাকে নিয়ে নানা রকম কটুক্তি করছে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নানা রকম অবমাননা করছে।
- আল্লাহ ও রসূলকে অবমাননা করা, ইসলামকে অবমাননা করাটা যেন নতুন প্রজন্মের কাছে একটি আধুনিকতার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মূল কারণগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে সন্তানদের উপর বাবা-মার কোন কন্ট্রোল নেই এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে ওদের প্রকৃত ইসলামি শিক্ষা নেই।

নাটক-সিনেমার প্রভাব

- আমি কি কখনো চিন্তা করেছি যে আমি এবং আমার পরিবারের সবাই মিলে নিয়মিত কী ধরণের নাটক-সিনেমা (অপসংস্কৃতি) দেখছি? এই ধরণের নাটক-সিনেমা, হিন্দি সিরিয়াল, হিন্দি মুভি আমাদেরকে কুরআনের পথ থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক হিন্দি মুভির মধ্যেই থাকে হিন্দুদের পূজা যা আমি দেখছি এবং শিরকের প্রশ্রয় দিচ্ছি। আবার হিন্দি মুভি যখন শুরু হয় তখন দেব-দেবীর নামে শুরু হয়। আসুন, একটিবার গভীরভাবে ভেবে দেখি ঃ আমার ঘরে আমি এই টেকনোলজির মাধ্যমে আধুনিক উপায়ে হিন্দুদের মূর্তি পূজার আশ্রয় দিচ্ছি তার মানে

নিজেদের ঘরেই ভার্চুয়াল পূজা হচ্ছে। কত বড় শিরকি অপরাধ এটা একবার ভেবে দেখেছি কি কখনো?

দিন দিন চিত্ত বিনোদনের আমূল পরিবর্তন

- আগে আমাদের দেশে একটি মাত্র টিভি চ্যানেল ছিল যা হচ্ছে বিটিভি। বুঝার সুবিধার্থে আমরা দুই একটা বিষয় উদাহরণস্বরূপ আনতে পারি। যেমন, বিটিভিতে একসময় ছায়াছন্দ নামে মাসে একটি গানের অনুষ্ঠান দেখানো হতো। তাও অনুষ্ঠানটি দেখানো হতো রাত ১০টার ইংরেজী সংবাদের পর যখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পরে। আমরা জানি যে তখনকার যুগে বাংলাদেশী সিনেমাগুলোও ছিল অনেকটা শালিন। ছায়াছন্দে যদি কোন নাচ-গান একটু অশালিন মনে হতো তাহলে পরিবারের বড়রা তা নিজেরাও দেখতেন না এবং অন্যদেরকেও দেখতে দিতেন না, টিভি বন্ধ করে রাখতেন। তখন বিটিভিতে মাসে মাত্র একটি বাংলা সিনেমা দেখানো হতো তাও বেশীরভাগ সময় সামাজিক। বিটিভিতে সপ্তাহে একটি বা দুটি শালিন ইংরেজী মুভি বা সিরিয়াল দেখানো হতো। বিটিভি যে কোন ইংরেজী মুভি প্রচারের আগে নিজেদের সেন্সরবোর্ড দ্বারা আগে দেখে নিতো এবং যদি কোন অশালিন দৃশ্য থাকতো তা তারা কেটে নিতো। এখন এই যুগে মুসলিম ঘরে ঘরে শতশত অশালিন চ্যানেল, পরিবারের সবাই মিলে কী উপভোগ করছে পূর্বের সাথে তুলনা করে তা কি একটি বার চিন্তা করে দেখেছি যে আমরা কোথায় পৌছে গেছি?

- এভাবে দিন গড়িয়ে যাচ্ছে আর আমরা ধংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি! ঘরে ঘরে একসময় আসলো ভিসিআর, তারপর আসলো ভিসিপি, তারপর আসলো সিডি প্লেয়ার, তারপর ডিভিডি প্লেয়ার ইত্যাদি। একসময় আমাদের দেশের লোকেরা মিডিলিষ্টে চাকুরী করতেন। তারা যখন দেশে আসতেন তখন বিদেশ থেকে আর কিছু আনেন আর নাই আনেন সবাই সাথে করে অন্ততপক্ষে একটি ভিসিয়ার নিয়ে আসতেন। এই শুরু হয়ে গেল মুসলিম ঘরে ঘরে শয়তানের অশ্লিল নাচ-গান। আমরা ছোটবেলায় মিডিলিষ্ট থেকে আসা আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে শুনেছি যে, হিন্দি ক্যাসেটের বদৌলতে আরবের লোকেরা নাকি অনর্গল হিন্দিতে কথা বলতে পারে, ঐ দেশের একটি ছোট বাচ্চাও অমিতাভ বচ্চনকে চিনে! এটি আশির দশকের কথা।

- দিন আরো গড়াতে থাকলো! আমরা উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি! তার পরের উন্নতি হচ্ছে ঘরে ঘরে, বাসে, ট্রেনে, নাইট কোচে, লঞ্চে, স্টিমারে, হোটেলে, রেস্টুরেন্টে, চায়ের দোকানে, গ্রামে, হাটে, বাজারে সর্বত্রই একই আওয়াজ শোনা যাচ্ছে - "হাওয়া হাওয়া ও হাওয়া খুশবু লুটাদে......"। যদিও আমরা হিন্দি-উর্দ্দু বুঝি না তারপর শুনেছি যে এই জনপ্রিয় গানের কথাগুলোর অর্থ নাকি খুবই অশ্লিল। যাহোক দেশের বা সমাজের এই যে উন্নতি (?), এতে আমরা মুসলিম পরিবারের লোকেরা কিছুই মনে করছি না!

- হিন্দি সিনেমার গানের টপ টেন আর ড্যান্স ড্যান্স অনুষ্ঠান মুসলিম ঘরে ঘরে ঢুকে গেল। সাধারণত সবচেয়ে যৌন আবেদনময়ী হিন্দি সিনেমার গানগুলোই হয় টপ টেন। কোন কোন বাংলাদেশী চ্যানেলে অনুষ্ঠানের মাঝে মাগরিবের আযান দেয়, পরিবারের কেউ কেউ ড্যান্সের মাঝে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে মাগরিব পড়ে এসে আবার বসে রিমোট হাতে। যে নাকি ড্যান্সের মাঝে ছিল মাগরিবের সলাতের মধ্যে তো তার চোখে ঐ দৃশ্যই ভাসার কথা। এক প্রতিবেশী আপাকে দেখতাম তিনি তসবীহ হাতে গুনছেন আর একের পর এক হিন্দি সিনেমা দেখে সময় কাটাচ্ছেন। যাহোক আমরা যে মুসলিম পরিবারগুলো কী করছি তা হয়তো নিজেরাই জানি না। প্রায় প্রতিটি মুসলিম পরিবারেই সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে গেল।

- বিবেকবান পিতামাতের শিক্ষনীয় হিসেবে বর্তমানের টিভিতে প্রচারিত একটি নাটকের ঘটনা তুলে ধরা যাক। নাটকের নায়িকা তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে অবৈধ সম্পর্কের কারণে প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে। বেশ কয়েকদিন যাবত বয়ফ্রেন্ড নায়িকার সাথে যোগাযোগ করছে না, তাই নায়িকা বয়ফ্রেন্ডের খোঁজে তার এপার্টমেন্টে গেছে। সেখানে গিয়ে সে তার রুমমেট থেকে জানতে পরলো যে তার বয়ফ্রেন্ড এই বাসা ছেড়ে চলে গেছে! যাহোক নায়িকার পেটের সন্তান কিছুটা বড় হয়ে যাওয়াতে সে আর নিজের বাসায়ও ফিরে যেতে চাচ্ছে না। নায়িকা এবার তার বয়ফ্রেন্ডের রুমমেটের সাথেই বসবাস করা শুরু করলো। এবার রুমমেট নায়িকাকে প্রস্তাব দিচ্ছে গর্ভপাত করে ফেলার জন্য। কিন্তু নায়িকা এতে রাজি না। তখন রুমমেট নায়িকাকে প্রশ্ন করছে, লোকে যখন জিজ্ঞেস করবে যে এই সন্তানের পিতা কে তখন তুমি কী বলবে? নায়িকা উত্তর দিচ্ছে, বলবো "ঈশ্বরের সন্তান"।

নাটক-সিনেমার মাধ্যমে ব্রেইনওয়াশ

- আমরা জন্মের পর থেকেই শিখছি যে ‘সাদা’ মানেই ভালর প্রতীক আর ‘কালো’ মানেই খারাপের প্রতীক। যেমন শোক দিবসে কালো ব্যাজ, কালো পতাকা, কালো পোশাক। আবার খারাপ দিনকে কালো দিবস বলা ইত্যাদি। একইভাবে ভালোর প্রতিক হিসেবে আমরা দেখছি সাদা, যেমন সাদা পোশাক, সাদা পতাকা, শান্তির প্রতিক সাদা পায়রা ইত্যাদি। অর্থাৎ দিনের পর দিন এমন ভাবে আমাদের মনে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যে সাদা মানে ভাল আর কালো মানে খারাপ, যা মোটেও ঠিক নয়।

- একই ভাবে কিছু সংখ্যক ইসলাম বিদ্বেষী লোক দিনের পর দিন নাটক-সিনেমার মাধ্যমে আমাদের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে যে খারাপ চরিত্রের লোক মানেই মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি-পাগড়ী, গায়ে জুব্বা ইত্যাদি। ভাবখানা এমন যে হুজুর-মাওলানারা হলেন যত বাজে কাজের মূল। এই কাজ এক দিনের নয় দুই দিনের নয়, বছরের পর বছর ধরে করে আসছে। বাংলাদেশের ৮৩% লোক মুসলিম হয়েও তা দেখে আসছে, সহ্য করে আসছে। যারা নাটক-সিনেমার মাধ্যমে ইসলামকে এভাবে দীর্ঘদিন ধরে উপস্থাপন করে আসছে তাদের সংখ্যা কিন্তু খুব বেশী নয় কিন্তু এরা বিশাল প্রভাব বিস্তার করে আসছে।

- এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মিডিয়ার মাধ্যমে এটাকে সাপোর্ট করে ধামাচাপা দিতে চান। যেমন তারা বলতে চান যে অনেক নাস্তিকের মুখেও তো দাড়ি আছে তাতে কী হয়েছে? হ্যাঁ, আমরা জানি অনেক নাস্তিকরা বড়বড় দাড়ি রাখেন, বড়বড় মোছ রাখেন, চুল কাটেন না। কবি রবীন্দ্র নাথের মুখেও দাড়ি আছে, শিখদের মুখেও লম্বা দাড়ি আছে, তারাও পাগড়ী পরেন, হিন্দুরাও পাঞ্জাবী-পায়জামা পরেন, ইহুদীরাও লম্বা দাড়ি রাখেন, মাথায় টুপি পরেন, খ্রিষ্টান পাদ্রিরাও মুসলিম ইমামদের মতো জুব্বা পরেন, খ্রিষ্টান নান মহিলারাও হিজাব এবং বোরকা পরেন। তাই বলে নাটক সিনেমায় যাদেরকে নিয়ে কটাক্ষ করা হয় সেই গ্রুপ আর এই গ্রুপ এক নয়। এটা একটা কমনসেন্স যা সকলেই বুঝে।

ভুল সংস্কৃতি চর্চা করার প্রভাব

- শিরক হচ্ছে আল্লাহ-বিরোধী কাজ। মনে রাখতে হবে যে শিরকের গুনাহ আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না। আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে আমাদের মনে কালচার আর ফ্যাশনের নামে আল্লাহ-বিরোধী বিশ্বাস নিয়মিত ঢুকছে? যেমন, বৈশাখী মেলার নামে অনেক কাজকর্মই হয়ে থাকে যা সুস্পষ্ট শিরক এবং ইসলাম বিরোধী। বৈশাখী মেলার শোভা যাত্রার জন্য যেসকল মূর্তি বানানো হয় তা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

- আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে আমরা সাধারণত কী ধরণের গান শুনে থাকি? রবীন্দ্র সঙ্গীত বলি, আর পল্লীগীতি বলি, আর মারফতি বলি, আর দেশাত্মবোধক বলি, আর লালনগীতি বলি, আর ব্যান্ড সঙ্গীত বলি এই ধরণের গানের অনেক কথাতেই রয়েছে শিরক!

- **রক সঙ্গীত ঃ** আজকালকার ছেলেমেয়েরা এটা খুব ভালবাসে। আমরা কি জানি এই রক সঙ্গীত (Rock music)-এর অনেক গায়করাই রীতিমতো ইবলিসের (শয়তানের) পূজা করে থাকে? এবং তাদের গানের কথাগুলো হচ্ছে ঐ শয়তানের ইবাদত? যেমন ঃ এ ধরণের একটি গানের লাইন "হে আমার প্রভু শয়তান ... আমাকে টানতে টানতে হেলে (জাহান্নামে) নিয়ে যাও ....."।

- **এক মিনিট নিরবতা পালন ঃ** বিভিন্ন জায়গায় মাথা নত করে সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি সুস্পষ্ট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়গুলো আমরা ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে না জানার কারণে নিয়মিত ভুল করেই যাচ্ছি, আর এই ভুল এমন এক ভুল যা কবীরা গুনাহ, যে গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।

- সংস্কৃতির মাধ্যমে গণমানুষের মননশীলতা ও চিন্তাধারা গঠিত হয়। কিন্তু সাংস্কৃতিক অংগনে ইসলামের উপস্থিতি একেবারেই কম। মানসম্পন্ন ইসলামি গান-কবিতা, নাটক নেই।

মোমবাতি জ্বালানোর ইতিহাস

- ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার টুইন টাওয়ার ভেঙ্গে পড়ার পর শতশত মানুষ মারা যায়। অতঃপর নিহতদের আত্মীয়স্বজন এবং আমেরিকানরা মোমবাতি জ্বালিয়ে শোক পালন করে। তার পর থেকে

আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে কিছু হলেই মোমবাতি জ্বালিয়ে নানা রকম শোক পালন বা উৎসব পালন করা হয়। এর আগে এই মোমবাতি জ্বালানোটা এতোটা প্রকট ছিল না। দিনের পর দিন এই মোমবাতি প্রজ্জ্বলন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মহল্লা, শহর, বিভাগ অর্থাৎ দেশের সর্বত্র পৌছে গেছে।

- অনেকেরই প্রশ্ন এই মোমবাতি জ্বালালে ক্ষতি কী? ইসলাম কেন এর বিরোধিতা করে? আসুন সংক্ষেপে এর ইতিহাস আলোচনা করি ঃ

- ইসলামি সন ৪০০ হিজরীর পূর্বেই সকল অগ্নিপূজকদের রাজ্যসমূহ মুসলিমদের দখলে এসে যায়। এরই মধ্যে 'বারামাকা' নামক এক শ্রেণীর অগ্নিপূজক প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু সত্যিকার অর্থে মনেপ্রাণে তারা অগ্নিপূজকই থেকে যায়। তাই এরা মুসলিমদের ছদ্মাবরণে অগ্নিপূজার এক নতুন পন্থা হিসেবে উদ্ভাবন করে শবে বরাত নামক বিদ'আতটি। 'সলাতুর রাগায়েব' নামে চালু করে একটি সলাত (নামায)। এই সলাত ১০০ রাক'আত। এটাই শবে বরাতের সলাত বা সলাত বলে খ্যাত। তারা এ সলাতের জন্য জাঁকজমকের সাথে মুসলিমদের লেবাসে মসজিদে হাজির হত, সাধারণ মুসলিমদের মত সলাত পড়তো, কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল অগ্নিপূজা।

- এরা শবে বরাতে এই সলাতের জন্য মসজিদের ভিতরে ও বাইরে অসংখ্য আলো জ্বালাতো, সম্পূর্ণ মসজিদকে আলোতে ডুবিয়ে রেখে অগ্নিপূজার মন্দিরে পরিণত করতো। এভাবে আগুন দিয়ে গোটা মসজিদকে সাজিয়ে যখন সলাত আদায় করতো তখন তাদের চারদিকেই থাকতো আগুন। এই সলাত পড়ার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি নয় বরং আগুন পূজা ও আগুনকে সিজদাহ করানো। বারামাকা নামক সেই মুসলিম নামধারী ছদ্মবেশী অগ্নিপূজকদের ফাঁদে পা দিয়ে সরলমনা মুসলিমরাও মাসজিদে জমা হতো। আর এভাবেই তখন থেকে সওয়াবের কাজ মনে করে চলে আসছে শবে বরাত নামক বিদ'আতি প্রথাটি।

- আমাদের দেশেও এই দিনে আলোকসজ্জা করা হয় এবং একটি বিদ'আতি কাজকে গুরুত্ব দিয়ে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়, আর আমরা সঠিক না জানার কারণে দেশবাসীরাও তা আনন্দের সাথে উদযাপন করি। যে সব ধরণের কাজ বা অনুষ্ঠান ইবাদত বা সওয়াবের কাজ বলে কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা স্বীকৃত নয়, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে যা

কখনো করেননি বা কাউকে কখনো করতে বলেননি, তাঁর সাহাবাদের সময়ও তা ইবাদত হিসেবে প্রচলিত ছিলো না এমন সব কাজ বা অনুষ্ঠানাদি সওয়াবের উদ্দ্যেশে পালন করার নামই বিদ'আত। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নতুন আবিস্কৃত বিষয় বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টতার পরিণাম হল জাহান্নাম।
(সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

- তাই সওয়াবের কাজ হোক আর নাই হোক আগুন জ্বালিয়ে কোন প্রকার অনুষ্ঠান বা উৎসব করা ইসলাম-বিরোধী এবং এটি শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশের মানুষ এই মোমবাতি জ্বালানোতে এতোটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে অনেকেরই হয়তো এটা মেনে নিতে কষ্ট হবে।

- তাই এই বিষয়ে আরো পরিষ্কার হওয়ার জন্য "ইসলামি আকীদার" উপর আরো অনেক গভীর জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। কারণ একজন মুসলিমের ঈমানের মূলধনই হচ্ছে সহীহ আকীদা, কারো আকীদাই যদি ঠিক না থাকে তাহলে তার ঈমান নিয়ে সংশয় দেখা দেবে। তাই আগুন নিয়ে মুসলিমরা কী কী করতে পারবে আর কী কী করতে পারবে না তা প্রতিটি মুসলিমেরই জানা থাকা অবশ্যই কর্তব্য, কারণ এটি ঈমানের অংশ।

- **সমাধান ঃ** কয়েকটা বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে ভুলবুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় তর্কবিতর্ক হচ্ছে। বিষয়টা সকলের নিকট পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। সে বাঙালি হোক আর অবাঙালি হোক অন্য ধর্মের লোকেরা অবশ্যই মোমবাতি জ্বালিয়ে উৎসব করতে পারবে, শোক পালন করতে পারবে এতে ইসলামের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে কোন মুসলিম এই ধরণের কোন কাজ করতে পারে না, অর্থাৎ আগুন নিয়ে কোন উৎসব করতে পারে না। আরো অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে কোন মুসলিম শিখা অর্নিবানে সম্মান প্রদর্শন করতে পারে না, কোন গেইমস বা অলিম্পিকের শুরুতে মশাল জ্বালাতে পারে না, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালাতে পারে না, মঙ্গল শোভা যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারে না, পহেলা বৈশাখ উৎযাপন করতে পারে না, শহীদ মিনারে ফুল দিতে পারে না, কোন সৃতিসৌধে ফুল দিতে পারে না, কোথাও মাথা নত করতে পারে না, একমিনিট নিরবতা পালন করতে পারে না।

- এই বিষয়গুলো নিয়ে যেন আমরা নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না করি। এর সাথে দেশের প্রতি ভালবাসার বা শ্রদ্ধার কোন সম্পর্ক নেই এবং এবিষয়ে কোন ভুলবুঝাবুঝির সৃষ্টি করা ঠিক নয়। এগুলো কোন ব্যক্তির মতামত নয়, বিষয়গুলো ইসলাম সমর্থন করে না। এই বিষয়গুলো মুসলিম বাদে সকল ধর্মের লোকেরাই পালন করতে পারবেন এবং তাদেরকে কোন প্রকার বাধাও দেয়া যাবে না। যদি কেউ নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করেন আর তিনি যদি এই কাজগুলো করেন তাহলে গুনাহগার হবেন। এবিষয়ে এটাই শেষ কথা।

- মুসলিমদেরতো প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার কথা কিন্তু মুসলিম নামধারী কিছু মানুষ ঠিক মতো নামায পড়েন না, রোযা রাখেন না, যাকাত দেন না, মিথ্যা কথা বলেন, চুরি করেন, ডাকাতি করেন, সুদ খান, ঘুষ খান, যিনা করেন, মানুষকে ঠকান, গীবত করেন, বেপর্দা চলেন, ওজনে কম দেন, আমানত খিয়ানত করেন, অন্যের হক নষ্ট করেন। এই কাজগুলো ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না তার পরও মুসলিম নামধারী কিছু মানুষ এগুলো অহরহ করে যাচ্ছে। আর এর জন্য তাদেরকে অবশ্যই কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এসময় তাদের পক্ষে কথা বলার জন্য বা সুপারিশ করার জন্য কোন উকিল, ব্যরিষ্টার, মন্ত্রী-মিনিষ্টার থাকবে না।

গল্প-উপন্যাসের প্রভাব

- আমরা কি কখনো গভীরভাবে খেয়াল করেছি যে আমরা কী ধরণের বই বা গল্প-উপন্যাস-কবিতা পড়ছি? এবং এই ধরণের অনেক গল্প-উপন্যাস বা কবিতার মাধ্যমে খুব ধীরে ধীরে (স্লো-পয়জনিং) আমরা নানা রকম শিরকে আক্রান্ত হচ্ছি?

- আজকাল হাইস্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরাই বেশী গল্প-উপন্যাস পড়ে থাকে। এই পাঠক সমাজের জন্য এক শ্রেণীর লেখক-লেখিকাও তৈরী হয়েছে। তারা বেশীরভাগ সময় এই বয়সের ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে তাদের মনের খোরাক যুগিয়ে গল্প- উপন্যাস লিখে থাকে। এই সকল গল্প-উপন্যাসগুলো যদি খুব গভীরভাবে বিশ্লেষণ (এনালাইসিস) করলে দেখা যাবে যে এদের একটি বিরাট অংশই আমাদের

ছেলেমেয়েদেরকে ইসলাম হতে দূরে সরে যেতে সহায়তা করছে। অল্প বয়স থেকে এই ধরণের লেখা পড়তে পড়তে একসময় মগজ ধোলাই (ব্রেইনওয়াশ) হয়ে যায়। ফলে বিভিন্ন রকমের ইসলাম-বিরোধী চিন্তা ভাবনা মাথার মধ্যে তৈরী হয়।

তাগুতের প্রভাব

- তাগুত হলো আল্লাহ বিরোধী শক্তি, এবং সেটা কোন মানুষও হতে পারে অথবা মানুষের তৈরী আইন-কানুনও হতে পারে।

- তাগুত বলতে সুস্পষ্টভাবে এমন শাসককে বুঝায় যে নিজে আল্লাহর আইন মানে না এবং অন্যকেও না মানতে বাধ্য করে। এবং যে আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে অন্য কোন আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে। আবার তাগুত বলতে এমন বিচার ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার আনুগত্য করে না এবং আল্লাহর কিতাবকে চূড়ান্ত সনদ হিসেবে স্বীকৃতিও দেয় না।

- তাই তাগুত অর্থ হলো যে কোন আল্লাহ বিরোধী বিদ্রোহী শক্তি। কাফির ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করে মাত্র। কিন্তু তাগুত মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব করতে বাধা দেয়, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার আনুগত্য করতে বাধ্য করে এবং রাষ্ট্রে ইসলাম-বিরোধী কার্যক্রম বিস্তার করতে সহায়তা করে। তাগুতের ভালো উদাহরণ হলো ফিরাউন যে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য করতে বাঁধা দিত। আল কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

  হে নবী! তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যারা এই মর্মে দাবী করে চলছে যে, তারা ঈমান এনেছে সেই কিতাবের প্রতি যা তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং সেই সব কিতাবের প্রতি যেগুলো তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল; কিন্তু তারা নিজেদের বিষয়গুলোর ফায়সালা করার জন্য 'তাগুতে'র দিকে ফিরতে চায়, অথচ তাদেরকে তাগুতকে অস্বীকার করার হুকুম দেয়া হয়েছিল? শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সরল সোজা পথ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। (সূরা আন নিসা ৪ ঃ ৬০)

- কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও আল্লাহ বিরোধী তাগুতকে অস্বীকার করা, এ দু'টি বিষয় পরস্পরের সাথে অংগাংগীভাবে জড়িত

(Interconnected)। আল্লাহ ও তাগুত উভয়ের সামনে একই সাথে মাথা নত করাই হচ্ছে সুস্পষ্ট মুনাফিকী।

বিভিন্ন ফিলোসফি বা মতবাদের প্রভাব

- এগুলো শত শত বছরের আনইসলামিক চিন্তাধারা। তর্ক শাস্ত্র (লজিক), - বিভিন্ন রকম ইজম যেমন ঃ কমিউনিজম, ক্যাপিটালিজম, সেক্যুলারিজম; বিভিন্ন রকম ফিলোসফি যেমন ঃ গ্রীক ফিলোসফি, পারসিয়ান ফিলোসফি, সম্রাট আকবরের প্রতিষ্ঠিত দ্বীন-ই-ইলাহী; বিভিন্ন রকম সংস্কৃতি যেমন ঃ ধ্রুপদী সংস্কৃতি, লালন সংস্কৃতি; বিভিন্ন রকম কলা যেমন ঃ শিল্পকলা, ললিতকলা ইত্যাদিও আমাদের সন্তানদের উপর দীর্ঘদিন ধরে প্রভাব ফেলে আসছে।
- ফিলোসফি মানে হচ্ছে অলীক, অস্তিত্বহীন বস্তুর পেছনে ধাওয়া করা। যেমন বলা হয়ে থাকে ঃ Philosophy is like searching for a black cat in a dark room where the cat is absent. ফিলোসফি হচ্ছে কল্পনা, যার সঠিক কোন ভিত্তিই নেই। এসব মানুষের জীবনে কোনই কাজে আসে না। বরং সেসব মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দেখানো সরল-সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে নয়, পথভ্রষ্ট করে দেয়।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রভাব

- স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির অনেক শিক্ষকরাই নাস্তিক অর্থাৎ আল্লাহকে বিশ্বাস করেন না। এই সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মহান আল্লাহ তা'আলা যথেষ্ট ট্যালেন্ট দিয়েছেন অথচ তাদের এই ট্যালেন্টকে তারা আল্লাহ যে নেই তা প্রমাণ করার কাজে ব্যয় করেন। তাদেরকে এক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী অনুসরণ করে আল্লাহর অস্তিত্ত্ব অস্বীকারকারী ধর্মবিরোধী নাস্তিকে পরিণত হয়।

স্কুল-কলেজের প্রভাব

- স্কুল ম্যানেজমেন্ট যদি ইসলামিক মনমানসিকতার না হয় তাহলে তাও শিক্ষার্থীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

- যেমন, স্কুলে যদি যোহর ও আসর সলাতের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে তো তা কারোরই পড়া হয় না। তার উপর যদি স্কুল থেকে কোন চাপ না থাকে তাহলে তো কোন কথাই নেই।
- কোন কোন স্কুলের কর্তৃপক্ষ মেয়েদেরকে হিজাব করতে দেয়া হয় না, ছাত্রীদেরকে বেপর্দা হতে বাধ্য করে।
- এতো গেল বাংলা মিডিয়ামের স্কুলগুলোর কথা। কিন্তু নন-ইসলামিক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর অবস্থাতো আরো খারাপ। সেখানে তো ইসলাম চর্চা করার কোন সুযোগই নেই, যদি কোন ছেলেমেয়ে আগে থেকে কিছুটা ইসলামিক মনমানসিকতার হয়ে থাকে তাহলে তাও তারা দিন দিন হারিয়ে ফেলে।

বিভিন্ন রকম ড্রাগ এবং মদ পানের প্রভাব

- ইউনিভার্সিটি-কলেজের ছেলেমেয়েরা অনেকেই নিজেদের অজান্তে ড্রাগ এডিকটেড হয়ে পড়ছে। তারা হয়তো কোন বন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রথমে টেস্ট করতে গিয়েছিল। তারপর থেকে একটু একটু করে একসময় পুরোদমে এডিকটেড হয়ে পড়েছে। বাব-মায়েরা শুরুতে বুঝতে পারেন না কিন্তু যখন জানেন তখন আর তেমন কিছু করার থাকে না।
- মদ একসময় আমাদের দেশে খুব একটা সহজলভ্য ছিল না। বড় বড় হোটেলগুলোতে বিদেশী এবং হাই অফিসিয়ালদের জন্য রাখা হতো। কিন্তু এখন সিনারিও পাল্টে গেছে। মদ এখন চাইলেই পাওয়া যায়। ইউনিভার্সিটি-কলেজের ছেলেরা কোন না কোনভাবে এই পানীয়টার সাথে পরিচিত হয়ে যাচ্ছে, তারপর বন্ধু-বান্ধব মিলে নিয়মিত আড্ডাতে মদ পান করা হয় ও ড্রাগ ব্যবহার করা হয়। এই খবর অনেক বাবা-মারাই জানেনেই না, কারণ বাবা-মায়ের জন্য বিষয়টি ধরা খুবই কঠিন।
- কিছুদিন আগে এক পুলিশ অফিসারের মাদকাসক্ত তরুণী কণ্যা নেশার টাকা না পেয়ে বাবা-মাকে খুন করিয়েছে- এটাই হলো আজ আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা।

জুয়া খেলা ও সিগারেট খাওয়ার প্রভাব

- শুনলে অবাক হতে হয় যে কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া অনেক ছেলেরাই একত্রে বসে নিয়মিত টাকা দিয়ে জুয়া খেলে। বাবা-মা হয়তো এই ধরণের কথা কল্পনাও করতে পারেন না। কিন্তু এটা এতো বেশী বিস্তার লাভ করেছে যে আমাদের সন্তানদের জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে। ইউনিভার্সিটি-কলেজে পড়ুয়া ছেলেদের নিজস্ব রুম থাকে, সেখানে তার প্রাইভেসি থাকে। বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে যখন তারা আড্ডা দেয় তার কোন কন্ট্রোল বাবা-মার কাছ থাকে না। আর এই সুযোগ অনেকেই নেয় এবং দরজা বন্ধ করে জুয়া খেলে আর পর্নগ্র্যাফী দেখে।

- বিশেষ করে ছেলেরা কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে উঠে নিজেকে বড় ভাবতে থাকে, mature মনে করতে থাকে। আর এই ভাব প্রকাশের অংশ হিসেবে তারা বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পরে এক টান দুই টান দিতে দিতে সিগারেট পানে অভ্যস্ত হয়ে যায়। একটি গ্রুপে যে ছেলেটি সিগারেট খায় না, মদ খায় না, জুয়া খেলে না তাকে immature মনে করা হয়।

ছেলেমেয়েদের আপত্তিকর আনন্দ ফুর্তি (Fun)

- কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া অনেক ছেলেমেয়েরাই একত্রে বসে যখন আড্ডা দেয় তখন তারা নানা রকম আনন্দ ফুর্তি করে থাকে। ফুর্তিরও একটি মাত্রা আছে, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে ফুর্তির নামে তারা মাত্রা ছাড়িয়ে আপত্তিকর কাজকর্ম করতে থাকে। যেমন ঃ

    - আল্লাহ-রসূলকে নিয়ে নানা রকম কটূক্তি করা।
    - কুরআনকে নিয়ে কটূক্তি করা।
    - রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর স্ত্রীদের নিয়ে আজেবাজে কথা বলা।
    - নামায-রোযা-হাজ্জ নিয়ে বাজে মন্তব্য করা।

- এখানেই শেষ নয়। তারা একে অপরের বাবা-মাকে নিয়েও ফান করে, মুরুব্বীদের নিয়ে ফান করে, মসজিদের ঈমাম-মুয়াজ্জিনকে নিয়ে ফান করে, আলিম-ওলামাদের স্ত্রীদের নিয়ে ফান করে, বোরকা পরিহিতা মহিলাদের

নিয়ে ফান করে, নিকাব করা মহিলাদের নিয়ে ফান করে, দাড়ি-টুপি নিয়ে ফান করে ।

- এখানে তাদের তেমন একটা দোষ দেয়া যাবে না । কারণ তারা এর জন্য কোন সঠিক শিক্ষা নিজ ঘর বা স্কুল থেকে কোন দিন পায়নি । সব কিছুর একটা সীমা আছে, আমরা ভুলেই যাই যে সীমা লংঘনকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না ।

বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব

- অনেক মুসলিম নামধারী বুদ্ধিজীবী আছেন তারা আল্লাহর দেয়া ঐ বুদ্ধিকে আল্লাহরই বিরুদ্ধে কাজে লাগাচ্ছেন । তারা বিভিন্ন রকম গবেষণা করে বের করার চেষ্টা করছেন যে কুরআনে কী কী ভুলভ্রান্তি আছে, ইসলামে কী কী shortcomings আছে বা ইসলামের কোন কোন বিষয়গুলো ঠিক নয় বা ইসলামের কোন কোন দিকগুলো backdated । রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জীবনে কী কী ভুল (?) কাজ করেছেন ও তাঁর কোন হাদীসগুলো ঠিক নয় (?) ইত্যাদি । নাউযুলল্লাহ । আল্লাহ কুরআনে যে বিষয়গুলোকে হারাম করেছেন তারা তার থেকে কিছু কিছু বিষয় যুক্তি দিয়ে হালাল করার চেষ্টা করছেন । কেউ কেউ আবার কুরআনকে revise করার জন্য প্রস্তাব দিচ্ছেন । তারা তাদের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে কুরআন-হাদীসের বাইরে তাদের চোখে দেখা ইসলামের ভুল-ভ্রান্তির সমাধান পেশ করছেন, ইসলামকে আধুনিক করার চেষ্টা করছেন । নাউযুলল্লাহ । তাদের এই অক্লান্ত প্রচেষ্টাও এক প্রকারের জিহাদ আর তা হচ্ছে শয়তানের পথে জিহাদ এবং আল্লাহ ও রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে জিহাদ ।

সংস্কৃতিমনাদের প্রভাব

- বছরের পর বছর ধরে দেখা গেছে সাধারণত যারা সংস্কৃতিমনা, নাটক, সিনেমা, গান-বাজনা, নৃত্য, কবিতা, আর্ট-কালচার ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়েন তাদের মনের মধ্যে একটা ধারণা জেঁকে বসে যে ইসলামের বিরোধীতা করতে হবে । ইসলাম থেকে দূরে সরে থাকতে হবে, ইসলাম পালন করলে সংস্কৃতিমনা হওয়া যাবে না । এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল ।

- অথচ তাদের কেউ যখন মারা যান তখন একদিকে মৃত সংস্কৃতিমনার জন্য বিরাট জানাযার ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ভাবটা এমন যেন মৃত্যুর পরেই শুধু ইসলামের দরকার আছে, জীবিত অবস্থায় ইসলামের কোন প্রয়োজন নেই। যদিও ইসরাম এসেছে জীবিত মানুষের কল্যাণের জন্য।

- কোন কোন সংস্কৃতিমনার লাশ আবার ইসলামি নিয়ম অনুযায়ী লাশ দাফন না করে কোন প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দেয়া হয় ও মৃতের স্মরণে সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রগতিশীলতার প্রভাব

- আমরা অনেকেই নিজেকে প্রগতিশীল মনে করি। বাস্তবে দেখা গেছে যে প্রগতিশীল হলে সর্বপ্রথমে জীবন থেকে ইসলামকে বাদ দিতে হবে। আর সুযোগ পেলেই ইসলামকে নানা ভাষায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে হবে। অনেক প্রগতিশীলরাই মুসলিম পরিবারের সন্তান। এই প্রগতিশীলদের অন্য ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সানন্দে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় কিন্তু তাদেরকে একমাত্র ইসলামিক কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে সাধারণত দেখা যায় না।

ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার প্রভাব

- আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “তোমরা (গায়রে মুহাররাম) মহিলাদের নিকট গমন করা থেকে দূরে থাক।” (সহীহ বুখারী)

- আমর ইবনুল আস (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, “নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বামীদের অনুমতি ব্যতিরেকে মহিলাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছেন।” (তাবারানী)

- আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেছেন, “যেই পুরুষ স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন মহিলার শয্যায় বসবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার জন্য একটি বিষধর অজগর সাপ নিযুক্ত করে দেবেন।” (মুসনাদে আহমাদ)

- আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "কোন মুহাররাম সংগী ছাড়া কোন মহিলা সফর করবে না এবং কোন মুহাররামকে সংগে না নিয়ে কোন পুরুষ কোন মহিলার কাছে যাবে না।" (সহীহ বুখারী)

- জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যেই ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী সেই ব্যক্তি কখনো একাকীত্বে কোন মহিলার নিকট বসবে না যদি সেই মহিলার কোন মুহাররাম পুরুষ উপস্থিত না থাকে। কেন না তা করা হলে তৃতীয় পুরুষ হিসেবে উপস্থিত থাকে শয়তান।" (আহমাদ)

- তামীম ইবনু আবী সালামাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। আমর ইবনুল আস (রাদিআল্লাহু আনহু) কোন প্রয়োজনে আলী ইবনু আবী তালিবের (রাদিআল্লাহু আনহু)-র বাড়িতে যান। তিনি আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে পেলেন না। তিনি ফিরে গিয়ে আবার এলেন। এবারও আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে পেলেন না। ফিরে গিয়ে তৃতীয়বার এসে তিনি আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে পেলেন। আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন, "আপনার প্রয়োজন যখন ফাতিমার সাথে সম্পর্কিত ছিলো আপনি ফিরে না গিয়ে তার কাছে গেলেন না কেন?" জবাবে তিনি বললেন, "মহিলাদের স্বামীদের অনুপস্থিতিতে তাদের কাছে যেতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।" (সহীহ বুখারী)

- উপরের হাদীসগুলো থেকে আমরা অনায়াসেই বুঝতে পারছি যে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা কীভাবে তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড পিকআপ-ড্রপ

- ২০১৩ সালের কথা। ধানমন্ডি স্টার কাবাবে গিয়েছি পরের দিনের একটি প্রোগ্রামের বিরিয়ানির অর্ডার দেয়ার জন্য। যেতে যেতে একটু রাত হয়ে গিয়েছিল, আনুমানিক রাত ১১। আশ্চর্যের বিষয় হলো এতো রাতে গিয়েও দেখি স্টার কাবাব এর ৫-৬ তলা পুরো রেস্টুরেন্টটি কাস্টমারে পরিপূর্ণ। প্রতিটি টেবিলেই রয়েছে জোড়ায় জোড়ায় ইয়ং কাপল। অনেকেই নতুন

শাড়ি পড়া, চুলের খোপায় কাঁচা ফুল। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে বেশীরভাগ কাপলই অবিবাহিতা অর্থাৎ বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড। তখন মনে প্রশ্ন জাগল এতো রাতে এতো কাপল কেন? পরে জানতে পেরেছি আজ ভ্যালেন্টাইস্ ডে।

- যা হোক এখন বাবামায়েদের নিকট প্রশ্ন, আমার যুবতী মেয়ে এতো রাতে কোথায় গেছে? কী করছে? আমার কী একটিবারও চিন্তা হয় না! হয়তো রাতে এক সময় বয়ফ্রেন্ড মেয়েকে বাসায় ড্রপ করে দিয়ে যাবে। আমি বাবা-মা হিসেবে এই বিষয়টি কতো সহজভাবে নিচ্ছি! ওয়াষ্টার্ন দেশগুলোতে যেমন একজন মা খুবই চিন্তামুক্ত থাকে যদি তার মেয়ের একটি বয়ফ্রেন্ড থাকে। আজ আমাদের দেশের বাবামায়েদেরও হয়তো এই ধরনের মনমানসিকতা গড়ে উঠছে, যে আমার মেয়েতো তার বয়ফ্রেন্ডের সাথেই আছে, নিরাপদেই আছে।

বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড কালচারের প্রভাব

- **একজন অভিভাবকের প্রশ্ন** ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাঙের ছাতার মত প্রচুর মিনি চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট এবং সাইবার ক্যাফে গড়ে উঠেছে কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময় ও ভয়ের কারণ হলো যে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবসার নামে চলে চরম বেহায়াপনা। বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ছাত্র ও যুবকেরা প্রেমের নামে প্রতারণা করে ছাত্রী মেয়ে বান্ধবীদেরকে নিয়ে এ সমস্ত চাইনিজ ও সাইবার ক্যাফেতে সারাদিন আড্ডা দেয় এবং মেয়েদের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে। আমাদের কোমলমতি মেয়েদেরকে ব্ল্যাক মেইলিং করে তাদের পর্নো সিডি/ডিভিডি বাজারে ছেড়ে অশ্লীলতার এ মহোৎসব শুরু করেছে, বিশেষ করে স্কুল-কলেজ পড়ুয়া বোনেরা এর শিকার হয়ে জীবনের মহামূল্যবান সম্পদ হারাচ্ছে। এ সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী?

- **উত্তর** ঃ এ সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য পরিষ্কার। ইসলাম অন্যায়কে কখনোই মেনে নেয় না। অসৎ কর্মকে কখনোই সমর্থন করে না। পাপ ও ঘৃণাজনক কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগায় না। পৃথিবীর বুকে একমাত্র ইসলামই সর্বক্ষেত্রে মানবতার কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সদা সচেষ্ট। তাই উল্লিখিত পরিস্থিতিতে যারা অন্যায় বৃদ্ধি করার মতো পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরী করে দিচ্ছে (সরকার এবং প্রতিষ্ঠানের মালিক পক্ষ) আর যারা অন্যায় কাজে

লিপ্ত হচ্ছে (ছাত্র-ছাত্রী বা যুবক-যুবতীরা), সবার জন্যই ইসলামি বিধান অনুযায়ী শাস্তি অবধারিত।

- অবশ্য এ প্রশ্নে অভিভাবক ছাত্রী বা মেয়েদের অবলা বা সরলা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এমন ক্ষেত্রে ছাত্রী বা মেয়েদের প্রতি লক্ষ্য করে জবাব হচ্ছে ঃ এগুলো আরও বাড়বে যদি মেয়েরা তাদের সম্মান সম্পর্কে সতর্ক না হয়। এখন প্রশ্ন ঃ মেয়েরা ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব করতে যাবে কেন? এবং তাদের দাওয়াতে কোন রেষ্টুরেন্টে অথবা কোন সাইবার ক্যাফেতে তারা যাবে কেন? আর যখন প্রশ্নকর্তা বলছেন 'মেয়েদের সরলতা নিয়ে' ছেলেরা এমনটি করছে। এক্ষেত্রেও দায়ী মেয়েরা কারণ এমন সরলতার কোন দাম নেই। সরলতার কারণে কি কেউ বিষ খায়? সরলতার কারণে কি কেউ গলায় দড়ি দিয়েছে বা পানিতে ডুবে মরেছে! এরকমতো হয় না। এটা কি ধরনের সরলতা?

- যুবতী মেয়ের ভাবা উচিত তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার সতীত্ব। যার সাথেই টেলিফোনে কথা হোক আর ক্লাসমেট হোক বা অন্যকেউ হোক, যে কারো সাথে ফোনে কথা বলে বন্ধুত্ব্য বানিয়ে কোন জায়গায় বেড়াতে যাবার অর্থ সরলতা নয় বরং এটা চরম বোকামি ও জেনে শুনে নিজের ঘাড়ে ভয়ংকর বিপদের বোঝা চাপানো। একবার নির্জনে এসব তথাকথিত ছেলেবন্ধুর সাথে ঘনিষ্টতা করলে নিজের দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই নষ্ট হবে। এভাবে এসব সরল মেয়েদের দিয়ে পর্নোছবি উঠালে তার বিবাহের আর কোন সুযোগ থাকে না। এসব ঘটনা আজকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব বেশী দেখা যাচ্ছে।

- এসব বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো ছাত্রী জীবনে কোন ছেলেদের সাথে অবৈধ মেলামেশা বা প্রেমে লিপ্ত না হওয়া। এটা মনে রাখা দরকার প্রত্যেক মেয়ের জন্য একজন বৈধ পুরুষ সাথী (স্বামী) আল্লাহ তা'আলা রেখেছেন। সুতরাং বিয়ে একদিন হবেই। তার আগে প্রেম অর্থাৎ বিবাহ-বহির্ভূত প্রেম ইসলাম হারাম করেছে। ইসলামে এটা জায়েয নেই। এতে নিজের সর্বনাশ করা ছাড়া আর কোন লাভ নেই। কাজেই এটাকে সরলতা বা কোমলতা কোনভাবেই বলা যায় না। এটা যেন ইচ্ছে করেই সাপের কামড় খাওয়া বা ইচ্ছে করে গর্তে পড়ে আত্মহত্যা করার শামিল।

- সুতরাং কোন (তথাকথিত) পুরুষ বন্ধুর সাথে কোন মেয়ে ঘরের বাইরে যাওয়া মোটেই উচিৎ নয়। ছেলেমেয়েদের নৈতিক শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে

পিতা-মাতাদেরকে আরো বেশী সতর্ক হওয়া উচিত। আল্লাহ আমাদেরকে ও আমাদের সন্তানদেরকে হিফাযত করুন।

‘লিভ টুগেদার’ ও “এম.আর. (M.R.)” অতি সাধারণ বিষয়?

- ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে বিয়ে না করে একজন পুরুষ ও একজন নারীর স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করা ইসলামি শরীআত অনুসারে হারাম, শক্ত গুনাহের কাজ। অথচ এই বিষয়টি এখন বৈধ ও গ্রহণযোগ্য কাজে পরিণত হয়েছে। ছেলেমেয়েরা বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরছে, অসামাজিক কার্যকলাপ করছে এতে কেউ কিছুই মনে করছে না। পার্কে একটি ছেলে একটি মেয়ের দেহের উপর মাথা দিয়ে সারাদিন শুয়ে আছে! কতো মানুষ দেখছে কিন্তু কেউ কিছু মনে করছে না।
- শুধু এম.আর. (M.R.) অর্থাৎ গর্ভপাত (Abortion) করার জন্য ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য শহরগুলোর আনাচেকানাচে ব্যাঙের ছাতার মতো শতশত ক্লিনিক হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় এদের কমিশনভিত্তিক এজেন্ট নিয়োগ করা রয়েছে। এই ক্লিনিকগুলোর মূল ব্যবসাই হচ্ছে অবৈধ গর্ভপাত করানো। একটি দৈনিক প্রত্রিকার সাক্ষাৎকারে একজন মহিলা ডাক্তার দুঃখ করে বলেছেন যে এই কাজের জন্য তারা সবচেয়ে বেশী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিবাহিতা মেয়েদেরকে পেয়ে থাকেন।
- অবৈধ গর্ভপাত করানো খুব সহজলভ্য হওয়াতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে অবৈধ মেলামেশাও বেড়ে গেছে। তারা এখন আর অনৈতিক কাজ করতে মোটেও চিন্তা করে না।
- কনডম (condom)-এর অপব্যবহার ঃ ‘কনডম’ আমাদের দেশে আনা হয়েছিল বিবাহিত দম্পতিদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বর্তমানে এটা সহজলভ্য হওয়াতে অবিবাহিত যুবক-যুবতীরা এর সাহায্য নিয়ে অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ (unwanted pregnancy) এড়িয়ে অবাধে বিবাহ-বহির্ভূত যৌনকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে যারা ফেসে যাচ্ছে তারাই ক্লিনিকে দৌঁড়াচ্ছে M.R. করার জন্যে।

‘ভ্যালেন্টাইন’স ডে’ (Valentine’s Day)-র প্রভাব

- গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে ‘ভ্যালেন্টাইন’স ডে’ বা ‘ভালবাসা দিবস’ নামে এই নতুন দিবসটি খুব উৎসাহ সহকারে উদযাপন করা হচ্ছে। আগে শুধু এ দেশেই নয়, বেশির ভাগ মুসলিম দেশেই এটা পালিত হতো না। হোটেল মালিকসহ ব্যবসায়ীদের একটি অংশও ব্যবসায়িক মুনাফার স্বার্থে এতে উৎসাহ জোগাচ্ছেন। ‘ভালবাসা দিবসে’র ইতিহাস ও ভিত্তি কী? ড. খালিদ বেগ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। সেখান থেকে কিছু কথা তুলে ধরা জরুরি। বিজাতীয় সংস্কৃতি চর্চা করছেন যেসব মুসলিম, তাদের বেশির ভাগই জানেন না যে, আসলে তারা কী করছেন। তারা অন্ধভাবে অনুকরণ করছেন তাদের সাংস্কৃতিক নেতাদের, যারা তাদের মতোই অন্ধ।

- ‘ভালবাসা দিবস’-এর প্রচলন ইউরোপের বেশির ভাগ দেশ থেকে উঠে গিয়েছিল। তবে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে এটা উদযাপিত হতো। দিবসটি হঠাৎ করে বহু মুসলিম দেশে গজিয়ে উঠেছে। ভালবাসা দিবসের উৎপত্তি নিয়ে কাহিনী-কিংবদন্তি প্রচুর। এটা স্পষ্ট, খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রোমানরা এটা শুরু করেছিল পৌত্তলিক পার্বণ হিসেবে। ‘উর্বরতা ও জনসমষ্টির দেবতা’ লুপারকাসের সম্মানেই এটা করা হতো। এর প্রধান আকর্ষণ ছিল লটারি। ‘বিনোদন ও আনন্দে’র জন্য যুবকদের মাঝে যুবতীদের বণ্টন করে দেয়াই ছিল এ লটারির লক্ষ্য। পরবর্তী বছর আবার লটারি না হওয়া পর্যন্ত যুবকেরা এ ‘সুযোগ’ পেত।

- ভালবাসা দিবসের নামে আরেকটি ঘৃণ্য প্রথা ছিল মেয়েদের প্রহার করা। সামান্য ছাগলের চামড়া পরিহিত দুই যুবক উৎসর্গিত ছাগল ও কুকুরের রক্তে শরীর রঞ্জিত করে চামড়ার তৈরি বেত দিয়ে মেয়েদের উপর এ নির্যাতন চালাত। এ ধরনের ‘পবিত্র ব্যক্তি’দের ‘পবিত্র’ বেতের একটি আঘাত খেলে যুবতীরা আরো ভালোভাবে গর্ভধারণ করতে পারবে বলে বিশ্বাস করা হতো।

- খ্রিষ্টধর্ম এই কুপ্রথা বন্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। এ প্রয়াসের অংশ হিসেবে প্রথমে মেয়েদের বদলে সন্ন্যাসীদের নামে লটারি চালু হলো। মনে করা হয়েছিল, এর ফলে যুবকেরা তাদের জীবনকে অনুসরণ করবে। খ্রিষ্টধর্ম এ ক্ষেত্রে শুধু একটুকুই সফল হলো যে, ভালবাসা দিবসের নাম

‘লুপারক্যালিয়া’ থেকে ‘ভ্যালেন্টাইন’স ডে’ হয়েছে। গেলাসিয়াস নামের পোপ ৪৯৬ খ্রিষ্টাব্দে এটা করেন সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন নামের সন্ন্যাসীর সম্মানার্থে। তবে ৫০ জন ভ্যালেন্টাইনের কথা শোনা যায়। তাদের মধ্যে মাত্র দু’জন সমধিক পরিচিত। অবশ্য তাদের জীবন ও আচরণ রহস্যাবৃত। একটি মত অনুসারে, ভ্যালেন্টাইন ছিলেন ‘প্রেমিকের সন্ন্যাসী’, তিনি একবার কারাবন্দী হয়েছিলেন এবং কারাগারের অধিকর্তার কন্যার প্রেমে পড়েন।

- কিন্তু উপরে বর্ণিত লটারি নিয়ে মারাত্মক সঙ্কট দেখা দেয়ায় ফরাসি সরকার ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ভ্যালেন্টাইন দিবস উদযাপন নিষিদ্ধ করে দেয়। এদিকে সময়ের সাথে সাথে একপর্যায়ে ইতালি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও জার্মানি থেকে দিবসটি বিদায় নেয়। সপ্তদশ শতকে পিউরিটানেরা যখন বেশ প্রভাবশালী ছিল, তখন ইংল্যান্ডেও ভালবাসা দিবস নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। পরে ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে রাজা দ্বিতীয় চার্লস আবার এটি পালনের প্রথা চালু করেন। ইংল্যান্ড থেকে ভ্যালেন্টাইন গেল ‘নতুন দুনিয়া’য় অর্থাৎ আমেরিকায়। সেখানে উৎসাহী ইয়াঙ্কিরা পয়সা কামানোর বড় সুযোগ খুঁজে পেল এর মাঝে।
- বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম। মূলতঃ ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী ‘ভালবাসা দিবস’ বলতে কিছু নেই। প্রতিটি মুসলিমের জন্য প্রতিটি দিবসই ভালবাসার দিবস। আসলে Islam শব্দের উৎপত্তিই হচ্ছে peace থেকে। তাই ইসলাম বছরের ৩৬৫ দিনই শান্তির কথা বলে, ভালবাসার কথা বলে। ইসলামে ভালবাসাবিহীন কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম বলে প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মানুষকে বৈধভাবে ভালবাসবে, একজন আরেকজনের মঙ্গল কামনা করবে। এর মধ্যে থাকবে না কোন কৃত্রিমতা, থাকবে না কোন লৌকিকতা, থাকবে শুধু পবিত্রতা। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ
- “তোমরা জান্নাতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমানদার হবে। আর তোমরা পুরোপুরি ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। ...” (সহীহ মুসলিম)
- “তোমাদের মধ্যে কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে”। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

- এবার মুসলিমদের মনে এ দিবস সম্পর্কে কৌতুহল জাগতে পারে। 'ভ্যালেন্টাইন'স ডে' মূলতঃ প্রেমিক-প্রেমিকাদের উৎসবের দিন। ইসলাম বিয়ের আগে ছেলে এবং মেয়ে ফ্রেন্ডশীপ (বন্ধুত্ব) বা গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড সম্পর্ক কখনোই অনুমোদন করে না। এটা হারাম। আর 'ভ্যালেন্টাইন'স ডে' বা ভালবাসা দিবস পালন করে এই অবৈধ সম্পর্কের নানারকম আনুষ্ঠানিকতা এবং অসামাজিক কর্মকান্ড অবশ্যই গুনাহর কাজ। হারাম।

কো-এডুকেশনের প্রভাব

- কো-এডুকেশন মানে ছেলেমেয়েরা একই সময়ে একই স্থানে, একই শ্রেণীকক্ষে বসে পড়ালেখা করা। যার দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল অনেক ক্ষেত্রেই খারাপ হচ্ছে। এতে নানা ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়েদের মাঝে অবৈধ সম্পর্কের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। যদিও পশ্চিমা দৃষ্টিতে ও আইনানুসারে এই সম্পর্ক বৈধ। চলুন সম্পর্কে বাংলাদেশের একটি চিত্র দেখি।

- বাংলাদেশ অবজার্ভার পত্রিকায় ডা. সাবরিনা কিউ রশীদ একটি আর্টিক্যালে লিখেছেন, 'পূর্বে কখনো আমরা ডাক্তারেরা এত অধিক সংখ্যক অবিবাহিত অল্প বয়স্ক মেয়েকে গর্ভবতী হতে দেখিনি'। তিনি এ মন্তব্য সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের সম্পর্কে করতে গিয়ে প্রবন্ধে উল্লেখ করেন - ছাত্র-ছাত্রীদের পারস্পরিক কথাবার্তা শেষ পর্যন্ত আর শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এগুলো পরবর্তীতে স্পর্শ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যৌন হরমোনের নিঃসরণ হওয়ায় যে কোন স্পর্শ শরীর ও মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। এটি ছেলেদের ক্ষেত্রে বেশি ঘটে। কেননা মেয়েরা একটু ঠাণ্ডা হলেও ছেলেরা অনেক বেশি আবেগপ্রবণ। সুতরাং মেয়েরা ছেলেদের বন্ধু হিসেবে নিতে চাইলেও ছেলেরা তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবে।

- সেজন্য ডা. সাবরিনা সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের ছেলেদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা না করতে এবং নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে চলতে বলেছেন। ডা. সাববিনা রশীদের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত। বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিমপ্রধান দেশের চিত্র যদি হয় এমন তাহলে আমাদের অবশ্যই সেটা গুরুত্বসহকারে ভেবে দেখতে হবে।

- তাছাড়া চিন্তা করা উচিত যে ছেলেমেয়েদেরকে দুটো ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন মেজাজে, ভিন্ন চাহিদা ও শারীরিক গঠনে, ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন বস্ত্র পরিধান করার আদেশ দিয়ে স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন। তাহলে কিভাবে তাদের মধ্যে স্রষ্টার আদেশ ব্যতিরেকে মিল বা বন্ধুত্ব হতে পারে? (বিয়ে ছাড়া কি সম্ভব!) তবে যেহেতু এদের সাথে ক্লাস করতেই হচ্ছে কাজেই তাদের উভয় পক্ষেরই আচরণ অত্যন্ত ফর্মাল হওয়া উচিত, ঘনিষ্ট নয়, যাতে ক্ষতিকর কিছু ঘটার সুযোগ না থাকে।

- ইসলাম ছেলেমেয়েদেরকে অবাধে চলাফেরা করা, বিনা প্রয়োজনে পাশাপাশি বসে কথা বলা, রাস্তা দিয়ে যাওয়া, শপিং মলে একসাথে কেনাকাটা করতে যাওয়া ইত্যাদি নিরুৎসাহিত করেছে। অফিসে বা কর্মস্থলে পুরুষ ও মহিলা একটা নিরাপদ দূরত্ব ব্যতিরেকে পাশাপাশি কাজ করাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ছেলে ও মেয়ে উভয়েই মানুষ; কিন্তু তাদের মাঝে ভিন্নতাও আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মেয়েদের দেহকে কোমলরূপে সৃষ্টি করেছেন। নম্রতা, বিনয়, মায়া মমতার আধিক্য এবং প্রখর সৌন্দর্যানুভূতি তাঁদের চরিত্রের ভূষণ। ফলে তারা সহজেই অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন।

- রেলগাড়ি যেমন আপন আপন লাইন ধরে ছুটে চলেছে, কারো সাথে কারো সংঘাত নেই, ঠিক এভাবেই আল্লাহর নির্দেশ মান্য করে আমরা যদি আপন আপন সীমারেখার মধ্যে চলাফেরা করি, তাহলে আমাদের জীবনে কোনরূপ অশান্তি আসবে না। আমরা যতক্ষণ আল্লাহর হুকুম বা বিধান মেনে চলবো, ততক্ষণ আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি আমাদের পক্ষ হয়ে আমাদের সাহায্য করবে। যেমন আগুন সাহায্য করেছিল ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-কে। পানি সাহায্য করেছিল মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে, ছুরি সাহায্য করেছিল ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে। আর যদি আল্লাহর বিধান অমান্য করে নিজের খুশিমতো খামখেয়ালীভাবে চলাফেরা করি, তবে আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। যেমন লোহিত সাগরের (Red Sea) পানি ফেরাউনের বিরুদ্ধে লড়েছিল, আল্লাহর সৃষ্টি মশা যেমন নমরূদের বিরুদ্ধে লড়েছিল, আবাবিল পাখি যেমন লড়েছিল বাদশা আবরাহা ও তার বিরাট হাতী ও সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে ইত্যাদি।

উচ্চ শিক্ষিতদের চিন্তাধারা

- ঢাকা ইউনিভার্সিটি চত্তরে রাতভর নাচ-গান-আলোচনা সভাতে শতশত ছেলেমেয়ে একসাথে অনুষ্ঠান উপভোগ করছে। যুবতী মেয়েরা সারা রাত সেখানে কাটাচ্ছে, অনেক অভিভাবকরাই সেটা ভাল চোখে দেখছেন না। এই বিষয় নিয়ে টিভি চ্যানেলগুলোর টকশোতে আলাপ আলোচনা হচ্ছে।

- এরকম একটি টকশোতে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসরও এসেছিলেন অতিথি বক্তা হিসেবে। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে "এই যে যুবতী মেয়েরা রাতভর সেখানে কাটাচ্ছে আপনি এ বিষয়ে কী মনে করেন বা আপনার অভিমত কী?" তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে "এতে অবাক হওয়ার কী আছে, আমি তো এতে খারাপ কোন কিছু দেখছি না, আমিওতো আমার ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া মেয়েকে গতরাত থেকে সেখানে নিজে দিয়ে এসেছি।"

অবৈধ বা হারাম উপার্জনের প্রভাব

- প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য হালাল রুজির সন্ধান করা অবশ্যকর্তব্য। কেননা হালাল সম্পদ বা খাদ্যই হলো ইবাদত কবুলের শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান শর্ত। হালাল উপায়ে অর্জিত ও শরীয়ত অনুমোদিত অর্থ-সম্পদ বা খাদ্যগ্রহণ ছাড়া আল্লাহর দরবারে কোন ইবাদতই কবুল হয় না। জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জনের গুরুত্ব ইসলামে যেমনি রয়েছে, ঠিক তেমনি হালাল উপার্জনের গুরুত্বও অত্যধিক। ইসলাম অর্থসম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর যাবতীয় ব্যবস্থাকে ইসলাম হালাল করেছে।

- ইসলাম মানুষের জন্য হালাল ও হারামের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণ করেই থেমে থাকেনি, বরং হালাল উপার্জনের দিয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা। (রেফারেন্স সূরা জুমা ৬২ ঃ ৯-১০) ফরয ইবাদত সমূহের আদায়ের পর এ মহতি কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করা হয়েছে। উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল ও বৈধ উপায় অবলম্বন করা ব্যবসায়ীসহ সকল মানুষের উপর ইসলামের একটি অলঙ্ঘনীয় বিধান। যারা উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল ও হারামের প্রশ্নে সতর্কতা অবলম্বন করে না তাদের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মানুষের নিকট এমন একটি সময় আসবে যখন সেই ব্যক্তি কোন উৎস থেকে সম্পদ আহরণ করছে, তা হালাল না হারাম, সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করবে না। (সহীহ্ বুখারী)

- হালাল উপার্জন (ইনকাম) ইবাদত কবুল হবার পূর্বশর্ত। হারাম খেয়ে আমরা যতই সিজদা দেই না কেন, কোন লাভ নেই। হারাম উপার্জনে পালিত সন্তান ইসলামি তরীকায় মানুষ হবারও কোন সম্ভাবনাই নেই।

সর্বত্র দুর্নীতির প্রভাব

- আমরা জানি যে সারা বিশ্বে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে কয়েকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আমাদের দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতির ভয়াবহতা আমরা সকলেই কমবেশী জানি। এই দুর্নীতি দেখতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি, আর সেই সাথে আমাদের বিবেকও ভোঁতা হয়ে গেছে।

- আমাদের সন্তানেরা জন্মের পর থেকেই দেখে আসছে দুর্নীতির দাপট। নিজের বাবা, মা, চাচা, মামা, খালু, ভাই, বোন সকলেই কম বেশী দুর্নীতি করছে। দুর্নীতি করছে করছে মন্ত্রী, এমপি, মেয়র, কমিশনার, চেয়ারম্যান, মেম্বার, শিক্ষক-শিক্ষিকা, পুলিশ, বিডিআর, ডাক্তার, নার্স, কম্পাউন্ডার, ইঞ্জিনিয়র, কন্ট্রাক্টর, জজ, উকিল, মোক্তার, পিয়ন, ব্যবসায়ী, সরকারী, আধাসরকারী, বেসরকারী কর্মকর্তারা। এদের লিস্ট করে শেষ করা যাবে না।

- আমাদের এক পরিচিত ভাই তিনি একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর ডাইরেক্টর। তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে বিদেশে যাচ্ছিলেন বেড়াতে। তাদের ভিসাসহ সকল কাগজ-পত্রই রয়েছে ঠিক মতো। কিন্তু ঢাকা এয়ারপোর্টে কাস্টমস অফিসার তাদেরকে আটকিয়েছে যে 'আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে যে বিদেশে যাচ্ছেন তার ফরেন মিনিষ্ট্রি থেকে এন.ও.সি লাগবে'। তখন ঐ ভাই একটু বিরক্ত হয়ে কাস্টমস অফিসারকে বলছেন 'ভাই কেন দুই নাম্বারী করছেন?' প্রতি উত্তরে কাস্টমস অফিসার বলছেন যে 'দুই নাম্বারীর দেখেছেন কি? দশ নাম্বারী করার জন্য ঘুষ দিয়ে এই পদে চাকুরী নিয়েছি।'

রাজনৈতিক প্রভাব

- ছেলেমেয়েরা কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পরপরই তারা নানাভাবে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে যায়। বিভিন্ন নেতার আদর্শ অনুসরণ করে। তখন তাদের কাছে ইসলামের আদর্শের চেয়ে তার দলের আদর্শ বড় হয়ে দাঁড়ায়। এভাবেই দিন দিন তার চারিত্রিক আদর্শ গড়ে উঠতে থাকে। আমরা যদি বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখি যে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোন রাজনীতি নেই। ছাত্রছাত্রীরা কোন রাজনীতি করে না। অথচ তারা জীবনে খুবই উন্নতি করছে।

- **ছাত্র রাজনীতি** ঃ আমেরিকা-ক্যানাডা-ইউরোপ-অস্ট্রেলিয়ার কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে কোন রাজনীতি নেই। শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা কোন প্রকার রাজনীতি করেন না। তারা পড়া-লেখা নিয়ে এতোই ব্যস্ত থাকেন যে এগুলো করার সময় কোথায়? এছাড়া কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির কোর্সগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা যে কেউ নিয়মিত পড়া-লেখা না করলে এবং ক্লাসে উপস্থিত না হলে পরীক্ষায় কোনভাবেই পাশ করতে পারবে না। কেউ কোন অস্ত্র বহন করতে পারে না আর রাজনৈতিক দলগুলোও কাউকে কোন অস্ত্র সাপ্লাই দেয় না।

- **ইউনিভার্সিটিতে ভিপি পদ** ঃ আমেরিকা-ক্যানাডা-ইউরোপ-অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটিগুলোতে কোন দলাদলি নেই, কোন ক্যাডার নেই, ভিপি বলতে কোন পদ নেই, কেউ ভিপি পদের জন্য ইলেকশানও করে না। ছাত্রদের মধ্যে কেউ কাউকে চাপাতি দিয়ে কোপায় না বা ছাত্রীদের মধ্যে চুল ধরে টানাটানিও হয় না। ইউনিভার্সিটির হল দখল হয় না, খুনাখুনীও হয় না। ছাত্রদের এরকম কাজকর্ম কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

আলিমদের নিয়ে ভুল ধারণা

- অনেকের অভিযোগ আলিমরা কেন রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলবে? দেশ নিয়ে ভাবার অধিকার আলিমদের কে দিল? আমরা যদি ইতিহাস দেখি, দেশ ও ধর্মের পক্ষে কথা বলার জন্য মুসলিমরা কারো কাছ থেকে অনুমতি নেয় না। এটা তার ঈমানী দায়বদ্ধতা। সে দায়বদ্ধতা থেকেই শুরু হয় জালিম শাসকের বিরুদ্ধে ঈমানদারের প্রতিবাদ। যে মু'মিনের জীবনে

জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নেই, তার অন্তরে কোন ঈমানই নেই। এজন্যই প্রাথমিক কালের মুসলিমদের প্রত্যেকেই ছিলেন মুজাহিদ। প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে শহীদের জন্ম হয়েছে। মু'মিনের দায়বদ্ধতা শুধু ইসলামের পক্ষে কথা বলা নয়, বরং জালিমের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করা। অন্যায়ের প্রতিবাদে জালেমের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে কেউ যদি সামান্যতম অবহেলা করে তাহলে সে ব্যক্তি আর মুসলিম থাকে না। প্রকৃত মুসলিম তাই শুধু নামায-রোযা বা হজ-যাকাত পালন করে না। বরং ইসলামের বিপক্ষ শক্তির পূর্ণ পরাজয় ও ইসলামের শরিয়তি হুকুমের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার কাজে জানামালেরও পূর্ণ বিনিয়োগ করে। এই আপোষহীন প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তাঁর ঈমানী পরিচয় পাওয়া যায়।

- অনেকেই ইমামদের রাজনৈতিক বয়ান বা ভাষণেও আপত্তি তোলেন। তাদের দাবী হলো দেশের সমস্ত খারাপ লোক (ঘুষখোর, মদখোর, সুদখোর, ব্যাভিচারি, বিদেশের দালাল) রাজনীতি করতে পারবে, কিন্তু ইসলামের স্তম্ভ মসজিদের ইমামের রাজনীতি করার কোন অধিকার থাকতে পারে না।

- অথচ ইসলামের মহান নবী (সা.) শুধু নামায-কালাম, হজ-যাকাত শিখিয়ে যাননি, তিনি রাজনীতি, প্রশাসন, সমাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আইন-আদালত, ব্যবসা-বানিজ্য, পররাষ্ট্রনীতি ও সমরনীতি শিখিয়ে গেছেন। তিনি মানবজাতির জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ - কুরআনের ভাষায় 'উসওয়াতুন হাসানা'। তিনি মহান আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন কর্মজীবনের প্রতিটি অঙ্গনে। সেটি না হলে তাঁর নবুয়তই অপূর্ণাঙ্গ থেকে যেত। তাছাড়া জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তিনি যদি কোন আদর্শই রেখে না যান তবে তিনি কি উসওয়াতুন হাসানা তথা সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হওয়ার মর্যাদা রাখেন? মু'মিনের দায়িত্ব হলো তাঁর জীবনের পথচলার প্রতি কর্মে নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ খোঁজা এবং তা অনুসরণ করা। মদীনার ১০ বছরের জীবনের তিনি ছিলেন পুরাপুরি একজন রাষ্ট্রনায়ক। ছিলেন প্রশাসক ও জেনারেল। ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি। বহুমুখী সে কাজের জন্য কি তাঁর কোন সেনা নিবাস, সেক্রেটারিয়েট, থানা-পুলিশ বা কোর্ট বিল্ডিং ছিল? সবকিছুর কেন্দ্র ছিল মসজিদে নববী।

সর্বত্রই নাস্তিকতার হার দিন দিন বাড়ছে

- ২০১৩ সালের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে সারা পৃথিবীতে মুসলিমদের সংখ্যা এবং নাস্তিকদের সংখ্যা বাড়ছে। পরিসংখ্যানে আরো দেখা গেছে সকল ধর্মেই তরুণদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নাস্তিকতা বাড়ছে।
- টরন্টো ইউনির্ভাসিটির ২০১০ সালের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে ৭২% মুসলিম ছেলেমেয়েরা আল্লাহতে বিশ্বাস করে না এবং ৮২% মুসলিম ছেলেমেয়েরা এ ব্যাপারে confused (দিশেহারা)। এজন্য কে দায়ী? এরা মুসলিম পিতামাতার সন্তান, বাবা-মায়েরা সন্তানদেরকে এই দেশে নিয়ে এসেছে উচ্চ শিক্ষার জন্য। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার অভাবে আজ এই দুরবস্থা।
- অষ্ট্রেলিয়াতে নাস্তিকদের জন্য সর্বপ্রথম উপাসনালয় তৈরী হচ্ছে। এখন প্রশ্ন তারা কার উপাসনা করবে? এই নাস্তিকরা প্রকৃতবাদী তাই এরা প্রকৃতির উপাসনা করে।
- মুসলিম-অমুসলিম সকল ধর্মেই নিজেদের সন্তানরা নাস্তিক হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে নিজ পরিবারে পিতামাতারা সন্তানদের যথেষ্ট সময় না দেয়া।

নাস্তিকের হজ্জ পালন ও মুসলিম হবার দাবি

- অনেক নাস্তিকরাও আজকাল হজ্জ করে, নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে। কিন্তু এটি কি কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার? হজ তো বহু জালিম, ফাসিক, খুনি-বদমাস, সুদখোর-মদখোর, স্বৈরাচারী এবং ব্যাভিচারীও বার বার করে। এধরনের দুশ্চরিত্র লোক তো মাথায় টুপি লাগায়, লম্বা দাড়িও রাখে। তাতে কি তার আল্লাহভীতি বা ধর্মপরায়ণতা বাড়ে?
- ঈমানের প্রতিফলন হয় ব্যক্তির কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও কাজকর্মে। ঈমান যাচাই হয়, লড়াইয়ের ময়দানে ব্যক্তিটি কোন পক্ষকে (আল্লাহ না তাগুত) সমর্থন করে সংগ্রাম করলো তা থেকে। কতো দাড়ি টুপিধারী ব্যক্তিই তো আজ ইসলামের শত্রুদের সাথে মিশে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। কত মুসলিম নামধারী ব্যক্তিই তো অতীতে ব্রিটিশ, সোভিয়েট

রাশিয়া ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বাহিনীতে যোগ দিয়ে মুসলিম ভূমিতে মুসলিমদের হত্যা করেছে।

- প্রশ্ন হলো, যে সকল নাস্তিক হজ করে আসার খবর বয়ান করেন তারা কি বাংলাদেশে একটি দিনও ইসলামের পক্ষে একটি কথা লিখেছেন বা ময়দানে নেমে একটি বারও ইসলামের পক্ষে আওয়াজ তুলেছেন? হজ তো ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)র সুন্নাত। তাঁর মহান সুন্নাত হলো আল্লাহর সকল হুকুমের প্রতি বিনা দ্বিধায় অবিলম্বে লাব্বায়েক তথা আমি হাজির বলা। যখন তার একমাত্র শিশু পুত্র ইব্রাহীমকে কুরবানী করার নির্দেশ এলো তখনও তিনি বিনা দ্বিধায় লাব্বায়েক বলেছেন। আজ বাংলাদেশের মাটিতে যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছেন তাদের এই প্রচেষ্টা তো আল্লাহর দ্বীনের বিজয় আনার লক্ষ্যে। অথচ নাস্তিকরা তো লাব্বায়েক বলছেন ইসলামের প্রতিষ্ঠা প্রতিহত করার অঙ্গীকার নিয়ে। তাদের আনুগত্য হলো তাগুত (আল্লাহ বিরোধি শক্তি) ও শয়তানের প্রতি। অথচ আমরা দেখছি এক শ্রেণীর নাস্তিক ইসলামের শত্রু পক্ষের আনসার (সাহায্যকারী)রূপে কাজ করছেন এবং ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে লড়াই করছেন। ফলে তাদের সব আমল বরবাদ হয়ে গিয়েছে। ফলে একবার নয়, হাজার বার হজ করলেও এসব নাস্তিকের হজ্জের কি সামান্যতম মূল্য থাকে? এরকম হজ্জের তূলনা হয় সুদখোর, ঘুষখোর ও ব্যাভিচারীর নামায-রোযার সাথে যা আল্লাহর দরবারে কবুল হবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

- নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে কত মুনাফিক বছরের পর বছর নামায পড়েছে। কিন্তু তাতে কি তাদের আদৌ কোন কল্যাণ হয়েছে? কল্যাণ তো তারাই পেয়েছে যারা আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে রণাঙ্গণে নেমেছে এবং কুরবানী করেছে। পবিত্র কুরআনে তো সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও" (সুরা সাফ আয়াত ১৪)। লক্ষ্য এখানে আল্লাহর দ্বীনের বিজয়। বলা হয়েছে,"হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার কথা বলে দিব যা তোমাদেরকে বেদনাদায়ক আযাব থেকে বাঁচাবে? সেটি হলো তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন এবং আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল দিয়ে চেষ্টা-সাধনা কর, সেটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝতে পারতে।"- (সুরা সাফ আয়াত ১০-১১)।

বিভিন্ন ধর্মে এক আল্লাহ ও নাস্তিকতা

- অনেকে মনে করেন যে সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ) বলতে কিছু নেই। আবার অনেকে মনে করেন সৃষ্টিকর্তা আছে কিন্তু তাঁর সাথে আবার অন্যকেউ শরীক করেন। আল্লাহর কাছ থেকে মূসা (আ.)-এর কাছে ইহুদী জাতির জন্য যে আদেশ-নিষেধ এসেছিল তা তাওরাতে 10 Commandments নামে বর্ণিত আছে, দেখা যাক সেখানে কী বলা হয়েছে ঃ

1. Do not worship any other gods.
2. Do not make any idols.
3. Do not misuse the name of God.
4. Keep the Sabbath holy.
5. Honor your father & mother.
6. Do not murder.
7. Do not commit adultery.
8. Do not steal.
9. Do not lie.
10. Do not covet.

আল্লাহ যে এক তা আমরা অন্যান্য ধর্মেও দেখতে পাই

📖
"Worship almighty Creator & join none with Him in worship"
[Adam, Abraham, Moses, Jesus & Muhammad]
(Peace be upon them)

📖
"I am Lord, and there is none else There is no God besides me."
[The Bible, Isaiah 45:5]

📖
"I am God, and there is none else;
I am God, and there is none like me."
[The Bible, Isaiah 46:9]

📖
"Thou shalt have no other gods before me."
[Judaism]

📖

“Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures.”
[Bhagavad Gita 7:20]

📖

"Ekam evadvitiyam"
"He is One only without a second."
[Chandogya Upanishad 6:2:1]

📖

”Ekam Brahm, dvitiya naste neh na naste kinchan.”
”There is only one God, not the second;
not at all, not at all, not in the least bit.”
“Bhagwan Ek hi hai. Doosra Nahi hai.
Nahi hai, nahi hai, zara bhi nahi hai”.
[Brahma Sutra of Hinduism]

‘মুরতাদ’-দের উপর কিছু বিশ্লেষণ

- মুরতাদ কারা? মুরতাদ তারাই যারা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও মুসলিম সমাজের মাঝে প্রকাশ্যে আল্লাহর বিরুদ্ধে কাজ করে, ইসলামের বিরুদ্ধে কলম ধরে এবং শত্রুদের দলে গিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে হাত মিলায়।

- কোন দেশেই জেলে, তাঁতি, কৃষক বা রাখালকে ধরে সামরিক বাহিনী কোর্ট মার্শাল করে না, দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে তাদের প্রাণদন্ড দেয়া হয় না। কোর্ট মার্শাল তো ঘটে সেনাবাহিনীর সদস্যদের অপরাধের বেলায়। সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ দেশেই বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু সেনাবাহিনীতে একবার যোগ দিলে যেমন উচ্চ মান-মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা আছে তেমনি অলংঘ্যনীয় দায়বদ্ধতাও আছে। সে দায়বদ্ধতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কঠোর শাস্তিও আছে।

- ইসলাম কাউকে মুসলিম হতে বাধ্য করে না। ধর্মে জোর-জবরদস্তি নেই তার ব্যাখ্যা তো এটাই। কিন্তু মুসলিম হওয়ার অর্থই হলো আল্লাহর সৈনিক

রূপে নিজেকে শামিল করা এবং শয়তানী শক্তির পক্ষ থেকে যেখানেই হামলা ঘটে সেখানে গিয়ে হাজির হওয়া ।

- মুরতাদ হলো তারাই যারা আল্লাহর ও মুসলিম উম্মাহর নিরাপত্তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে । ইসলামি শরিয়া মতে সেই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যুদন্ড । নানা ফেরকা ও নানা মাজহাবের উলামাদের মাঝে নানা বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু ইসলামের মৌল বিষয়ের ন্যায় মুরতাদের সংজ্ঞা ও শাস্তি নিয়ে কোন মতভেদ নেই । আর এই শাস্তি কার্যকরী করার দায়িত্ব ইসলামিক রাষ্ট্রের (Islamic State) । ব্যক্তিগতভাবে কেউ এই শাস্তির দায়িত্ব হাতে তুলে নিতে পারবে না ।

অন্যান্য ধর্মে মুরতাদ-দের শাস্তি

- ইংরেজী ভাষায় ব্লাসফেমি একটি বহুল প্রচলিত শব্দ । এর আভিধানিক অর্থঃ খৃষ্টান ধর্মের উপাস্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অমর্যাদাকর, অবজ্ঞামূলক, আক্রমণাত্মক বা শিষ্টাচারবহির্ভূত কিছু বলা বা করা । খৃষ্টান এবং ইহুদী এ উভয় ধর্মেই এমন অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদন্ড । সে শাস্তির কথা এসেছে ওল্ড টেস্টামেন্টে । বলা হয়েছে ঃ "এবং যে ব্যক্তি প্রভুর নামের বিরুদ্ধে ব্লাসফেমি তথা অপমানকর, অমর্যাদাকর বা শিষ্ঠাচার বহির্ভূত কোন কথা বলবে বা কিছু করবে তবে তার নিশ্চিত শাস্তি হলো তাকে হত্যা করা । জমায়েতের সকলে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করবে ।" - (বুক অব লেভিটিকাস ২৪:১৬) ।
- অপর দিকে হিন্দুধর্মে ব্লাসফেমি শুধু ইশ্বরের বিরুদ্ধে কিছু বলাই নয় বরং কোন ধর্মগুরু বা পুরোহিতদের বিরুদ্ধে কিছু বলাও একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধের অন্তর্ভুক্ত । হিন্দুধর্মের আইন বিষয়ক গ্রন্থ মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে, "যদি নিম্মজাতের কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন পুরোহিতকে অবমাননা করে বা তার সাথে খারাপ আচরণ করে তবে রাজার দায়িত্ব হবে দৈহিক শাস্তি বা প্রাণদন্ড দেয়া যাতে সে প্রকম্পিত হয় । -(মনুস্মৃতি ২৪:১৬) ।

ইসলামের দৃষ্টিতে "শহীদ" কে?

- এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের দেশের বেশীরভাগ মানুষই পরিষ্কার ধারণা রাখে না । যে কাউকে যখন তখন শহীদ উপাধি দিয়ে দেয়া হয় । যেমন

দেখা গেছে যে হিন্দু মারা গেলেও বলা হয় শহীদ, আবার নাস্তিক মারা গেলেও তাকে শহীদ উপাধি দেয়া হয় এবং বিরাট আয়োজন করে স্বঘোষিত নাস্তিকের জানাজা পড়ানো হয়। কী আশ্চর্য!

- এবার জানা যাক ইসলামের দৃষ্টিতে আসলে শহীদ কে? সহীহ বুখারীর হাদীস অনুযায়ী ৫ প্রকার 'প্রকৃত মুসলিম' মারা গেলে শহীদ হয়। যেমন ঃ ১) মহামারীতে ২) পেটের পীড়ায়ে ৩) পানিতে ডুবে ৪) ধ্বংসস্তূপে চাপা পরে এবং ৫) আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। অন্যান্য বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। শুধু শেষের বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর পথে কাজ করতে গিয়ে, দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে, দ্বীনের কথা বলতে গিয়ে, দ্বীনের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে মারা যান শুধু মাত্র তাকেই শহীদ বলা হয়। তবে কে শহীদ, কে জান্নাতী, কে জাহান্নামী এই ডিকলারেশনের অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। এই অধিকার শুধু মহান আল্লাহ তায়ালার। কেউ আল্লাহর এই অধিকার নিজের হাতে নিতে পারবে না। কে সত্যিকার ভাবে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে সেটাও তো সিদ্ধান্ত হবে কিয়ামতের দিনে। আমরা রাসূল (সা.) এর জীবনীতে দেখেছি যে কোন এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর সাথে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মারা গেছেন কিন্তু তাকেও শহীদ বলা হয়নি। তাই কারো অন্তরের খবর একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলাই জানেন।

- ইসলামের দৃষ্টিতে পরিস্কারভাবে আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন যে কোন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইহুদী, নাস্তিক, মুরতাদ, মুনাফিক, বেনামাযী কখনো শহীদ হতে পারে না। কারণ বিষয়টা তাদের জন্য না। শহীদ হতে হলে প্রকৃত ঈমানদার, মুমিন, মুসলিম হতে হবে, আংশিক ঈমানের অধিকারী হলে হবে না। অর্থাৎ যদি আমি ইসলামের কিছু অংশ মানবো আর কিছু অংশ মানবো না বলে মত পোষণ করি তাহলে আমি প্রকৃত মুসলিম হতে পারবো না। যেমন শরীয়া মতে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত নামায না পড়লে সে আর মুসলিম থাকে না। এর বিস্তারিত কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলিল আমরা ৪র্থ পরিচ্ছেদে দেখতে পাবো, ইনশাআল্লাহ।

- আমি সারা জীবন ইসলামের বিরোধিতা করলাম, ইসলামের কোন আইন মানলাম না, ইসলামের পক্ষে এক কলম লিখলাম না, ইসলামের পক্ষে কোন কথা বললাম না, ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দিতাম, বেপর্দায় চলতাম আর অতি সহজেই শহীদ হয়ে গেলাম! তা হবে না।

বেশীরভাগ কবীরা গুনাহের সাথে আমরা জড়িত

- কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে সত্তরটির মতো কবীরা গুনাহ রয়েছে। যে গুনাহ আল্লাহ সহজে (খালেস তওবাহ না করলে) মাফ করবেন না। নীচের কবীরা গুনাহের লিস্ট দেখে মনে হবে যে আমরা বাংলাদেশের মুসলিমরা পাল্লা দিয়ে এইসব গুনাহ নিয়মিত করে যাচ্ছি। আর এই সকল গুনাহ করতে করতে আমাদের অন্তরে মরিচা পড়ে গেছে, দিল কঠিন হয়ে গিয়েছে ফলে আল্লাহর আযাবের ভয় অন্তরে আর অবশিষ্ট নেই।

১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা (শিরক)।

২. সলাত ত্যাগ করা (কোন বৈধ কারণ ছাড়া)।

৩. যাকাত আদায় না করা।

৪. সঙ্গত কারণ ছাড়া রমাদানের সওম (রোযা) ভঙ্গ করা বা না রাখা।

৫. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা।

৬. মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া।

৭. ব্যভিচার বা যিনা করা।

৮. মানুষ হত্যা করা।

৯. পেশাবের অপবিত্রতা।

১০. সমকাম ও স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করা।

১১. সুদ আদান-প্রদান করা।

১২. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং নিকট আত্মীয়দের পরিত্যাগ করা।

১৩. এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা।

১৪. যাদু করা বা করানো।

১৫. দুনিয়া অর্জনের লক্ষ্যে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ও সত্যকে গোপন করা।

১৬. আল্লাহ এবং তার রসূলের (সা.) উপর মিথ্যা আরোপ করা।

১৭. শাসক কর্তৃক জনগণকে ধোঁকা দেয়া ও অত্যাচার করা।

১৮. যুলুম (অত্যাচার) করা ।

১৯. চাঁদাবাজী ও অন্যায় টোল আদায় ।

২০. আপন স্ত্রীকে ব্যভিচারের সুযোগ দেয়া ।

২১. গর্ব, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, হটকারিতা

২২. হারাম খাওয়া, তা যে কোন উপায়েই হোক না কেন ।

২৩. আত্মহত্যা করা ।

২৪. মিথ্যা বলা ।

২৫. (আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে) মানবরচিত বিধানে দেশ পরিচালনা ও বিচার-ফয়সালা করা ।

২৬. বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণ করা এবং ঘুষ দেয়া ।

২৭. মহিলা পুরুষের বেশ এবং পুরুষ মহিলার বেশ ধারণ করা ।

২৮. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ।

২৯. মাদক দ্রব্য সেবন করা ।

৩০. জুয়া খেলা ।

৩১. সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া ।

৩২. গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ) মাল আত্মসাৎ করা ।

৩৩. চুরি করা ।

৩৪. ডাকাতি করা ।

৩৫. মিথ্যা শপথ করা ।

৩৬. আমানত খিয়ানত করা ।

৩৭. খোঁটা দেয়া ।

৩৮. তাকদীরকে অস্বীকার করা ।

৩৯. মানুষের নিকট অন্যের গোপন তথ্য ফাঁস করা ।

৪০. পরনিন্দা করা ।

৪১. অভিশাপ দেয়া ।

৪২. বিশ্বাসঘাতকতা করা, ওয়াদা পালন না করা ।

৪৩. গণক ও জ্যোতির্বিদদের কথায় বিশ্বাস করা ।

৪৪. কোন সাহাবীকে গালি দেয়া ।

৪৫. অন্যায় বিচার করা ।

৪৬. স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর অবাধ্য হওয়া ।

৪৭. কাপড়, দেয়াল ও পাথর ইত্যাদিতে প্রাণীর ছবি আঁকা ।

৪৮. শোক প্রকাশার্থে চেহারার (মুখের) উপর আঘাত করা, মাতম করা, কাপড় ছেঁড়া, মাথা মুণ্ডানো বা চুল উঠানো, বিপদের সময় ধ্বংসের জন্য দু'আ করা ।

৪৯. অন্যায় ভাবে বিদ্রোহ করা ।

৫০. দুর্বল, কাজের লোক ও স্ত্রীর উপর অত্যাচার করা ।

৫১. প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়া ।

৫২. মুসলিমদের কষ্ট দেয়া ও গালি দেয়া ।

৫৩. অহংকার করে টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা ।

৫৪. স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করা ।

৫৫. পুরুষের স্বর্ণ ও রেশমী কাপড় পরিধান করা ।

৫৬. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে পশুপাখী যবেহ করা ।

৫৭. ওজনে ও মাপে কম দেয়া ।

৫৮. মৃত ব্যক্তির জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ও উচ্চ শব্দে কান্নাকাটি করা ।

৫৯. আল্লাহর শাস্তি/আযাব হতে নিশ্চিন্ত বা ভয়হীন হওয়া ।

৬০. মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত এবং শূকরের মাংস খাওয়া ।

৬১. জুমু'আর সলাত ছেড়ে দিয়ে বিনা কারণে একা একা সলাত আদায় করা ।

৬২. জেনেশুনে অন্যকে পিতা বলে স্বীকৃতি দেয়া।

৬৩. তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া এবং শত্রুতা পোষণ করা।

৬৪. অপসংস্কৃতি ও কু-প্রথার প্রচলন করা অথবা বিভ্রান্তির দিকে অন্যদের আহবান করা।

৬৫. পরচুলা ব্যবহার করা, শরীরে উলকি আঁকা, ভ্রু প্লাক করা (তুলে ফেলা বা সরু করা), দাঁত ফাঁক করা।

৬৬. ধারালো অস্ত্র দিয়ে কারো দিকে ইশারা করা।

৬৭. হারাম শরীফে ধর্মদ্রোহী কাজ করা।

৬৮. মুসলিমদের ত্রুটি-বিচ্যুতির সন্ধান করা এবং তাদের গোপন তথ্য প্রকাশ করা।

৬৯. ঝগড়া করার সময় অতিরিক্ত গালি দেয়া।

৭০. কোন বংশ বা তার লোকদের খারাপ দোষে অভিহিত করা।

৩য় পরিচ্ছেদ

সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন

সংস্কৃতি-চিন্তার সংগতি-অসংগতি

- সংস্কৃতি মানুষকে সুন্দর করে, মানুষের অন্তর্জগতে সুষমা ও সুস্থতা এনে দেয়। অর্থাৎ সংস্কৃতিচর্চার মধ্য দিয়ে মানবিক মহিমা ও মহত্ত্বের বিকাশ ঘটে। কিন্তু এমনটা যদি ক্রমে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, সংস্কৃতিচর্চার কারণে মানুষ সুন্দর না-হয়ে আরো অসুন্দর হয়ে উঠছে, মানুষ না হয়ে অমানুষে রূপান্তরিত হচ্ছে, সংস্কৃতিচর্চার উর্বর ও অনুকূল ক্ষেত্রগুলো অবাধ যৌনতা ও লাম্পট্যের অভয়ারণ্যে পরিণত হচ্ছে, তা হলে ভয়ের কথা বটে।

- সংস্কৃতি মানে মজা করার জন্য লঘু ও চটুল বিনোদন নয়, সংস্কৃতি হলো একটি জাতির জীবনদর্শনের প্রতিবিম্ব। এইজন্যই সংস্কৃতির মধ্যে একটি জাতির বিশ্বাস ও চৈতন্যের প্রকৃত অভিজ্ঞান জেগে ওঠে। মানুষকে যেমন অন্য কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা চেনা যায় না, চিনতে হয় মুখ দেখে; ঠিক একইরকম, সংস্কৃতি হলো একটা জাতির মুখমণ্ডল। কিন্তু এই মুখমণ্ডল যদি ব্যাধির প্রকোপে কদাকার ও বীভৎস হয়ে ওঠে, সেই বিশাল দুর্ভাগ্যের কোনো সান্ত্বনা নেই। বলা আবশ্যক, আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সংস্কৃতি, তা আজ কঠিন রোগের আক্রমনে বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

- সংস্কৃতির নামে আজ সর্বত্র শিরকের জয়জয়াকার; শিরকই আমাদের সংস্কৃতি-অঙ্গের প্রিয়তম ভূষণ! কোনটা তাওহীদ আর কোনটা তাওহীদ-বিনাশী অংশীবাদ, সেই বোধ পর্যন্ত এখন লুপ্তপ্রায়। গান-কবিতা-নাটক যাই হোক, আমরা বুঝতেই পারছি-না যে, প্রকৃতিমুগ্ধতা আর প্রকৃতিপূজা এক নয়; দেশপ্রেম আর দেশকে মাতৃদেবীরূপে বন্দনা করা এক কথা নয়;

নারীর মূল্য ও মর্যাদা আর নারীকে ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য করে তোলা এক বস্তু নয়। বরং তা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, একেবারেই হারাম।

- আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে এমনভাবে আজ সাজিয়ে নিয়েছি, যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) নন, ইবলিসই আমাদের একমাত্র পথনির্দেশক পরমতম বন্ধু। বড় আফসোস, সারা দেশ জুড়ে দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ছে ভাস্কর্য ও মূর্তি-সংস্কৃতি; অবাধে প্রসার লাভ করছে বাঙ্গালীয়ানার নামে খোল-করতাল শাঁখা-সিঁদুর মঙ্গলদীপ-রাখীবন্ধনের হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি; ক্রমশই প্রবল প্রতাপে বাঙ্গালী মুসলিম মানসকে অধিকার করে নিচ্ছে বাউল-বিশ্বাসপুষ্ট অন্ধকার দেহবাদ, ফকিরিতন্ত্র, মাজারপূজা, পীরপূজার মত গর্হিত জীবনাচার। বড়ই আফসোস, এইসব নিয়েই আমাদের সংস্কৃতি এখন ষোলকলায় বিকশিত।

- রবীন্দ্রনাথ আমাদের সংস্কৃতিনিষ্ঠায় সর্বাধিক প্রাণবন্ত উপাদান। এবং এতটাই অপরিহার্য ও প্রাণবান যে, আমাদের কোনো কোনো বেপরোয়া সংস্কৃতিজীবী সগৌরবে ঘোষণা করেন, 'ঈশ্বরকে' অস্বীকার করা সম্ভব কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নয়। অতএব এই মহাকবির প্রভাব ও তার প্রকৃত ফলাফল সম্পর্কে অল্পবিস্তর কিছু আলোচনা করা জরুরী।

- যে-সকল মুসলিম সন্তান রবীন্দ্রনাথকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন, তারা যত কথাই বলুন, তাদের উদ্দেশ্যে বড় ভয়াবহ। তারা শুধু 'নিষ্পাপ' রবীন্দ্রপ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ নয়, তারা এই ছোট্ট বাংলাদেশে বসবাসরত তাওহিদী মুসলিম উম্মাহর জন্য চিন্তার বিষয়ও বটে। তারা চায় তাওহিদী বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ উৎখাত করে চতুর্বেদী হিন্দু-আধিপত্যকে পুনর্বাসিত করতে। কথাটা অপ্রীতিকর বটে কিন্তু অস্বীকার্য নয়। আমরা রবীন্দ্রবিদ্বেষী নই। আমাদের সৌভাগ্য যে, মুসলিমদের জন্য রবীন্দ্রনাথ ভুলক্রমেও একটি কবিতা কি গান রচনা করেন নি।

সংস্কৃতির জয়-পরাজয়

- চৈত্রের দুপুরে বাঙ্গালী-জননীর হাতের তালপাখার মৃদুমন্দ ব্যজন যেমন সংস্কৃতি, বিসমিল্লাহ বলে খাদ্যগ্রহণ অথবা সুসংবাদ পেলে আলহামদুলিল্লাহ বলাও সংস্কৃতি।

- আসলে যে কোনো কারণেই হোক, আজ সংস্কৃতি মানে নৃত্য-সঙ্গীত-কবিতা-নাটক ইত্যাদি। আর এই সকল বস্তু ও বিষয়ের যারা সমঝদার তারাই সংস্কৃতিবান।
- অসংখ্য অভিভাবকই এখন এই অভিলাষ পোষণ করে যে, তাদের ছেলেমেয়ে সঙ্গীতশিল্পী নট-নটী বা নর্তক-নর্তকীরূপে বিখ্যাত হয়ে উঠুক। এতে এ-ধরনের অভিভাবকেরা শুধু উল্লসিত হয় না, কন্যা কি পুত্রের সাফল্যে তারা তাদের জীবনকে ধন্য ও সার্থক জ্ঞান করে। শুধু খ্যাতি নয়, সংস্কৃতিকর্মীদের হাতে পর্যাপ্ত অর্থাগমও সহজ হয়ে ওঠে। টাকাটা কোন পথে আসছে, কী হারাতে হচ্ছে, সেটা বড় কথা নয়; অনেক সহজে অনেক টাকা-যে হাতে আসছে, এটাই বড় কথা। সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য শেষ বিজয়টি হলো, তথাকথিত নান্দনিকতার নামে সংস্কৃতি তার ভক্ত ও পৃষ্ঠপোষকদের কাছে নিজেকে রীতিমত আরাধ্য বা উপাস্য করে তোলে। এবং এই কারণেই একজন শিল্পী তার গান কি নৃত্য কি অভিনয়কে বিনোদন মনে করে না, মনে করে সাধনা ও তপস্যা।
- সংস্কৃতি এখন আধুনিক মানুষের ধর্মে পরিণত হয়েছে। ধর্ম তার অনুসারীদের নিকট যে আনুগত্য দাবি করে, আধুনিক সংস্কৃতি এখন সেই ধরনের শর্তহীন আনুগত্য পাচ্ছে। উদাহরণত, এমন বহু দুর্ভাগা মুসলিম সন্তান এই সমাজে বিদ্যমান, যারা ইসলাম মানে না, রাসূল (সা.)-এর জীবনাদর্শের প্রতি আগ্রহী নয়, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে রবি ঠাকুরের 'ইবাদত' করে, লালনগীতির মধ্যে ইহকাল পরকালের 'মুক্তি' খুঁজে পায়; এমনকি গাজা-সেবনকেও আধ্যাত্মিক মোক্ষলাভের সহায়ক শক্তি বলে বিবেচনা করে।
- হিন্দু সংস্কৃতির বাহক ভারতের সংস্কৃতিবান গোষ্ঠীরা তাদের সংস্কৃতির পরিচায়ক কত্থক, ধ্রুপদী, ভারতনাট্যম শিখাতে অথবা রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিম দেবার জন্য প্রতিবছর সরকারের বিপুল অর্থব্যয় করে শত শত বাংলাদেশীকে ভারতে নিয়ে যায় তার কারণ কী? কারণ প্রধানত একটাই, বাংলাদেশী মুসলিমদের অন্তর থেকে তাওহিদী চেতনাকে মুছে দিয়ে ভারতপ্রেমের আলপনা এঁকে দেয়া। একেই বলা হয় **brain washing**। অথচ সরকারী খরচে নয় বরং নিজ খরচেও যদি কেউ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যেতে চান তাহলে কি ঘটে? একজন ছাত্রটিকে ভারতবর্ষের অন্য যে-কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ভর্তি ও বেতন

বাবদ দশ গুণ বেশী অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং ছাত্রভিসা পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। এধরনের আর্থিক ও প্রশাসনিক বাধা সৃষ্টির একটাই কারণ, অনেক হারানোর পরেও যেহেতু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো কিছুটা তাওহিদী শিক্ষা ও মুসলিম ঐতিহ্য অবশিষ্ট আছে; অতএব সেখানে পাঠ গ্রহণের পথকে যথাসম্ভব দুর্গম করে রাখা আবশ্যক।

- জাতীয় কি বিজাতীয় সেটা বড় কথা নয়, কথা হলো, সার্বিক বিচারে কোন জিনিস ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক, নাকি উপকারী? ম্যালেরিয়া বহনকারী মশাও বাংলাদেশের একটি আবহমান কালের 'সম্পদ', কিন্তু যে কোন মূল্যে এই সম্পদকে আমরা উৎখাত করতে চাই। কারণ তা স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক। ঠিক এই রকমই, যদি কোনো সংস্কৃতি আমাদের সাহস ও আত্মবিশ্বাসকে দুর্বল করে, আমাদের দেশপ্রেম ও আদর্শবোধকে বিপন্ন কি বিপথগামী করে, আমাদের তাওহিদী বিশ্বাস ও আখিরাতের ভয়কে মুছে দিতে চায়, শিল্প কি নান্দনিকতার নামে জীবনকে দায়িত্বহীন ভোগের দাসত্ব করতে শেখায়, আমাদের কল্‌বকে (আত্মাকে) মৃতে পরিণত করে, সেই সংস্কৃতি জাতীয় হোক বিজাতীয় হোক, অবশ্যই তা বিনা প্রশ্নে পরিত্যাজ্য।

সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

- রবীন্দ্রনাথের অন্য একটি বিখ্যাত গানের উল্লেখ করতে পারি "ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা, তোমাতে বিশ্বময়ী বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা"। এখানে বিশ্বমা হচ্ছে কালিদেবী। জীবনানন্দের একটি বহুপঠিত কবিতা 'আবার আসিব ফিরে'। পুরো কবিতাটিই আমাদের ইসলামি জীবনদর্শনকে মারাত্মকভাবে বিভ্রান্ত করতে চায়। এই কবিতার দুটি পংক্তি ঃ 'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়ি নদীটির তীরে, হয়ত-বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে'। এখানেও হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস সে মানুষ আবার পুর্ণজন্ম হয়ে এই পৃথিবীতে ফিরে আসবে শঙ্খচিল শালিকের বেশে। গানের ও কবিতার এই বিষয়গুলো ইসলামি আকিদার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। এমন কথাও বলে, লালনগীতি বা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুধু উপাদেয় সঙ্গীতমাত্র নয়, রীতিমত ইবাদত-বন্দেগীর বস্তু (নাউযুবিল্লাহ)।

- তথাকথিত সংস্কৃতি আমাদেরকে এমন করুণ-ক্রীড়নকে পরিণত করেছে যে, আমরা এখন মাজারে-দরগায়-বেদীতে-মিনারে শুধু পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ নয়,

পুরো ঈমানটাকেই কুণ্ঠাহীন অনুরাগে বিসর্জন দিয়ে আসছি। আমাদের অন্তর্দেশ ও আত্মচৈতন্য এতটাই তছনছ হয়ে গেছে যে, আমরা এখন প্রায় জরথুস্টবাদী অগ্নিউপাসকে পরিণত হয়েছি। অনেকের যুক্তি, 'মোমবাতি প্রজ্জলন'-এর মধ্যে শিরকের এমন কী আছে, যে-কারণে একে দোষণীয় বিবেচনা করতে হবে? কিন্তু এই প্রশ্নও-তো স্বাভাবিক যে, এর মধ্যে দেশপ্রেমেরই বা কী আছে? অগ্নিশিখার সম্মুখে শ্রদ্ধাবনত হয়ে নিরর্থক দাঁড়িয়ে থাকার নাম যদি শিরক না-হয়, তাহলে প্রাচীন পারসিকরা-যে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডকে প্রদক্ষিণ করতো, তাকেই-বা কোন যুক্তিতে অংশীবাদ বলা যায়? এবং কোনো দেবী-প্রতিমার সামনে ভক্তিভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই-বা কেন শিরক বা পৌত্তলিকতা বলে গণ্য হবে?

বর্ষবরণ ও আত্মঘাতী সাংস্কৃতিপ্রীতি

- আনন্দ খারাপ নয়, কিন্তু শিরক ও অশ্লীলতার সঙ্গে যুক্ত হলে তা খারাপ-তো বটেই, আনন্দ তখন একেবারেই গর্হিত ও হারাম হয়ে যায়। কারো অজানা নয়, পহেলা বৈশাখে ভোর না-হতেই নারী-পুরুষের অবাধ ও উদার মেলামেশার মধ্য দিয়ে রমনায় পান্তা খাওয়ার মহোৎসব (প্রচলিত বাংলায় মচ্ছব) শুরু হয়ে যায়। চারুকলা চত্বরে যুবতীরা তাদের বুকে-পিঠে-গালে উল্কি এঁকে নেবার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে, নানা দিকে নানা রঙের মিছিল শুরু হয়ে যায়। আর মিছিল শুধু মিছিল নয়, ঢোল-বাদ্যসহকারে জন্তু জানোয়ারের মুখোশ পরিহিত উদ্‌ভ্রান্ত নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিয়ে সে-এক অকথ্য দৃশ্য।

- পহেলা বৈশাখ উদযাপন বা নববর্ষ বরণের যে ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া, তার কোনো একটি বিষয়েও আপত্তি নেই, আপত্তি থাকার কোনো কারণও নেই। শঙ্খধ্বনি হোক, পান্তাভাতের নৈবদ্য সাজিয়ে অতিথিরূপী নারায়ণ- সেবা হোক, উল্কি অঙ্কন, চন্দন বা সিন্দুর টিপ পরিধান হোক, নৃত্য সঙ্গীত মৃদঙ্গ করতাল ঢোলবাদ্য, উলুধ্বনি মঙ্গলদীপ, রবীন্দ্রপূজা, প্রকৃতিপূজা যাই-ই হোক, কোনো কিছুতেই অনুমাত্র আপত্তি নেই। বরং আশা করবো, হিন্দু সম্প্রদায় তাদের মতো করে নির্বিঘ্নে আলপনা এঁকে ঘট-সাজিয়ে শঙ্খ বাজিয়ে পহেলা বৈশাখকে নানা আচারে উপাচারে মুখরিত করে তুলুক। এমনকি তাদের কাছে প্রকৃতিপূজা যেহেতু সিদ্ধ; তারা মনে করলে, মঙ্গলদাত্রী বৈশাখী দেবীপ্রতিমা নির্মাণ করে পূজা-অর্চনাও করতে পারে।

ইসলামের আপত্তি শুধু একটি ক্ষেত্রে, এবং তা হলো এই হিন্দু উৎসবে মুসলিম নারীপুরুষের অংশগ্রহণ। কেই যদি নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবী করে তাহলে সে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে পারে না। কারণ এই কাজগুলো ইসলামি আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক।

- ইসলাম একটি স্বতন্ত্র জীবনদর্শন, একটি সর্বতোমুখী হিদায়াত। এখানে সংস্কৃতি আছে কিন্তু সংস্কৃতিপূজার কোনো অস্তিত্ব নেই; অলঙ্ঘনীয় মানবাধিকারের কথা আছে কিন্তু মানবপূজা এখানে হারাম। এবং এখানে এমনসব আনন্দকর্ম পুরোপুরি নিষিদ্ধ, যা যৌনতা, বেহায়াপনা, শিরক ও অশ্লীলতার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে। অতএব পহেলা বৈশাখ হোক, বর্ষবরণ, বর্ষবিদায় কি প্রকৃতিবন্দনা যা-কিছুই হোক, একজন মুসলিম সর্বদা ও সর্বতোভাবে এই শর্তের অধীন যে, তার বক্ষস্থিত তাওহিদী-অভিজ্ঞান যেন এতোটুকু নিষ্প্রভ না হয়, সে যেন কোনোভাবেই শিরকের ফাঁদে জড়িয়ে না পড়ে।

- তথাকথিত সংস্কৃতিপ্রেমীরা বলতে পারে এবং আমরাও তর্কের খাতিরে ধরে নিতে পারি, বর্ষশুরুর প্রাক্কালে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। কারণ, এটা-তো সবারই মনস্কামনা যে, নতুন বছর সবার জন্য কল্যাণ বয়ে আনুক, সবার জীবন শান্তি ও সুখের সৌরভে আমোদিত করে তুলুক। আসলে এখানেই প্রশ্ন এবং প্রশ্নটি জীবনদর্শনের। কোনো মুসলিম কি একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে, নববর্ষ বা বৈশাখের আবাহনের মধ্যে কোন মঙ্গল বা কল্যাণ নিহিত আছে! অসম্ভব! সকল শক্তি, ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ; আমাদের সকল চাওয়া, সকল প্রার্থনা একমাত্র তাঁরই কাছে আমরা পেশ করি। এক্ষেত্রে কোনোরকম ব্যতিক্রম ঘটলে অর্থাৎ অন্য কোথাও অন্য কারো কাছে আমরা আমাদের কোনো আরজু যদি নিবেদন করি, সেটা সুস্পষ্ট শিরক, যে শিরকের অপরাধ আল্লাহপাক কখনোই ক্ষমা করবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। অতএব নববর্ষ উদযাপনের বাহানায় আমাদের পক্ষে মুশরিকী চেতনা উদ্ভুত আনন্দযজ্ঞে শামিল হওয়ার কোনো উপায় নেই।

- নববর্ষকে যদি আমাদের জীবনে ফলবান, গ্লানিমুক্ত ও শান্তিময়রূপে দেখতে চাই, তাহলে সেই প্রার্থনা ইসলাম-সম্মতভাবে আল্লাহপাকের কাছেই পেশ করতে হবে। আসলে শয়তান বড় চতুর। আগে আসতো নানা ধরনের অংশীবাদপুষ্ট ধর্মের আলখাল্লা পরিধান করে; এখন আসে, কখনো

ধর্মনিরপেক্ষতা কখনো উদার আবহমান সংস্কৃতি ও নান্দনিকতার পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে। উদ্দেশ্য একটাই, তাওহিদী উম্মাহকে সত্যভ্রষ্ট করা, পার্থিব ও পারলৌকিক জিন্দিগীর সমূহ সর্বনাশ সাধনের পথ প্রশস্ত করা।

অপসংস্কৃতির কবলে বাংলাদেশ

- ইসলামকে পছন্দ করি না করি, বাংলাদেশ যে নব্বই শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত একটি তাওহিদী বাংলাদেশ, এটা বাস্তব। সংস্কৃতি যদি দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও অস্তিত্বের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়, যদি নব্বই ভাগ মানুষের বিশ্বাস ও চৈতন্যের সাথে বিরোধিতায় লিপ্ত হয়, তাহলে তার নান্দনিক গুণ ও তথাকথিত Aesthetic value যতই থাক বা যতই উচ্চরবে প্রচারিত (ঘোষিত) হোক, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেটা অবশ্যই অপসংস্কৃতি। অপরদিকে, যে সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিচর্চা দেশের সিংহভাগ মানুষের বিশ্বাস, ধর্মানুভূতি ও জীবনদর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক, নিঃসন্দেহে সেটাও অপসংস্কৃতি।
- বহু পতিতা- যে বছরের পর বছর কুৎসিত জীবনযাপন করে চলেছে, তাদেরও পক্ষে যুক্তি আছে। তারা অনেকেই বিশ্বাস করে, তারা যৌনশিল্পী, তাদের দেহ আসলে মন্দির, সেখানে মানবরূপী ঈশ্বর এসে পরমহংসের মত দেহনিঃসৃত তৃপ্তিটুকু শুধু পান করে যান। যদিও অর্থের বিনিময়ে কিন্তু অর্থটা লক্ষ্য নয়; মূল লক্ষ্য ঈশ্বরের সহবাস, দেহকে নৈবেদ্য করে ঈশ্বরের হাতে তুলে দেয়া। কী অদ্ভুত সাদৃশ্য, আমাদের অনেক আধুনিক সংস্কৃতিজীবীরও ধারণা, মানুষ যে বাহবা দেয়, সেটা শুধু বাহবা নয়, সেটা ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদ। আর এই আশীর্বাদ লাভের জন্য যদি বিবসনা হয়ে নানা রূপ দেহভঙ্গি ও যৌন উত্তেজক মদির-মুদ্রায় নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করতে হয়, সেটা পুণ্যকর্ম।
- আল কুরআন ও রাসূল (সা.)-কে উপেক্ষা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে (নাউযুবিল্লাহ) যাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ও লালন ফকির হয়ে ওঠে আরাধ্য দেবতা, যারা মুসলিম উম্মাহর বক্ষদেশ লক্ষ্য করে ক্রমাগত শরবর্ষণে তাওহিদী আমানতকে উৎখাত করতে চায়, তাদের কাছে ভালো কিছু আশা করাই অসমীচীন। শুধু একটাই দুঃখ, বাংলাদেশের এই বর্তমান তরুণ-প্রজন্মের একটি বিরাট অংশ আজ তাদেরই কারণে অশ্লীলতা দেহবাদ ও

অংশীবাদপুষ্ট অপসংস্কৃতির অব্যর্থ শিকার। এই দুরবস্থা ক্রমশই বিস্তৃত ও ঘনীভূত হচ্ছে। এখনই সতর্ক না হলে শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলা কঠিন। অপসংস্কৃতির কবল থেকে আল্লাহ তা'আলা বাংলাদেশকে হিফাজত করুন।

সংস্কৃতি নিয়ে আরো কিছু কথা

- যারা বলেন, 'লা-ইকরাহা ফিদ্দীন' দ্বীনের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তি নেই, তাদের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করা যায়, একথা আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন ভিন্নধর্মীদের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন না করার জন্য। একথার অর্থ আদৌ এ রকম নয় যে, ইসলামও ভালো, ইসলামের বাইরে যা আছে তাও ভালো; অতএব মিলেমিশে একটা উদার জীবনাচার ও সংস্কৃতি গড়ে নিলে আল্লাহর তরফ থেকে আপত্তি নেই (নাউযুবিল্লাহ)। দ্বিতীয়ত, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করবার পর, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল (সা.) যা অনুমোদন করেননি, সেই অননুমোদিত পন্থায় সর্বপ্রেমী বৈষ্ণব রসের উদার সংস্কৃতি রচনা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

- শুধু ১০ই মহররম নয়, রোযা রাখলে আগে-পিছনে মিলিয়ে দুটি বা তিনটি রোযা রাখতে হবে, যাতে ইহুদিদের সাথে মিলে না যায়। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং সূর্য যখন মধ্যগগনে, এই তিন সময়ে সলাত আদায় করা যে নিষিদ্ধ, তারও একমাত্র কারণ, সলাতের ওয়াক্ত যেন কোনো অবস্থাতেই মুশরিক-সূর্যপূজকদের অনুরূপ না হয়। অথচ কী দুর্ভাগ্য, আজ আমরা আমাদের অন্তরের টানে এক অংশীবাদপুষ্ট নিবিড় সাংস্কৃতিক সখ্য ও উদার বেপরোয়া জীবনাচারের মধ্যে আত্মমুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করছি।

- এই দীর্ঘ দেড় সহস্র বৎসরকালে মুসলিম উম্মাহ যেখানে যতবার বিপর্যস্ত হয়েছে, তার অন্যতম মুখ্য কারণ ছিল, কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ ও অসমর্থিত শিল্পচর্চার মধ্যে ডুবে যাওয়া। মোগল সাম্রাজ্যের পতন, অযোধ্যার পতন, মুর্শিদাবাদ কি হায়দরাবাদের পতন ইত্যাদি বহু বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ ছিল শাসকদের কাব্যভক্তি ও সংস্কৃতিবিলাস।

- ইবলিস কী চায়, ইবলিসের অভিপ্রায় কী? উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য একটাই, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের (সা.) প্রকৃষ্ট হিদায়াত থেকে মুসলিমকে উল্টোদিকে ধাবিত করা। তবে এক্ষেত্রে ইবলিসের সর্বাধিক প্রিয় ও

কার্যকরী হাতিয়ার হলো গানবাজনা, নৃত্যগীত ও নাটক-নবেলের সংস্কৃতি। এই পথে ইবলিস যতটা সহজে ধ্বংস ডেকে আনতে পারে, অন্য কোনভাবে ততটা হয় না। এবং এইজন্যই পৃথিবীর অন্য সকল দেশের মত বাংলাদেশের সংস্কৃতি-জগৎও ইবলিসের একটি নির্ভরযোগ্য মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

- তথাকথিত সংস্কৃতিসেবীদের অধিকাংশই কুরআনের কথা ও রসূল (সা.)-এর জীবনাদর্শের কথাকে বড় ভয় পায়। আর এজন্যই আমাদের নান্দনিক জগতে ভালো-মন্দ অনেক কিছু আছে, শুধু আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল (সা.) নেই। শয়তান যেহেতু অন্ধকারের প্রতিভু, শয়তানের নিয়ন্ত্রণাধীন আমাদের সংস্কৃতির একটি বিরাট অংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এজন্যই আমাদের সংস্কৃতিতে ন্যাড়ার ফকির লালন একজন বড়-মাপের 'আউলিয়া', পাগলা কানাই এমনকি অর্ধশিক্ষিত আরজ আলি মাতুব্বরও বিরাট কিছু; আর রবীন্দ্রনাথের-তো কথাই নেই, তিনি আমাদের সংস্কৃতি-রাজ্যের 'অবিসংবাদিত অধীশ্বর'।

- আসলে পুরো মুসলিম উম্মাহর মধ্যেই এমন এক ধরনের তীব্র অন্ধত্ব প্রবল হয়ে উঠেছে, যে কারণে সহজ সরল বিষয়গুলোও মুসলিম আজ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। রসূল (সা.) কি জীবনে একবারও গানবাজনা চর্চার কথা বলেছেন? বলবেন কী করে? তিনি তো এসেছিলেন বাদ্যযন্ত্র উৎখাত করতে (সহীহ বুখারী)। আর ইসলাম-তো পৃথিবীতে গানবাজনা কি নাটক করার জন্য আসে-নি; এসেছে পৃথিবীকে জঞ্জালমুক্ত ও পবিত্র করবার জন্য, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য, এসেছে মানবরূপী ইবলিসদের মোকাবিলায় আল্লাহর একক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। আর এই কাজ পদ্য বা গীতনৃত্য ছবি-আঁকা দিয়ে হয় না; এর জন্য প্রয়োজন সংগ্রাম, প্রয়োজন আল্লাহর দ্বীন-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা বুকে নিয়ে জীবন ও সম্পদ ব্যায় করা।

- যে তেইশ বছর ধরে শত সহস্রবার জিব্রাইল (আ.) আল্লাহর নিকট থেকে ওহি নিয়ে আসলেন, তার কোনো একটি আয়াতেও কি নাচগানের কথা আছে? বরং উল্টোটাই বলা আছে। বলা হয়েছে, কাব্য-কবিতা নিয়ে মশগুল তথাকথিত সংস্কৃতিবিলাসীরা হলো ইবলিসের নিকট থেকে ইলহামপ্রাপ্ত ঘোরতর মিথ্যাবাদী এবং নানা উপত্যকায় ভ্রাম্যমাণ উদভ্রান্ত মুনাফিক; যাদেরকে শুধু পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরাই গুরু বলে মান্য করে (সূরা শুয়ারা ঃ ২২১-২২৬)। আসলে মুসলিমের সংস্কৃতি হলো সকল অশুভ শক্তির

বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক জিহাদের সংস্কৃতি, রসূল (সা.)-কে একমাত্র আদর্শ মেনে জীবন গঠন ও পরিচালনার সংস্কৃতি ।

ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতিই মানবতার একমাত্র উপায়

- সাহিত্য-সংস্কৃতি একান্ত নিজের মত করে গড়ে ওঠে না, উঠতেও পারে না; এটা গড়ে ওঠে কোনো-না কোন ধর্ম বা মতবাদ বা জীবনদর্শনের আশ্রয় ও অবলম্বনে । উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি, ভারতীয় সংস্কৃতির যে-রূপ, তার প্রধান ভিত্তি হলো অংশীবাদ, পৌত্তলিকতা ও প্রকৃতিপূজা, এবং তৎসঙ্গে অবতারবাদ-নির্ভর মানবপূজা। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত-সাহিত্য গড়ে উঠেছে মার্কসীয় দর্শনপুষ্ট সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তিতে। এবং ইয়োরোপীয় কি মার্কিনী সংস্কৃতি আসলে ধনতান্ত্রিক বস্তুবাদী জীবনদর্শনেরই অভিব্যক্তি। এবং আমরা এইকথাও জানি, একদা এই বাংলাদেশে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা যে চর্যাপদ রচনা করেছিলেন, তারও মূল অবলম্বন ছিল বৌদ্ধ-ধর্মদর্শন । এবং পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণব পদাবলী, বাউল গানের যে প্রসার ঘটে, সেসবও ছিল যথাক্রমে বৈষ্ণব ও বাউল ধর্মাশ্রিত । উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব গীতিকবিতা রাধা-কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক অনেকটা মানবিক বটে কিন্তু তার মধ্য দিয়ে মুখ্যত একটা ঐশ্বরিক আবেদন সৃষ্টির প্রেরণা ছিল । এবং একইভাবে বহু-প্রচলিত বাউলগান হলো যৌনতাশ্রয়ী দেহবাদ-নির্ভর একটা 'আধ্যাত্মিক' উপধর্ম ।

- সাহিত্য ও সংস্কৃতি মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধনে কতটা কী ফলপ্রসু ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে ও করে, সে বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে হলে আল কুরআন এবং রসূল (সা.)-এর জীবনাদর্শের নির্ভুল পথনির্দেশনা ছাড়া আমাদের জন্য দ্বিতীয় কোন পথ নেই । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ইন্নাদ্বীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম' তাঁর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন বা ধর্ম হলো ইসলাম (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯) । অর্থাৎ ইসলামের বাইরে অন্য যে সকল ধর্ম, তার কোনোটাই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় । অতএব এই সকল প্রত্যাখ্যাত ধর্ম ও মতবাদকে আশ্রয় করে যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, নিশ্চয়ই তারও কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। আর এই অগ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি বা সাহিত্য যে মানবকল্যাণের প্রশ্নে আদৌ কোন ভূমিকা রাখতে সক্ষম নয়, বরং মানবতার অপকর্ম সাধনই তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, এটা অস্বীকার করার কোন হেতু নেই, কোন যুক্তিও নেই ।

- এখন প্রশ্ন হলো, ইসলাম কি তাহলে সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চাকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে? ইসলামে কাব্য কবিতার স্থান কি একেবারেই নেই? এই বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যার অবকাশ নেই, কাব্য কবিতার স্থান ইসলামে অবশ্যই আছে তবে তা যেন কোনভানেই ইসলামি আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা ও বর্তমান পরিপেক্ষিত

- ইসলামি শিক্ষার অর্থ শুধু নিরঙ্কুশভাবে পরকালমুখী শিক্ষা নয়; ইহকাল পরকাল উভয়কে নিয়ে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল (সা.) কর্তৃক পেশকৃত হিদায়াতকে সামনে রেখে যে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ শিক্ষা, সেটাই ইসলামি শিক্ষা। এখানে আত্মিক ও নৈতিক মানসকাঠামো সবল করে তুলবার কার্যক্রম যেমন অপরিহার্য, একই সঙ্গে ইহজাগতিক বৈষয়িক যোগ্যতালাভের বিষয়টিও সমান অপরিহার্য। এটা কোন আলিম-উলামার কথা নয়, পীর-মুর্শিদের কথা নয়; এই কথা স্বয়ং আল্লাহর কথা, আল্লাহর রসূলের (সা.) কথা, ইসলামের কথা।

ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য পূর্ণাঙ্গ মানুষ পূর্ণাঙ্গ সমাজ

- আসলে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা যা বলে বা বলতে চায়, সেটা নতুন কিছু নয়। আল কুরআন এবং রসূল (সা.)-এর জীবনাদর্শ থেকে প্রাপ্ত যে সর্বতোমুখী হিদায়াত, পূর্ণাঙ্গ মানুষ ও পূর্ণাঙ্গ সমাজ বিনির্মাণের যে পথ ও পাথেয়, ইসলামি শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা সেই কথাই বলে। ইসলাম যেমন একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান, ইসলাম একটি নির্ভুল জীবনদর্শনও বটে। আর এই জীবনদর্শন তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জীবনদর্শনই ইসলামের প্রাণ। এ থেকে অন্যথা হলে, এই জীবনদর্শনের ব্যতিক্রম ঘটলে, ইসলাম আর ইসলাম থাকে না, মুসলিমও আর মুসলিম থাকে না। ইবলিস নানাভাবে প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত করতেই পারে, এবং প্ররোচিত করাই তার কাজ। বিশেষ করে শিক্ষাব্যবস্থার অন্তরে-বাইরে যে প্রশস্ত অঙ্গন, সেই অঙ্গন ইবলিসদের একটি বড় প্রিয় ও জরুরী কর্মক্ষেত্র। কারণ এখান থেকেই পর্যায়ক্রমে বেরিয়ে আসে দেশ জাতি ও সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় জনস্রোত। অতএব ইবলিস ও তার

সহযোগীদের কাজই হলো এই জনস্রোতকে কলুষিত ও বিপথগামী করা, নৈতিকভাবে পঙ্গু অক্ষম অপদার্থে পরিণত করা। বলা যায়, এই কাজে তার সাফল্য আশাতীতভাবে প্রমাণিতও হয়েছে, যে কারণে দেশব্যাপী আজ এই সমূহ দুরবস্থা।

- একজন প্রকৃত মুসলিম কোনো অবস্থাতেই জীবনে শিরককে গ্রহণ করতে পারে না, সহস্র প্রলোভনেও পৌত্তলিকতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে না, সংস্কৃতির নামে তাগুতের (আল্লাহ বিরোধী শক্তি) ইবাদতে মগ্ন হতে পারে না। তাই খাঁটি মুসলিমের পক্ষে ভাষা ও সংস্কৃতির নামে মঙ্গলপ্রদীপ জ্বেলে আরতি করা, নিষিদ্ধ-পুরুষের হাতে সিঁদুর-পরিধান, নগ্ন-পৃষ্ঠদেশে উল্কি অঙ্কন, ভাইফোঁটা ইত্যাদিকে মেনে নেয়া সম্ভব নয় এবং এসব কাজকে ঈমান আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক ভাবাই ঈমানের পরিচয়।

ভাষা নিয়ে ভাবনা

- বার বার ব্যবহৃত হওয়ার কারণে অসংখ্য শব্দ ও শব্দবন্ধ এখন অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে গেছে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে। অর্থাৎ বাংলাভাষার একটি বিরাট অংশের উপর হিন্দু মানসতার দখলিস্বত্ব পাকাপাকিভাবে কায়েম হয়ে গেছে। এবং অনেক হিন্দু যে বাংলাভাষাকে একমাত্র তাদেরই ভাষা বলে মনে করে।
- কিছু উদাহরণ পেশ করলেই আশা করি বিষয়টি পরিষ্কার হবে। 'সারদামঙ্গল' 'অন্নদামঙ্গল' 'মঙ্গলঘট' 'মঙ্গলপ্রদীপ' 'মঙ্গলাচার' 'মঙ্গলগীত' ইত্যাতি লিখতে লিখতে 'মঙ্গল' শব্দটিই এমন হয়েছে যে, 'মঙ্গলবার্তা' বা 'তোমার মঙ্গল হোক' এসবের মধ্যেও একটা হিন্দুয়ানী গন্ধ জেগে ওঠে। এভাবে 'অঞ্জলি' 'চরণ' 'প্রণাম' 'ত্রাতা' 'আরাধ্য' 'উপাসনা' 'সুপ্রভাত' 'স্বর্গাদপি' 'পিতৃদেব' 'পূজ্যপাদ' 'কীর্তন' 'লীলা' 'বিসর্জন' 'জল' 'প্রণাম' ইত্যাদি কতো যে শব্দ একান্তভাবে হিন্দুদের হয়ে গেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই।
- মুসলিম চেতনা ও বিশ্বাসের সংগে সাংঘর্ষিক যে সকল শব্দ ও উপমা 'দেবভাষা' সংস্কৃত ও অন্য উৎস থেকে আহৃত, সেই ধরনের শব্দাবলীর অনুচিত ও অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার বর্জন করতে হবে। উদাহরণত, যেখানে স্বাভাবিকভাবেই 'জান্নাত' 'জাহান্নাম' ব্যবহৃত হওয়ার কথা, সেখানে 'নরক'

‘স্বর্গলোক’ ‘অমরাবতী’ ব্যবহারের যৌক্তিকতা কোথায়? ‘ইন্তিকাল’ এর বদলে ‘পরলোকগমন’ ‘মরহুম’-এর স্থলে ‘প্রয়াত’ লেখা বা বলার মধ্যে সত্যিই কি কোনো যৌক্তিকতা আছে?

আমার দেশ, আমার স্বাধীনতা

- জন্মের পর থেকে আমাদের প্রিয় দেশটির স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে যতো কথা হয়েছে, কাজের কাজ তার এক-সহস্রাংশও হয়েছে কিনা সন্দেহ। মিল-মহব্বতহীন কলহপ্রিয় পরিবারে যেমন সুখ-শান্তি ও উন্নতি ধরা দেয় না, আশাও করা যায় না; আমাদের দেশ ও জাতির ললাটেও এই একই দুর্ভাগ্যের লাঞ্ছনা। ঝগড়াই থামছে না, সুখ ও স্বচ্ছলতা আসবে কোথা থেকে? অথচ এই আত্মবিনাশী ঝগড়ার অবসান হওয়া প্রয়োজন, অন্যথায় স্বাধীনতার অর্থ ও অস্তিত্ব দুটোই ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়ে যেতে পারে।

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা

- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় এক বুদ্ধিজিবী বলেন, “হিজাব পরে ভণ্ডামি করলে চলবে না। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্য নিজে আগে পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক হতে হবে। মাথায় পাগড়ি পরে আমরা একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ করিনি” অর্থাৎ এই বক্তা মহোদয়ের বহুমূল্য বিবেচনায় মুসলিমত্ব পুরোপুরি পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আদৌ অসাম্প্রদায়িক হওয়া যায় না। আসলে ধর্মনিরপেক্ষতা হলো, Green Snake in Green grass, সবুজ ঘাসে হরিৎবর্ণ বিষধর সরিসৃপ। আর এই সরীসৃপটির কাজই হলো, যে কোন উপায়ে ইসলাম ও মুসলিমকে দংশন করা। ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে ৭ম পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

মিউজিকের (Music) কুপ্রভাব

গত কয়েক বছরে Music-এর (নাচ-গানের) চর্চা অকল্পনীয় মাত্রায় বেড়ে গেছে। দেশে যেখানে শিক্ষা-গবেষণা ও সুনাগরিক তৈরিতে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি

নেই, পর্যাপ্ত বিনিয়োগ নেই, সেখানে চরিত্রবিধ্বংসী নাচ-গানের পেছনে অনুদান বা বিনিয়োগ তথা আগ্রহের অন্ত নেই। যেখানে রোজই চিকিৎসার অর্থ না পেয়ে মৃত্যুর জন্য প্রহরগোনা অসহায় মানুষের করুণ মুখ পত্রিকায় ছাপা হয় সেখানে বহুজাতিক কোম্পানি ও বড় বড় ব্যবসায়িক ইন্ডাস্ট্রিগুলো তাদের উপার্জিত অর্থের অনেকটাই ঢালে নৃত্য ও সঙ্গীতের পেছনে! এখনো যেদেশে বিরাটসংখ্যক মানুষের বাস দারিদ্র্যসীমার নিচে, আজো যারা পেটের আগুন নেভাতে গিয়ে নিজের ঈমান পর্যন্ত বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয়, সেদেশেরই একশ্রেণীর নাগরিক নির্দ্বিধায় পঞ্চাশ হাজার টাকায় কেনে এক সন্ধ্যার কনসার্টের টিকেট! যেখানে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়, সেখানে আবার অনেক কিন্ডারগার্টেনে নিষ্পাপ শিশুদের নৃত্য ও সঙ্গীত শেখা বাধ্যতামূলক! আমরা যে আজ নাচ-গানে কতটা মেতেছি তা প্রমাণে বোধ হয় আর কিছু বলার দরকার নেই। তারপরও খানেকটা ইঙ্গিত দেয়া যাক।

আসলে বাঙের ছাতার মতো যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা টিভি চ্যানেলগুলোই নিজেদের জনপ্রিয়তা বাড়াতে নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে নেমেছে মুসলিম সমাজকে গানে মাতাল বানাতে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে নীতি ও আদর্শ বিবর্জিত ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলো। 'ক্লোজ আপ নাম্বার ওয়ান', 'গাও বাংলাদেশ গাও', 'ক্ষুদে গানরাজ', 'নির্মাণশিল্পীদের গান', গার্মেন্ট শ্রমিকদের গান', 'শাহরুখ খান লাইভ ইন কনসার্ট', 'ডেসটিনি ট্রাইনেশন বিগ শো' ইত্যাদি সব শিরোনামের আড়ালেই রয়েছে এ দুই শ্রেণীর বস্তুগত উদ্দেশ্য।

মিডিয়ার অকল্পনীয় উন্নতির সুবাদে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীই মাতাল আজ এসব আয়োজনকে ঘিরে। দুঃখজনক সত্য হলো এসবে শুধু তরুণ প্রজন্মই মেতে নেই, মেতে আছেন একশ্রেণীর অপরিণামদর্শী অভিভাবক মহলও। নাচ-গান শেখানোর পেছনে নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থ যদি তারা না ঢালেন, তবে তো নৃত্য-সঙ্গীতের স্কুলগুলো এত রমরমা ব্যবসা করতে পারে না। ইদানীং বিশ্বে অনেক কিছু নিয়েই জরিপ চালানো হয়। নাচ-গানে বিনিয়োগ-আত্মনিয়োগ নিয়ে যদি কোনো জরিপ পরিচালিত হয় তবে বাংলাদেশের মতো একটি গরিব দেশের নাম যে ওই তালিকার অন্যতম শীর্ষস্থানে থাকবে তাতে সন্দেহের কিছু নেই।

এতসব আয়োজন ও আয়োজকদের বদান্যতায় এ জাতি এতটাই মেতেছে, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জর এ জাতি এতটা মাতাল হয়েছে যে ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষ কোনো শ্রেণীর মানুষই গানের জোয়ারে গা না ভাসিয়ে বসে থাকছে না। আর সে জোয়ারেই ভেসে যাচ্ছে তরুণ প্রজন্মের

নীতি-আদর্শ ও কাম্য সচ্চরিত্র। যে ইভটিজিং ও যৌন অপরাধের ব্যাপক বৃদ্ধিতে এ দেশের চিরসবুজ শান্তির নিবাসগুলোতে জ্বলছে অশান্তির আগুন, তার অনেকখানি দায় এসব নাচ-গানকেন্দ্রিক আয়োজনের। অবৈধ ভালোবাসা আর জীবন ভোগের আহ্বানে সদা সরব এসব গান কাউকে স্বস্তি দিচ্ছে না। বরং তরুণ প্রজন্মের হৃদয়ে পাপের আগুনে ঘি ঢেলে দিচ্ছে।

এমন কোনো স্থান নেই যেখানে গেলে গানের আযাব থেকে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ মেলে। ঘরে বলেন বা বাইরে, পথে বলেন কিংবা যানবাহনে সর্বত্র ওই কানে অগ্নিবর্ষণকারী গানের আওয়াজ। বাসায় ঘুমিয়ে, পড়াশোনা করে এমনকি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে গিয়েও নিস্তার নেই এই গানের অশ্রাব্য আওয়াজ থেকে। ঘর থেকে বের হলেন তো সেরেছে! কোথায় যাবেন? দোকানে? সেখানেও কিন্তু গানের উপকরণের অভাব নেই। হেঁটে পথ পাড়ি দেবেন? সেখানেও দেখবেন মোবাইলে সজোরে গান শুনতে শুনতে কেউ না কেউ পথ চলছে। আর বাস বা যানবাহনের কথা তো বলাই বাহুল্য। বড় পরিতাপের বিষয় হলো একমাত্র নিরাপদ স্থান আল্লাহর ঘর মসজিদেও এই অভিশপ্ত গানের আওয়াজ ইদানীং কানে আসছে। অসচেতন কিছু মুসল্লী তাদের মোবাইলের রিংটোন হিসেবে গান ব্যবহার করায় এমনটি হচ্ছে। একজন মুসল্লী কিভাবে নিজের নিত্যসঙ্গী এই মোবাইল ফোনের রিংটোন হিসাবে গান পছন্দ করেন, তা কিছুতেই বোধগম্য নয়!

কেবল সংবাদ শোনা কিংবা নিছক ক্রিকেট খেলা দেখার অজুহাতে যারা টিভি দেখেন, তারাও আজ বিপদে আছেন। সংবাদের ফাঁকে বিজ্ঞাপনগুলোতে নাচ-গানের এমন দৃষ্টিকটু অনুপ্রবেশ থাকে যা তাদের মতো 'স্বল্পপুঁজির' ঈমানদারদেরও টিভির সামনে বসতে দ্বিধান্বিত করে।

আসলে নাচ-গানের ক্ষতিকারক দিক এত বেশি যে তা নাজায়েয হওয়ার জন্য আলাদা কোনো প্রমাণের দরকার পড়ে না। তদুপরি মহান আল্লাহ ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু ভাষ্য থেকে তা হারাম হওয়া প্রমাণিত। যেমন : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

‘আর মানুষের মধ্য থেকে কেউ কেউ না জেনে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বাজে কথা খরিদ করে, আর তারা ঐগুলোকে হাসি-ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করে; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।’ (সূরা লুকমান ঃ ৬-৭)

গান-গায়িকা এবং এর ব্যবসা ও চর্চাকে হারাম আখ্যায়িত করে রসূল (সা.) বলেন,

لاَ تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلاَ تَشْتَرُوهُنَّ وَلاَ تُعَلِّمُوهُنَّ وَلاَ خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ

‘তোমরা গায়িকা (দাসী) কেনাবেচা করো না এবং তাদেরকে গান শিক্ষা দিও না। আর এসবের ব্যবসায় কোনো কল্যাণও নেই। জেনে রেখ, এ থেকে প্রাপ্ত মূল্য হারাম।’ (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

অন্যত্র রসূল (সা.) বলেন,

لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَتُضْرَبُ عَلَى رُءُوسِهِمْ الْمَعَازِفُ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ

‘আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে। আর তাদের মাথার ওপর বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা নারীদের গান বাজতে থাকবে। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেবেন। এবং তাদের মধ্যে অনেককে শূকর ও বাঁদর বানিয়ে দেবেন।’ (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

রসূল (সা.) আরও বলেন, *‘আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল সাব্যস্ত করবে।’* (সহীহ বুখারী)

আরেক জায়গায় তিনি বলেন, *‘আল্লাহ তা‘আলা আমাকে মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন এবং বাদ্যযন্ত্র, ক্রুশ ও জাহেলি প্রথা অবলুপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।’ (মুসনাদ আহমদ, বায়হাকী)*

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'পানি যেমন (ভূমিতে) তৃণলতা উৎপন্ন করে তেমনি গান মানুষের অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে।' (বায়হাকী)

অথচ সবাই জানেন বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে মাদক ও পাপাসক্তির ক্রমবিস্তার প্রায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। হাজার প্রচারণা ও বিজ্ঞাপনেও নেশার ছোবল থেকে এদের রক্ষা করা যাচ্ছে না। এদের হাতেই রোজ খুন-ধর্ষণসহ ইত্যাকার নানা অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে। এসব নাচ-গানে ডুবে তারা মানবজীবনের মূল লক্ষ্য হারিয়ে হতাশার রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। আর তাই দেখা যায় তথাকথিত উন্নত দেশগুলোতেই আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি।

আসলে পরকালের ভাবনাই মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের ভেতরে সুপ্রবৃত্তি ও সদগুণাবলী জাগিয়ে তোলে। আর নাচ-গানের মূল সাফল্যই এখানে যে তা আখিরাত ভাবনাকে একেবারে ভুলিয়ে দেয়। মানুষের সুকুমার বৃত্তির ওপর পর্দা ফেলে ক্ষণিকের বস্তুতে মজে রাখে।

সাহাবী ও তাবেয়ীদের ভাষ্য অনুযায়ী গান ও বাদ্যযন্ত্র বহু গুনাহের সমষ্টি। যেমন : ১) নিফাক বা মুনাফিকির উৎস ২) ব্যভিচারে উৎসাহদানকারী ৩) মস্তিষ্কের ওপর আবরণ ৪) কুরআনের প্রতি অনীহা সৃষ্টিকারী ৫) আখিরাতের চিন্তা নির্মূলকারী ৬) গুনাহের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিকারী।

আজ বড্ড প্রয়োজন তাই এ নাচ-গানের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা। মসজিদ, মাহফিলে, আলোচনার টেবিলে এবং সব ধরনের মিডিয়াতে এ ব্যাপারে সর্বশ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এ জাতির অস্তিত্ব, সমৃদ্ধি ও মঙ্গলের স্বার্থেই তা জরুরী। হ্যাঁ, নাচ-গান তথা অসুস্থ বিনোদনের প্রতি মানুষকে নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি সুস্থ বিনোদনের দিকেও পথনির্দেশ করতে হবে। বিনোদন মাধ্যমের উন্নতির যুগে মানুষের জন্য কুরআন-হাদীসের আলোচনা, হামদ-নাত, ইসলামি সঙ্গীতও সহজলভ্য করতে হবে। এ জন্য দরকার এসব কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করা। এসবের সঙ্গে জড়িতদের বুদ্ধি-পরামর্শ ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা। কারণ, মানুষকে উত্তম বিকল্প না দেয়া পর্যন্ত মানুষ কোনোদিন মন্দ থেকে বিরত থাকবে না।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে গান-বাদ্যের ফিতনা থেকে দূরে থাকার এবং এসব বন্ধে কাজ করার তাওফীক দিন।

পহেলা বৈশাখ ও নিউইয়ার উদযাপন করার বিধান

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"তোমরা অন্ধকার রাতের ঘনঘটার ন্যায় ফিতনার পূর্বে দ্রুত আমল কর, [যখন] ব্যক্তি ভোর করবে মুমিন অবস্থায়, সন্ধ্যা করবে কাফির অবস্থায়; অথবা সন্ধ্যা করবে মুমিন অবস্থায়, ভোর করবে কাফির অবস্থায়। মানুষ তার দ্বীনকে বিক্রি করে দিবে দুনিয়ার সামান্য বিনিময়ে"। (সহীহ মুসলিম)

আমরা আজ সে ফিতনার অন্ধকারে বাস করছি। আমাদের চারপাশে ঘোর অন্ধকার : মূর্খতার অন্ধকার, কুসংস্কারের অন্ধকার, বিদ'আতের অন্ধকার, শিরকের অন্ধকার। সঠিক পথ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বিশেষ করে ইসলামবিরোধী সংস্কৃতি আমাদের গ্রাস করে রেখেছে। আমরা তাতে গভীরভাবে মগ্ন হয়ে পড়েছি। নিজেদের দ্বীন ও আদর্শের পরিবর্তে বিধর্মীদের কালচার ও তাদের আবিস্কৃত উৎসব ও পালা পার্বণ নিয়ে মেতে আছি। এটা হলো সেই ফিতনা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার আশঙ্কা তিনি করেছেন এবং যা থেকে তিনি উম্মতকে বারবার সতর্ক করেছেন। আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের রাস্তা অনুসরণ করবে বিঘতে বিঘতে ও হাতে হাতে। তারা যদি গুঁইসাপের গর্তে ঢুকে তোমরা অবশ্যই তাদের অনুসরণ করবে। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল, ইহুদি ও খৃষ্টান? তিনি বললেন : তবে কে"? ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে ও গুঁইসাপের গর্তের উদাহরণ পেশ করার অর্থ কঠিনভাবে তাদের অনুসরণ করা। এ অনুসরণ অর্থ কুফরী নয়, বরং পাপাচার ও ইসলামের বিরোধিতায় তাদের অনুকরণ করা উদ্দেশ্য। এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট মুজিজা, তিনি যার সংবাদ দিয়েছেন আমরা আজ তা চাক্ষুষ দেখছি"।

ইব্‌ন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন ঃ "আমাদের পূর্ববর্তী কিতাবীদের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ শরীয়তে নিষিদ্ধ কর্ম সম্পর্কে সংঘটিত হওয়ার পূর্বে সংবাদ দেয়ার অর্থ আমাদেরকে তাদের কথা ও কর্মের সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করা।

কোন মুমিনের উদ্দেশ্য এতে ভালো হলেও বাহ্যিকভাবে তাদের মিল প্রকৃত অর্থে তাদের কর্ম হিসেবে গণ্য হবে"।

মুনাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন ঃ "এ সংবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মুজিজা। আজ তার উম্মতের বড় এক গোষ্ঠী কৃষ্টি-কালচার, যানবাহন, পোশাক-পরিচ্ছদ ও যুদ্ধ ইত্যাদির নীতিতে পারস্যের অনুসরণ করছে। আবার ইহুদি-খৃস্টানদের আনুগত্য করছে মসজিদ সজ্জিত করা, কবরকে অধিক সম্মান করা, যার ফলে মূর্খরা তার ইবাদতে মগ্ন হয়েছে, ঘুষ গ্রহণ করা, দুর্বলদের শাস্তি দেয়া ও সবলদের ক্ষমা করা, জুমার দিন কর্ম ত্যাগ করে ছুটি কাটানো ইত্যাদি বিষয়ে"।

এ যুগে তাদের অন্ধানুকরণ সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বিশেষ করে পার্থিব শৌর্য-বীর্য ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে তারা অনেক মুসলিমের জন্য একেবারে ফিতনায় পরিণত হয়েছে। ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ঘরে ঘরে নিমিষে পৌঁছে যাচ্ছে তাদের আচার-অনুষ্ঠান। তারা যাই করে মুসলিমদের একাংশ অন্ধভাবে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তাদের উৎসব, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো শুধু উপভোগই করেনা, বরং তাতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় এবং আনন্দ করে। এদের কার্যকলাপ দেখে মনে হয় এযেন মুসলিমদেরই ঐতিহ্য ও উৎসব। কি নববর্ষ, মৃত্যু বার্ষিকী, জন্ম বার্ষিকী, বিবাহ বার্ষিকী, বাবা দিবস, মা দিবস, কোন কিছুতেই এরা লজ্জা বা কুণ্ঠাবোধ করে না। মনোভাব এরকম যে উন্নত জাতি (কাফির/মুশরিক) এগুলো পালন করছে তাই আমরাও করছি, ফলে আমাদেরও উন্নতি হবে। ভালো-মন্দ, বৈধ-অবৈধ ও কুফর-শিরক ভেবে দেখার সময় নেই। এগুলো করে তারা দ্বীন থেকে দূরে সরে গেছে, ভুলে গেছে ইসলামি আদর্শ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী।

ইব্ন তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন ঃ "আল্লাহর কিতাব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত, খিলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ ও সকল আলিম একমত যে, মুশরিকদের বিরোধিতা করতে হবে এবং তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা যাবে না"। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "যে কোন কওমের সাথে সামঞ্জস্য রাখল, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত"।

ইব্নুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন ঃ "এর রহস্য বাহ্যিক সাদৃশ্য মানুষকে নিয়ত ও আমলের সাদৃশ্যের দিকে ধাবিত করে"। তিনি আরো বলেন: "কিতাবী ও অন্য কাফিরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে একাধিক জায়গায় নিষেধাজ্ঞা

এসেছে, কারণ বাহ্যিক সামঞ্জস্য আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যের দিকে ধাবিত করে, যখন আদর্শের সাথে আদর্শ মিলে যায়, তখন অন্তরের সাথে অন্তর মিলে যায়"।

নববর্ষ উদযাপন করা হারাম কেন?

বাংলা নববর্ষ 'পহেলা বৈশাখ', ইংরেজি নববর্ষ 'থার্টিফাস্ট নাইট' কিংবা হিজরি নববর্ষ পালন করা হারাম। ইব্‌ন কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "কোন মুসলিমের সুযোগ নেই কাফিরদের সামঞ্জস্য গ্রহণ করা, না তাদের ধর্মীয় উৎসবে, না মৌসুমি উৎসবে, না তাদের কোন ইবাদতে। কারণ আল্লাহ তাআলা এ উম্মতকে সর্বশেষ নবী দ্বারা সম্মানিত করেছেন, যাকে পরিপূর্ণ ও সর্বব্যাপী দ্বীন দেয়া হয়েছে। যদি মূসা ইব্‌ন ইমরান জীবিত থাকতেন, যার উপর তাওরাত নাযিল হয়েছে; কিংবা ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম জীবিত থাকতেন, যার উপর ইঞ্জিল নাযিল হয়েছে; তারাও ইসলামের অনুসারী হত। তারাসহ সকল নবী থাকলেও কারো পক্ষে পরিপূর্ণ ও সম্মানিত শরীয়তের বাইরে যাওয়ার সুযোগ থাকত না। অতএব মহান নবীর আদর্শ ত্যাগ করে আমাদের পক্ষে কীভাবে সম্ভব এমন জাতির অনুসরণ করা, যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট, মানুষকে পথ ভ্রষ্টকারী ও সঠিক দ্বীন থেকে বিচ্যুত। তারা বিকৃতি, পরিবর্তন ও অপব্যাখ্যা করে আসমানী ওহির কোন বৈশিষ্ট্য তাদের দ্বীনে অবশিষ্ট রাখেনি। দ্বিতীয়ত তাদের ধর্ম রহিত, রহিত ধর্মের অনুসরণ করা হারাম, তার উপর যত আমল করা হোক আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। তাদের ধর্ম ও মানব রচিত ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ যাকে চান সঠিক পথের সন্ধান দান করেন"।

নববর্ষ উদযাপন করে আমরা অন্যধর্মের অনুসরণ করতে পারি না। এসব তাদের বানানো উৎসব ও কুসংস্কার।

আমরা বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব অনুষ্ঠান পালন করি তার অধিকাংশ ইহুদি, খৃস্টান ও মুশরিকদের তৈরি। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আমরা আকীকা ত্যাগ করে খাতনার সময় ঘটা করে অনুষ্ঠান করি। খাতনা করা সুন্নত, এতে কোন অনুষ্ঠান নেই, তাতে আমরা অনুষ্ঠান করি, এদিকে আকীকা দেয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ, অথচ আমরা তা ত্যাগ করছি। আমরা কি এতটাই নির্বোধ বনে গেলাম! আমরা প্রতিদিন কমপক্ষে সতেরো বার সূরা ফাতেহা পাঠ করে সিরাতে মুস্তাকিমের প্রার্থনা করি, বাস্তবে আমরা যা ত্যাগ করছি, অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ ও সুন্নত। কমপক্ষে সতেরো বার অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের রাস্তা থেকে পানাহ চাই, অথচ বাস্তবে আমরা তাদের অনুসরণ করছি!

মুসলিমের একমাত্র উৎসব ঃ ঈদ

আমাদের মুসলিমদেরকে ইসলামে স্বীকৃত উৎসব ঈদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদের উৎসব ঈদ শুধু একটি উৎসবই নয়, বরং একটি ইবাদতও, যার দ্বারা আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করি। এ ঈদের সংখ্যা তিনটি, চতুর্থ কোন ঈদ নেই। জুমা, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আদহা। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

"নিশ্চয় জুমার দিন ঈদের দিন, অতএব তোমাদের ঈদের দিনকে তোমরা সিয়ামের দিন বানিয়ো না, তবে তার পূর্বে কিংবা পরে যদি সিয়াম রাখ, তাহলে পার"। (সহীহ মুসলিম)

আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করলেন, তখন তাদের দু'টি দিন ছিল, যেখানে তারা খেলা-ধুলা করত। তিনি বললেন : এ দু'টি দিন কী? তারা বলল: আমরা এতে জাহিলি যুগে খেলা-ধুলা করতাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম দু'টি দিন দিয়েছেন: ঈদুল আদহা ও ঈদুল ফিতর"।

ইব্ন তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন : এ হাদীস প্রমাণ করে যে কাফিরদের উৎসব পালন করা হারাম। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের জাহিলি দুই ঈদের উপর বহাল রাখেননি। রীতি মোতাবেক তাতে খেলা-ধুলার অনুমতি দেননি। তিনি বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। এর দাবি পূর্বের আমল ত্যাগ করা। কারণ বদল করার পর উভয় বস্তুকে জমা করা যায় না। বদল শব্দের অর্থ একটি ত্যাগ করে অপরটি গ্রহণ করা। অতএব কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় ইহুদি, খৃস্টান ও মুশরিকদের উৎসব পালন করা, যেমন নববর্ষ ও অন্যান্য উৎসবসমূহ।

রহমানের বান্দারা মুশরিকদের উৎসবে যোগ দেয় না

সূরা ফুরকানে আল্লাহ তাআলা বিশেষ বান্দাদের গুণাবলী উল্লেখ করেছেন, যাদেরকে তিনি রহমানের বান্দা বলে সম্বোধন করেছেন। তাদের একটি বিশেষ গুণ, তারা কখনো কাফিরদের উৎসবে যোগ দেয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِيۡنَ لَا يَشۡهَدُوۡنَ الزُّوۡرَ ۙ وَ اِذَا مَرُّوۡا بِاللَّغۡوِ مَرُّوۡا كِرَامًا

"যখন তারা অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হয় তখন স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে" । (সূরা ফুরকান ঃ ৭২)

তাবেয়ি মুহাম্মাদ ইব্‌ন সিরিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন: (ٱلزُّورَ)অর্থ খৃস্টানদের ঈদ, মুজাহিদ, রাবি ইব্‌ন আনাস ও দাহহাক রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ বলেন: (ٱلزُّورَ)অর্থ মুশরিকদের ঈদ । ইকরিমা রাহিমাহুল্লাহ বলেন : (ٱلزُّورَ)অর্থ "জাহিলি যুগে প্রচলিত তাদের একটি খেলনা" । ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন:

অতএব এখানে আল্লাহ কাফিরদের ঈদ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন এবং বলেছেন রহমানের বান্দারা সেখানে হাজির হয় না । যখন তাদের ঈদ ও উৎসবসমূহ দেখা ও সেখানে উপস্থিত হওয়া সমীচীন নয়, তখন তাদের সাথে অংশ গ্রহণ করা ও একাত্মতা পোষণ করা কত বড় জঘন্য অপরাধ সহজেই অনুমেয় ।

আল্লাহ পরবর্তীতে বলেছেন: وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغۡوِ مَرُّواْ كِرَامٗا "এবং যখন তারা অনর্থক কথা-কর্মের পাশ দিয়ে চলে তখন সসম্মানে চলে যায়" । অর্থাৎ তারা সেখানে উপস্থিত হয় না, যদি কখনো ঘটনাক্রমে তার পাশ দিয়ে যেতে হয়, তারা চলে যায়, কিন্তু তার কোন বিষয় দ্বারা নিজেদেরকে কলুষিত করে না । এ জন্য আল্লাহ বলেছেন: مَرُّواْ كِرَامٗا সম্মানের সাথে চলে যায় । একদা ইব্‌ন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু গানবাদ্যের পাশ দিয়ে সেগুলোকে উপেক্ষা করে অতিক্রম করেন । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "ইব্‌ন মাসউদ সকাল ও সন্ধ্যা করেছে সম্মানের সাথে" ।

শুভ নববর্ষ বলা

আমরা চিন্তা করেছি কিংবা ভেবে দেখেছি যে, নববর্ষের শুরুতে যখন বলি, যাকেই বলি: "শুভ নববর্ষ", কিংবা "হ্যাপি নিউ ইয়ার"? কার অনুসরণ করছি, কাকে বলছি ও কী বলছি? নিশ্চয় আমরা চিন্তা করিনি, চিন্তা করলে কখনো আমাদের বিবেক সায় দিত না কুফরী কথার পক্ষে, কিংবা তাদের শুভেচ্ছা জানানোর প্রতি, যারা ঈসা আলাইহিস সালামকে বলেছে স্বয়ং আল্লাহ, কখনো বলেছে আল্লাহর পুত্র, কখনো বলেছে তিনজনের তৃতীয় সত্বা ।

যারা আল্লাহর সাথে শরীক করেছে ও তাঁর অসন্তোষের পাত্রে পরিণত হয়েছে, তাদের জন্য আল্লাহ জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন, আমরা কিভাবে তাদেরকে

শুভেচ্ছা জানাই, কিভাবে তাদের অনুসরণ করি এবং বলি নববর্ষের শুভেচ্ছা! ইব্‌নুল কায়্যিম জাওযি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "তাদেরকে তাদের কুফরী উৎসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানানো সবার জন্যে হারাম, যেমন বলা: "তোমার উৎসব সফল হোক", "শুভ বড় দিন" অথবা এ জাতীয় অন্যান্য শব্দ, যা বর্তমান আমরা শুনতে পাই। এভাবে শুভেচ্ছা জানানোর ফলে যদিও সে কাফির হয় না, কিন্তু তার এ কর্ম হারাম তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ প্রকারান্তরে এভাবে সে ক্রুশকে সিজদার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছে! এ জাতীয় শুভেচ্ছা মদ্যপ, হত্যাকারী ও ব্যভিচারীকে শুভেচ্ছার জানানোর চেয়ে মারাত্মক। অথচ যে কবীরা গুনাহের জন্য শুভেচ্ছা জানাল, সে নিজেকে আল্লাহর শাস্তি ও অসন্তোষের জন্য প্রস্তুত করল"।

নববর্ষ ও আমাদের সতর্কতা

আমরা বছরের অন্যান্য দিনের ন্যায় নববর্ষের দিনকে গণ্য করব। এতে কোন ধরণের অনুষ্ঠান করব না ও তাতে অংশ নেব না। আমাদের সন্তানদের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখব, যেন তারা বিজাতীয় উৎসবে অংশ গ্রহণ না করে।

সন্তান কিংবা পরিবারের কোন সদস্যের আবদার রক্ষার্থে আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করে তাদের উৎসব উদযাপন করা যাবে না। ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "যদি কেউ বলে: আমরা এগুলো ছোট বাচ্চা ও নারীদের জন্য করি, তাকে বলা হবে: সবচেয়ে হতভাগা সে ব্যক্তি যে আল্লাহর অসন্তোষের বস্তু দ্বারা পরিবার ও সন্তানকে সন্তুষ্ট করে।

ভুল ধারণার অপনোদন

আমরা বলে থাকি পহেলা বৈশাখ পালন হচ্ছে বাঙালী কালচারাল অনুষ্ঠান, এর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, আমরা বাঙালী জাতি হিসেবেই পহেলা বৈশাখ পালন করে থাকি, এতে অসুবিধাটা কোথায় ? অবশ্যই ধর্মের জায়গায় ধর্ম, আর জাতির জায়গায় জাতি।

সর্ব প্রথম দেখতে হবে আমার পরিচয় কী ? আমার পরিচয় হচ্ছে আমি মুসলিম। জাতিগতভাবে একজন মুসলিম হতে পারে বাঙালী, ইংরেজ, চাইনিজ অথবা আফ্রিকান। এই সকল জাতি তার জাতিগত কালচারাল অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে কিন্তু অবশ্যই একজন মুসলিম হিসেবে যেন তা ইসলামি আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। কারণ আকীদা হচ্ছে ঈমানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। তাই আমি যেই জাতির মুসলিম-ই হই না কেন একজন

ঈমানদার মুসলিম হিসেবে আগে আমাকে ইসলামি আকীদাগত বিষয়গুলো সম্পর্কে খুব ভাল করে পড়াশোনা করে জেনে নিতে হবে যে আমি কী করতে পারবো আর কী করতে পাবো না। কোন ভাবেই যেন হালালের সাথে হারামের সংমিশ্রণ হয়ে না যায়।

চাইনিজদের সবচেয়ে বড় উৎসব হচ্ছে 'চাইনিজ নিউ ইয়ার'। এই সময় তাদের সাতদিন সরকারী ছুটি থাকে এবং এই সাতদিন ধরে চলে তাদের নানা রকম কালচারাল অনুষ্ঠান, বিগত পূর্বপুরুষদের পূজা করা এই অনুষ্ঠানের একটি অংশ। চাইনিজদের মধ্যেও অনেক মুসলিম রয়েছে। তারা কি তাদের জাতির ঐ সাতদিন ব্যাপি 'চাইনিজ নিউ ইয়ার' উৎসব পালন করে ? অবশ্যই মুসলিম চাইনিজরা তা পালন করে না। কারণ ঐ সাতদিন ব্যাপী যে কালচারাল অনুষ্ঠান হয় তা ইসলামি আকীদা অর্থাৎ ঈমানের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

পৃথিবীতে দু'প্রকার দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) রয়েছেঃ

(ক) মানব রচিত দ্বীন যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ ও অগ্নিপূজক ইত্যাদি।
(খ) আল্লাহর দেয়া (আসমানী বা ওহী নির্ভর) দ্বীন যেমন ইহুদিধর্ম, খৃস্টান ধর্ম ও ইসলাম।

মানব জাতির হিদায়াত ও কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ তাআলা সকল নবী ও রসূলকে এ দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন। ইহুদি-খৃস্টানদের দ্বীন আজ পরিবর্তিত, রহিত ও মানব রচিত দ্বীনের ন্যায় প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহর নিকট তার কোন মূল্য নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সর্বোত্তম দ্বীন, সর্বোত্তম কুরআন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রসূল দান করেছেন।

আসুন আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করি এবং কাফির মুশরিকদের সঙ্গ ত্যাগ করি, তাদের কৃষ্টি-কালচার পরিহার করি। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী ও একনিষ্ঠভাবে শুধু তাঁরই ইবাদতকারী হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

মূর্তি, ভাস্কর্য ও ইসলাম

আভিধানিক অর্থে ভাস্কর্য ঃ

ভাস্কর্য বা স্কালপচার (Sculpture)ঃ যে আকৃতি বা ছবি পাথর বা অন্যকিছুতে খোদাই করে তৈরি করা হয় তা-ই ভাস্কর্য। 'ভাস্কর্য বিদ্যা'-এর অর্থ, The art

of carving বা খোদাই বিদ্যা। যিনি এ বিদ্যা অর্জন করেছেন অর্থাৎ যিনি খোদাই করে আকৃতি বা ছবি নির্মাণ করেন, তাকে বলা হয় ভাস্কর (Sculptor)। অক্সফোর্ড অভিধানে ভাস্কর (Sculptor) সম্পর্কে বলা হচ্ছে– One who carves images or figures. অর্থাৎ যে ছবি অথবা আকৃতি খোদাই করে তৈরি করে।

পক্ষান্তরে মূর্তি অর্থ ছায়া অথবা এমন আকৃতি বা শরীর যার ছায়া আছে। ভাস্কর্য ও মূর্তির আভিধানিক অর্থে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা গেল। এককথায় যে সকল আকৃতি খোদাই করে তৈরি করা হয় তা ভাস্কর্য– রৌদ্র বা আলোর বিপরীতে যার ছায়া পড়ে না। আর যে সকল আকৃতি এমনভাবে নির্মাণ করা হয়, রৌদ্রে বা আলোর বিপরীতে যার ছায়া প্রকাশ পায়, তা হল মূর্তি। বিভিন্ন অভিধানে এভাবেই বলা হয়েছে।

কেউ কেউ মনে করেন যে সকল আকৃতি পূজা অর্চনার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয় সেগুলোকে মূর্তি বলে। আর যা পূজার জন্য নয়, তার নাম ভাস্কর্য। এটা ঠিক নয়, পূজার জন্য হলেও মূর্তি, পূজার জন্য না হলেও মূর্তি।

কাজেই বিভিন্ন উন্মুক্ত স্থানে যে সকল মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে তাকে ভাস্কর্য বলে চালিয়ে দেয়া একটি মূর্খতা। উদ্দেশ্য হল, ভাস্কর্য শিল্পের নামে ইসলামি সংস্কৃতির বিরোধিতা করা এবং অন্ধকার যুগের পৌত্তলিক সংস্কৃতি-কে বাঙালীর সংস্কৃতি বলে প্রতিষ্ঠিত করা।

ভাস্কর্য সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি কী ?

কোন প্রাণীর ছবি, ভাস্কর্য, মূর্তি একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত তৈরি করা, প্রদর্শন করা বা স্থাপন করা যাবে না। ছবি, ভাস্কর্য, মূর্তি ইত্যাদিকে ইসলাম দু'ভাগে ভাগ করে। ১) প্রাণীর ছবি। ২) প্রাণহীন বস্তুর ছবি।

রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসে এসেছে– আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রসূল' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন সফর থেকে ফিরে আসলেন। আমি একটি পর্দা টানিয়েছিলাম। যাতে প্রাণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবি ছিল। রসূল সা. যখন এটা দেখলেন, ক্রোধে তার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, হে আয়িশা, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি তার হবে, যে আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য নির্মাণ করে।' অতঃপর আমি সেটাকে টুকরো করে একটি বা দুটি বালিশ বানালাম। (সহীহ মুসলিম)

আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, 'কোনো প্রতিকৃতি রাখবে না, সবগুলো ভেঙে দেবে। আর কোনো উঁচু কবর রাখবে না, সবগুলো সমতল করে দেবে।' (সহীহ মুসলিম, আবু-দাউদ, আন-নাসাঈ)

আবু তালহা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ঘরে কুকুর ও প্রতিকৃতি আছে সেখানে ফিরিশতা প্রবেশ করে না।' (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

প্রাণী ব্যতীত যে কোনো বস্তুই হোক তার ছবি, ভাস্কর্য, মূর্তি ইত্যাদি অঙ্কন, নির্মাণ, স্থাপন ও প্রদর্শন করা যাবে। কারণ, হাদীসে যে সকল নিষেধাজ্ঞার কথা এসেছে তার সবই ছিল প্রাণীর ছবি বিষয়ে। কেউ যদি কোনো ফুল, ফল, গাছ, নদী, পাহাড়, চন্দ্র, সূর্য, ঝর্ণা, জাহাজ, বিমান, গাড়ি, যুদ্ধাস্ত্র, ব্যবহারিক আসবাব-পত্র, কলম, বই ইত্যাদির ভাস্কর্য তৈরি করে সেটা ইসলামে অনুমোদিত।

যতগুলো পৌত্তলিকতা-বিরোধী ধর্ম আছে তার মধ্যে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে' বেশি সোচ্চার। পৌত্তলিকতা বা শিরক হলো মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি মারাত্মক অবিচার। এটা ক্ষমার অযোগ্য অন্যায়। এটা হলো আল্লাহর প্রভুত্বকে অস্বীকার করে তাঁর প্রাপ্য উপাসনা অন্যকে নিবেদন করা। অবশ্য যারা ভোগবাদী দর্শনে বিশ্বাসী, সৃষ্টিকর্তা ও পরকাল যাদের কাছে গুরুত্বহীন, তাদের কাছে পৌত্তলিকতা আর একত্ববাদ কোনো বিষয় নয়।

ছবি, প্রতিকৃতি, ভাস্কর্য আর মূর্তিকে ইসলাম পৌত্তলিকতার প্রধান উপকরণ বলে মনে করে। শুধু মনে করা নয়, তার ইতিহাস, অভিজ্ঞতা স্পষ্ট। শুধু ইসলাম ধর্ম যে পৌত্তলিকতাকে ঘৃণার চোখে দেখে তা নয় বরং আরো দুটি একেশ্বরবাদী ধর্মের অনুসারী ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছেও তা ঘৃণিত।

অতীতে পৌত্তলিকতার সূচনা হয়েছিল ছবি বা প্রতিকৃতির মাধ্যমে। ছবি ও ভাস্কর্যের পথ ধরেই যুগে যুগে পৌত্তলিকতার আগমন ঘটেছে। আর এ পৌত্তলিকতার অন্ধকার থেকে তাওহীদের আলোতে নিয়ে আসার জন্যই আল্লাহ যুগে যুগে নবী ও রসূলদের পাঠিয়েছেন। আজীবন তাঁরা এ পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করেছেন। অনেকে জীবন দিয়েছেন। অনেকে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। এ জন্যই ইসলাম ও অন্যান্য একেশ্বরবাদী ধর্ম মূর্তিপূজার

বিরুদ্ধে সোচ্চার। মূর্তিপূজা ও পৌত্তলিক সংস্কৃতির বিরোধিতা করা তাদের ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সকল প্রশ্নের একমাত্র জবাব আমি মুসলিম

- আখিরাতের কথা, আল কুরআনের নির্ভুল ও প্রকৃষ্ট হিদায়াতের কথা, রসূল (সা.)-এর অবিসংবাদিত শাশ্বত জীবনাদর্শের কথা তর্কের খাতিরে স্থগিত রেখে যদি এই প্রশ্ন করা হয়, আসলেই কোনটা আমাদের জন্য গৌরবের ঃ তাওহীদ নাকি অংশীবাদ? এর জবাবে একজন সুস্থবুদ্ধির মানুষ কি বলবে?
- একজন মুসলিম, সে যতো বড় বাঙ্গালীই হোক, তাঁর কাছে কোনটা অধিক গৌরবের, কাহ্নপা জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস কি শ্রীচৈতন্য বা ন্যাড়ার ফকির সাঁইবাবাদের উত্তরাধিকার, নাকি মহানবী (সা.) এবং তাঁর অনুপম-চরিত্র সাহাবী (রা.)-দের উত্তরাধিকার? একজন মুসলিম সন্তানের অন্তর সত্যসত্যই কোন আনন্দে হিল্লোলিত হয়ে ওঠে, রবীন্দ্রজীবনী কবিগান-ঘেঁটুগান শারদীয় দুর্গোৎসব, রথযাত্রা, রাখীবন্ধন, ভাইফোঁটা ইত্যাদি নিয়ে, নাকি উমার ফারুক (রা.), খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.), সালাহদীন আইয়ূবী, মুহম্মদ বিন কাসিম, মাহমুদ গজনবী, বখতিয়ার খিলজী, শাহজালাল (রহ.) প্রমুখ বীর সিপাহসালার, যাঁরা ইসলামকে অপ্রতিহত বেগে ছড়িয়ে দিয়েছেন দিকে দিকে।
- এই শেষোক্ত গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকারকে যদি কেউ ভুলে থাকতে চায়, থাকতে পারেন; কেউ যদি অস্বীকার করতে চায়, তাও পারেন; কিন্তু সেটা যেহেতু ইসলামি চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক, এই বিস্মৃতি ও অস্বীকৃতিকে ঘোরতর আত্মঘাতী মূঢ়তা বলা হবে। এতে শুধু আখিরাত বিনষ্ট হয় না, কাফির-মুশরিকদের পদতলে সর্বস্ব-সমর্পিত এক জিল্লতীপূর্ণ জীবনও অনিবার্য হয়ে ওঠে। আজ মুসলিম বিশ্বের দিকে তাকালে এই চিত্র সহজেই চোখে পড়ে।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

মুসলিম মেয়েদের সংক্ষিপ্ত পোশাক (ড্রেস) যখন বিপদের কারণ

মানুষ যেসব বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্যসব প্রাণী থেকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে তার অন্যতম হলো পোশাক। মানুষের মতো অন্য প্রাণীরাও খায়, ঘুমায় এবং জৈবিক চাহিদা মেটায়। প্রাণীরা মানুষের মতো আপন লজ্জাস্থান ঢাকে না ঠিক। তবে আল্লাহ তাআলা জন্মগতভাবেই তাদের লজ্জাস্থান স্থাপন করেছেন কিছুটা আড়ালে। প্রাণীদের মধ্যেও আছে লজ্জার ভূষণ। মানুষ তাহলে আব্রু ঢাকায় পশুর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে কীভাবে? হ্যা, মানুষও লজ্জা নিবারণ করে ঠিকই কিন্তু তা পরিশীলিত পোশাক ও আকর্ষণীয় বেশ-ভূষার মাধ্যমে। যে কেউ চাইলেই দেখতে পারে পশুর লজ্জাস্থান। পক্ষান্তরে মানুষের লজ্জাস্থান এতোটা সুরক্ষিত ও আচ্ছাদিত যে তার সম্মতি ছাড়া অন্যের দৃষ্টি সেখানে পৌঁছতে অক্ষম।

মানুষের এই বৈশিষ্ট্যের কথা একেবারে ভুলে গেছে অমুসলিম দুনিয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, অমুসলিমদের পর এবার মুসলিম মেয়েরা যেন এ বৈশিষ্ট্য জলাঞ্জলী দিতে বসেছে! মুসলিম রমণীদের পোশাকেও নেই মার্জিত রুচি বা ভদ্রতার লেশ। স্যাটেলাইট প্রযুক্তির যুগে তরুণীদের সংক্ষিপ্ত পোশাকের কথা বলে শেষ করা যাবে না, তাদের লজ্জা নিবারণের প্রচেষ্টা দেখে লজ্জায় মাথা ঘুরে যায়। ইদানীং মেয়েদের পোশাক দেখলে মনে হয় এটা শরীর ঢাকার চেষ্টা নয় বরং শরীর খুলে রাখার প্রতিযোগীতা।

মেয়েদের ড্রেসের প্রায় প্রতিটি অংশই কাপড় বাঁচানোর অশোভন প্রয়াসের নীরব সাক্ষী। জামার কলার ছোট হতে শুরু করেছে। পিঠের অর্ধাংশও বলতে গেলে অনাবৃত। হাতা ছোট হতে হতে পুরো বাহু এখন উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। কোমরের কাছে এসে তা যেন আরও বেশি উর্দ্ধমুখী। এছাড়া টাইট জিন্স প্যান্ট তো এখন মেয়েদের খুবই প্রিয়।

পুরুষরাও আজ পোশাক আগ্রাসনের শিকার। অশ্লীলতা আর রুচির বিকারে জর্জরিত। ইদানীং ছেলেরাও ঝুঁকেছে টাইট পোশাকের দিকে। মেয়েরা যদি হয় স্বল্প বসনা, ছেলেরা তবে হতে চলেছে টাইট ফ্যাশনপ্রিয়।

ছেলেদের প্যান্টগুলো এত টাইট যে সেটা পরে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী বসে টয়লেট ব্যবহার করা যায় না। নামাযে ঠিকমতো রুকু সিজদাও করা যায় না। বেল্ট মোড়ানো হলেও রুকু অবস্থায় মেরুদণ্ডের কিছু অংশও তাতে বেরিয়ে পড়ে। আর তাদের টি-শার্টগুলো যেন হয়ে উঠেছে চারুকলার শিক্ষানবিশদের প্রদর্শনীর গ্যালারি, প্রাণীর ছবি ছাড়া টি-শার্টই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মেয়েরা যদি যাত্রা শুরু করে থাকে পুরুষ হবার পথে, তবে ছেলেরা হাঁটতে শুরু করেছে মেয়েদের পেছনে। মেয়েদের চুল হয়ে আসছে ছোট আর ছেলেদের বড়।

আমরা সবাই জানি, বর্তমানে বাংলাদেশে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় Eveteasing (ইভটিজিং)। পত্রিকার পাতা খুললেই প্রতিদিন চোখে পড়ে দেশের নানা প্রান্তের ইভটিজিংয়ের খণ্ডচিত্র। ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় নাটোরে প্রাণ হারাতে হলো জাতিগড়ার কারিগর খ্যাত একজন প্রতিবাদী শিক্ষককে। ঘটনার পর দিনই ফরিদপুরে এ কাজে বাধা দিতে গিয়ে বখাটের হাতে প্রাণ হারালেন এক মা। তার পরদিন নওগাঁয় তিনজনকে আহত করা হলো একই কারণে। নড়েচড়ে উঠলো সারা দেশ। শুরু হলো ইভটিজিং বিরোধী নানা কর্মতৎপরতা। কোথাও দেখা যাচ্ছে সচেতন জনতা এগিয়ে আসছেন বখাটেদের দমনে, কোথাও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, কোথাও খোদ মেয়েরা। টাঙ্গাইলের একটি চমকপ্রদ খবরও চোখে পড়ল। সচিত্র এই প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, বখাটেদের শায়েস্তা করতে মেয়েরা কারাতে (karate) শিখছেন। সরকারিভাবেও বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হলো। হাইকোর্ট থেকেও ইভটিজিং প্রতিরোধে নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে নির্দেশ দেয়া হলো। এতসব উদ্যোগ-আয়োজনকে ব্যর্থ করে রোজই বেড়ে চলেছে ইভটিজিং ভাইরাসের প্রকোপ।

সমস্যার গোড়া কোথায় তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা যাক। গাছের গোড়া কেটে দিয়ে মিনারেল ওয়াটার কিংবা এরচেয়ে বিশুদ্ধতর পানিও যদি তার মাথায় ঢালা হয়, তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না। গাছটির মৃত্যু অবধারিত।

নানা মুনী নানা মত দিয়ে আসলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না, উত্তরোত্তর ইভটিজিং সমস্যা বেড়েই চলেছে। জানি না কাকতালীয় কি-না, যেদিন বোরকা পরাকে কেন্দ্র করে কাউকে ধর্মীয় পোশাক পরতে বাধ্য করা যাবে না মর্মে হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত রায় দিলো। তারপর থেকে সহসাই যেন ইভটিজিংয়ের ঘটনা উদ্বেগজনকহারে বেড়ে চললো। ইভটিজিং শব্দটি ঝড় তুললো প্রতিটি চায়ের টেবিলে। মিডিয়ার সিংহভাগ স্থান দখল করে নিতে লাগলো এই অশুভ শব্দটি।

সত্যি কথা হলো ইভটিজিংয়ের অনেক ঘটনার পেছনেই এই অশ্লীল পোশাকের প্রভাব রয়েছে। ইভটিজিং বন্ধ করতে কোন উদ্যোগেই কাজ হবেনা, পোশাকে শালীনতা আর রুচিতে মার্জিত বোধের বিকাশই পারে ইভটিজিং প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে।

নারীর স্বাধীনতা নাকী অসম্মান!

- নারীর স্বাধীনতা বলতে কী বুঝায়? আমরা দেখছি দেশের সর্বত্রই নারী স্বাধীনতার নামে কিছু কাজকর্ম হচ্ছে। যেমন ঃ
  - রাস্তা-ঘাটে যতো পোষ্টার বিজ্ঞাপন হিসেবে টানানো হয় সেখানে পুরুষদের তুলনায় নারীদের বেশী অশ্লিল ছবি দেখা যায়!
  - পত্র-পত্রিকায় নারী-পুরুষের যতো ছবি ছাপা হয় তার মধ্যে নারীদেরকেই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অশালিন সংক্ষিপ্ত পোষাকে দেখা যায়!
  - নাটক-সিনেমায় যা প্রচার হয় তার মধ্যে পুরুষদের তুলনায় নারীদের বেশী অশ্লিল ও অনৈতিক ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যায়
  - ঘরের বাইরে, শপিং মলে, পার্কে, কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা বেশী সর্ট ড্রেস পরে থাকে!
  - কোন নতুন মডেলের গাড়ি বা মোটর সাইকেলের বিজ্ঞাপনে দেখা যায় গাড়ির পাশে একটি বা দুটি মেয়ে সংক্ষিপ্ত অশালিন পোষাক পরে দাঁড়িয়ে আছে!

- সাবান একটি প্রয়োজনীয় পণ্য যা নরনারী সকলেরই প্রয়োজন, কিন্তু টিভি বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে মডেল হিসেবে একটি স্বল্পবসনা নারী গোসল করছে!
- ব্লেড, রেজার বা সেভিং ক্রিমের বিজ্ঞাপনে পুরুষের সাথে নারীকেও দেখানো হচ্ছে!
- কন্ডমের বিজ্ঞাপনে নারীকে না দেখালেই কি নয়?
- বাজারে সাধারণত যে সকল ড্রেস পাওয়া যায় তাতে ছেলেদেরগুলো থাকে ঢিলেঢালা, কিন্তু মেয়েদের ড্রেস থাকে এমন ডিজাইনের যাতে করে তার শরীরের গঠন প্রণালী ফুটে উঠে, অথবা বুক-পিঠ-পেট সরাসরি দেখা যায়!
- কোন প্রধান অতিথিকে সম্মর্ধনা দিতে ফুল হাতে দুই লাইনে দাড় করানো হচ্ছে নারীদেরকে!
- শিল্পমেলা বা বাণিজ্য মেলার স্টলগুলোতে সেলস গার্ল হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে নারীদেরকে!

আমরা যদি উপরের এই বাস্তব চিত্রগুলোর দিকে তাকাই এবং গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে কি বলবো যে এগুলো নারী স্বাধীনতা? নাকী স্বাধীনতা ও অধিকারের নামে নারীদেরকে অসম্মান করা। নারীরা তাদের শরীরের সবচেয়ে গোপন অংশও পাবলিকের সামনে উন্মুক্ত করে ফেলছে। এটা অনেকটা জেনে বুঝে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার মতো। নিজের মূল্যবান সম্পদ শরীর অন্যকে প্রদর্শন করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। তাই নারীর সম্মান নারী নিজেকেই সচেতন হয়ে রক্ষা করতে হবে।

একজন নারীবাদী মহিলা মন্তব্য করেছেন যে - "নারীদের জন্য সংক্ষিপ্ত ড্রেস তো পুরুষরাই তৈরী করে, এতে নারীদের দোষ কোথায়?" প্রশ্ন হলো বিষও তো পুরুষরা তৈরী করে সেজন্য আমি জেনেশুনে তো আর বিষ পান করতে পারি না!

- ২০১৩ সালে চীন সরকার নারীদেরকে অসম্মানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং নিরাপত্তা দেয়ার জন্য সরকারীভাবে আইন করেছে এখন থেকে মেয়েরা আর সর্ট স্কার্ট পরতে পারবে না।

- আমরা পত্রিকায় দেখেছি যে ক্যানাডার একজন উর্ধতন পুলিশ অফিসার তার অভিজ্ঞতা থেকে মন্তব্য করেছিলেন যে, মেয়েদের রাস্তা-ঘাটে Sexual Assault হওয়ার জন্য দায়ী তাদের সর্ট এবং আপত্তিকর ড্রেস ।

বোনেরা আসুন কয়েকটা কথা ভেবে দেখি । যেহেতু সর্বত্র নারী স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে, একজন স্বাধীন নারী হিসেবে যদি আমি যা ইচ্ছে তাই (সংক্ষিপ্ত ড্রেস) পরতে পারি তাহলে তো একজন নারী হিসেবে আমার এই স্বাধীনতাও আছে যে ঃ

- আমি আমার শরীর অন্যকে প্রদর্শন করবো না, ঢেকে রাখবো ।
- আমি অন্যের হাতের পুতুল হবো না ।
- অনৈতিক পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি আমাকে যেভাবে সাজাতে চাইবে আমি সেভাবে সাজবো না ।
- কেউ পণ্য হিসেবে আমাকে ব্যবহার করতে চাইলেও অমি সেভাবে ব্যবহৃত হবো না ।

নারী স্বাধীনতার ইতিবৃত্ত

- ব্যবিলনীয় সভ্যতা যে কয়েকটি কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হলো, নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন-উদ্দামতার অবাধ ও যথেচ্ছ প্রসার । বিশেষ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না, ইউরোপ, আমেরিকা এবং বাংলাদেশ আজ ব্যবিলনের মতোই জাতিতে পরিণত হয়েছে । এটা শুধু নিন্দার কথা নয়, ভয় ও দুঃখের কথা ।

- আশঙ্কা হয়, আসমান থেকে অবতীর্ণ বা জমীন থেকে উত্থিত কোনো গযবের আবশ্যকতা নেই, শুধু অবাধ যৌনাচার ও নারী-স্বাধীনতার নামে নারীকে পথে বসানোর এই পাপেই আমরা হয়তো অনতিবিলম্বে মুখ থুবড়ে পড়বো । কারণ ব্যভিচারের চেয়ে কুৎসিত ও কদর্য কোনো পাপ নেই; আর নারী-স্বাধীনতার কুহকে নারীকে পণ্য করে বেচা-কেনা করার চেয়ে জঘন্য কোনো ব্যবসাও নেই । অতএব এমন অকথ্য পাপ নিয়ে যারা নির্ভয়ে খেলা করে, এমন অকথ্য পাপ যাদের জীবনদর্শন, তাদের উপর আল্লাহর লানত যে শীঘ্রই অবতরণ করবে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না ।

নারীর অধিকার সম্বর্কে ভুল ধারণা দূর হওয়া প্রয়োজন

বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে নারী আন্দোলন চলছে। কিন্তু নারীদের আসল পরিচয় ও সঠিক মর্যাদা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা কী বলেছেন তা নারীরা ভালভাবে জানেন না। আলাহ শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে নারীদের যে মর্যাদা প্রদান করেছেন তা না জানার কারণে নতুন করে অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে হচ্ছে। নারীদের নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে জানতে হলে কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।

ইসলাম নারীদের জন্য যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে, তা তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়ার জন্য করেনি, বরং তারা যাতে কোন প্রকার অন্যায় ও অশ্লীল কাজে জড়িয়ে না পড়ে, নিরাপত্তাহীনতায় না ভুগে, সেজন্যই তাদের উপর এ সব বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে যা মেনে চললে তাদের জন্য অফুরন্ত পুরষ্কারের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ দিয়েছেন। আর এটিই হল নারীদের জন্য সত্যিকার সম্মান ও মর্যাদা।

উসামা ইবনে যায়েদ (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ আমার পর পুরুষদের জন্য নারীদের ফিতনার চেয়ে মারাত্মক ও ক্ষতিকর আর কোন ফিতনা (অরাজকতা) আমি রেখে যাইনি। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

আলাহর বিধান হলো যতক্ষণ না মানুষ নিজের মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা করবে এবং পরিবর্তনকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা চালাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে কোন পরিবর্তন আসবে না।

"আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।" (সূরা রাদ ১৩ ঃ ১১)

আল্লাহ তা'আলা নারীদের জন্য যেসব বিধি-বিধান দিয়েছেন, তা সবই নারীদের নিরাপত্তা ও তাদের মান সম্মানের হিফাযত করার জন্যই দিয়েছেন। ইসলামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে নারীদের প্রকৃত কল্যাণ। একমাত্র ইসলামই নিশ্চিত করছে নারীদের নিরাপত্তা এবং গ্যারান্টি দিয়েছে তাদের মান মর্যাদা রক্ষার।

ইসলামে নারীর অধিকার

ইসলাম নারী-পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করে। এখানে সমতা মানে অভিন্নতা নয়। ইসলামে নর-নারীর ভূমিকা সম্পূরক, বৈপরীত্যের নয়; সম্পর্ক অংশীদারীত্বের, বিরোধিতার নয়, যা শ্রেষ্ঠত্বের সংগ্রামে লিপ্ত করে। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীদেরকে নিম্নের ছয়টি বিষয়ে অধিকার নিশ্চিত করেছে।

ক) আত্মিক অধিকার
খ) অর্থনৈতিক অধিকার
গ) সামাজিক অধিকার
ঘ) শিক্ষার অধিকার
ঙ) আইনগত অধিকার
চ) রাজনৈতিক অধিকার

বাংগালি নারীরা অযথাই ভয় পান

বাংলাদেশের মুসলিম নারীরা অযথাই ভয়ে অস্থির যে বাংলাদেশে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে নারীদের অবস্থা শেষ, তাদেরকে ঘরে বন্দি করে ফেলা হবে, তাদের সকল স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হবে, দেশ ১৪শত বছর পিছিয়ে যাবে, দেশ আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে ফিরে যাবে, নারী শিশুদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া হবে, হুজুরা নারীদেরকে রাস্তা-ঘাটে যেখানেই পাবে সেখানেই মারধোর করবে ইত্যাদি ইত্যাদি আজগুবি সব চিন্তাভাবনা। এদের প্রতি প্রশ্ন ১৪শত বছর আগে নারীর যে ভয়াবহ দূরঅবস্থা ছিল কে তা পরিবর্তন করে নারীকে সকল অধিকার ফিরিয়ে দিল? কে নারী সুমহান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলো? এটা কি আমেরিকা, ইউরোপ বা অন্য কোন উন্নত পশ্চিমা সভ্যতা নাকি ইসলাম?

ইসলামের দৃষ্টিতে হিজাব বাজায় রেখে নারীরা সকল কাজকর্মই করতে পারবেন। ইসলামিক পূর্ণজাগরণের অন্যতম প্রতীক হলো হিজাব। এটা সলাত বা হজ্জের মতো একটা প্রকাশ্য ইবাদত। মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে সব ধরণের কাজ (যেমন চিকিৎসক, প্রকৌশলী, পাইলট, পুলিশ) হিজাব পরিহিত মহিলারা সাফল্যের সাথে করছেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থমন্ত্রী শেখ লুবনা এর ভালো উদাহরণ, তিনি গত চার বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে সফল অর্থমন্ত্রী।

নারীর হিজাব সম্পর্কে একটু জানা যাক

হিজাব বা পর্দার উদ্দেশ্য হলো নারীকে পুরুষের অনাকাংখিত দৃষ্টি থেকে নিরাপদ রাখা। এ কারণেই আল-কুরআনে যুবতীদের চেয়ে বৃদ্ধাদের পর্দার গুরুত্ব কম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ বৃদ্ধাদের প্রতি কারো আকর্ষণ থাকে না বরং তাদের প্রতি মা, দাদী ও নানীদের মতো শ্রদ্ধাবোধ এমনিতেই এসে যায়।

নারীদের চেহারা, সৌন্দর্য্য ও ভাবভঙ্গির মতো তাদের কণ্ঠস্বরও পুরুষদেরকে আকর্ষণ করতে পারে। তাই কোনো পরপুরুষের সাথে কথা বলতে বাধ্য হলে নারীদেরকে অনাকর্ষণীয় স্বরে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেন কণ্ঠস্বর শুনে কোনো পুরুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে না পারে।

"যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে থাক তা হলে কোমল আওয়াজে কথা বলো না, যাতে রোগগ্রস্ত অন্তরের মানুষ লোভে পড়ে যায়; বরং সোজাসুজি ও স্পষ্টভাবে কথা বল।" (সূরা আহযাব ঃ ৩২)

বোনেরা ভাববেন না আল্লাহ শুধু মেয়েদের পর্দার কথা বলেছেন। বরং কুরআনে মেয়েদের আগে পুরষদের পর্দা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (দেখুন সূরা নূর আয়াত ৩০-৩১) এর কারণ হলো, কোনো নারীকে দেখে যেমন কোনো পুরুষ আকৃষ্ট হয়ে কুচিন্তা করতে পারে তেমনি কোনো নারীও কোনো পুরুষকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কুচিন্তা করতে পারে।

একজন পুরুষের জন্য কোনো পরনারীকে আগ্রহ ভরে দেখা যেমন পাপ তেমনি একজন নারীর জন্য আগ্রহ ভরে পরপুরুষকে দেখাও পাপ। তাই পর্দার মধ্যে থেকেও পরপুরুষকে আগ্রহ নিয়ে দেখলে পর্দাহীনতার গুনাহ হয়ে যাবে। একজন মহিলার জন্য একজন পরপুরুষের সামনে বেপর্দা হওয়া যেমন পাপ, নিকটাত্মীয় গায়ের মুহরিমের সামনেও বেপর্দা হওয়া তেমনি পাপ।

যেমন আজকাল আমাদের দেশে দেবর, ভাশুর, ভগ্নিপতি, খালাতো, চাচাতো, মামাতো ও ফুফাতো ভাইদের সামনে মেয়েরা বেপর্দা হওয়াকে পাপ মনে করে না। প্রকৃতপক্ষে, তারা প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের সাথে আরও বেশি পর্দা করা উচিত। কারণ এ ধরনের নিকটাত্মীয় গায়ের মুহরিমদের দ্বারা আরও বেশি বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে।

আমাদের সমাজে কতিপয় পর্দানশীন পরিবারেও পর্দার মূল লক্ষ্য অনুধাবন করতে না পেরে পর্দার কার্যক্রমে উল্টাপাল্টা করে ফেলেন। অনেক পরিবারের মহিলারা নিজেরা বোরকা পরে পর্দা করে বের হন অথচ তাদের যুবতী মেয়েরা তাদেরই সাথে আকর্ষণীয় পোশাকে বেপর্দা হয়ে বের হয়। অনেকের ভুল ধারণা এমন যে, বয়স হলেই শুধু পর্দা করতে হয়। যেমন ঃ পুরুষদের মধ্যে ভুল ধারণা আছে যে বয়স হলে, চাকুরি থেকে অবসর নেবার পর দাড়ি রাখতে হয়, যুবক বয়সে দাড়ি রাখার প্রয়োজন নেই। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পর্দাহীনতার ক্ষতি

সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পর্দাহীনতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নাফরমানি ও আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবাধ্যতা। এই অবাধ্যতা নিজেদেরই ক্ষতি।

"আমার সব উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যারা অস্বীকার করে তারা ছাড়া। সাহাবী (রা.) এ কথা শুনে বলল, হে আল্লাহর রসূল! যারা অস্বীকার করে তারা কারা? রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যে আমার অনুকরণ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল, আর যে আমার নাফরমানি করল, সে অস্বীকার করল"। [সহীহ বুখারী]

আল্লাহ বলেন ঃ

নিশ্চয় যারা এটা পছন্দ করে যে, মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। (সূরা নূর ঃ ১৯)

ইবলীশ শয়তান বনী আদমের চির শত্রু। পৃথিবীর শুরু থেকেই শয়তান মানুষকে বিপদে ফেলে আসছে।

হাদীস ঃ

১. রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি আমার পর পুরুষদের জন্য নারীদের ফিতনার চেয়ে বড় ক্ষতিকর কোন ফিতনা রেখে যাইনি। [সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিম]

২. রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা দুনিয়াকে ভয় কর এবং নারীকে ভয় কর, কারণ বনী ইসরাইলের প্রথম ফিতনা ছিল নারীর ফিতনা"। [সহীহ মুসলিম]

৩. রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতকে কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করতে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ বুখারী) বিশেষ করে নারীর ক্ষেত্রে তিনি উম্মতে মুসলিমাহকে অধিক সতর্ক করেছেন। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয়, বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম নারী ও পুরুষ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশের বিরোধিতা করছেন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতকে যে ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন, তার প্রতিফলনই আমরা আজ লক্ষ্য করছি।

আল্লাহ বলেন ঃ

আর যে রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ। (সূরা নিসা ঃ ১১৫)

হিদায়াতের পথ স্পষ্ট হওয়ার পরও যদি কেউ গোমরাহির পথ অবলম্বন করে, এবং মু'মিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কঠিন আযাব রেখেছেন, তাদের কঠিন শাস্তি দেবেন। আর আখিরাতের শাস্তি কত কঠিন হবে তা বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যাবে না।

রূপ-সৌন্দর্য নারীর মহামূল্যবান সম্পদ

আমাদের কাছে যখন কোন দামী সম্পদ, স্বর্ণালংকার ইত্যাদি থাকে তা আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখি, লকারে রাখি বা ব্যাংকে রাখি যাতে কেউ চুরি-ডাকাতি করে নিয়ে যেতে না পারে। এই সম্পদ দেখে কারো লোভও হতে পারে, হিংসাও জাগতে পারে। ঠিক তেমনি নারীর মহামূল্যবান রূপ-সৌন্দর্য আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন তাকে আমানত স্বরূপ। এই রূপ আল্লাহ তা'আলা চাইলে যেকোন সময় আবার ফেরতও নিয়ে নিতে পারেন। তাই মহান আল্লাহর দেয়া এই রূপ-সম্পদ নারীর উচিত পরপুরুষ থেকে লুকিয়ে রাখা, ঢেকে রাখা, আড়াল করে রাখা, আর এতেই রয়েছে তার প্রকৃত কল্যাণ। এতে সে দুই দিক

দিয়ে লাভবান হচ্ছে – এক, আল্লাহর হুকুম পালন করছে আর অন্যদিকে তার মহামূল্যবান সম্পদ পরপুরুষের কু-দৃষ্টি হতে রক্ষা পাচ্ছে। আসলে নারীর রূপ-সৌন্দর্য্য শুধু তার স্বামীর জন্য। এই রূপ অন্য কাউকে প্রদর্শন করলে অকল্যাণ ছাড়া জীবনে আর কোন কিছুই আসে না।

বাড়ীর ভেতরে পর্দার নিয়ম

বাড়ীর ভেতরে মহিলাদের কর্মব্যস্ত থাকাকালে সব সময় সতর ঢেকে রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই বাড়ীর অন্দর মহলে পুরুষদের অবাধ যাতায়াত থাকা উচিত নয়। সেখানে মেয়েরা যাতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে এর পূর্ণ সুযোগ থাকতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর ছোট্ট সংসারে পর্দার সমস্যা নেই। কিন্তু একান্নবর্তী বা যৌথ পরিবারে এটা একটি বড় সমস্যা। নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও যেসব পুরুষের সাথে দেখা দেয়া শরীয়তে নিষেধ তাদের অন্দর মহলে যেতে দেয়া মোটেই উচিত নয়। শুধুমাত্র নিচের ১২জন অন্দর মহলে যেতে পারবে ঃ

১) স্বামী ২) বাবা ৩) স্বামীর বাবা ৪) নিজের ছেলে ৫) স্বামীর ছেলে ৬) ভাই ৭) ভাইয়ের ছেলে ৮) বোনের ছেলে ৯) নিজের মেলামেশার মেয়েরা ১০) নিজের খরিদকৃত গোলাম (এযুগে প্রযোজ্য নয়) ১১) অতি বৃদ্ধ এবং ১২) এমন শিশুরা যারা মেয়েদের গোপন বিষয় সম্পর্কে এখনো অজ্ঞ। (সূরা আন্ নূর ঃ ৩০-৩১)

মেয়েদের এটুকু সচেতন থাকা দরকার যে তাদের শরীরের কোন অংশ খোলা থাকা অবস্থায় এবং ভালভাবে না ঢেকে স্বামী ছাড়া আর কারো সামনে যাওয়া শালীনতার বিরোধী। যেমন ঃ দেবর এবং ভাসুরের সামনে, দুলাভাইয়ের সামনে, নিজ কাজিনদের সামনে, গৃহ শিক্ষকের সামনে, ড্রাইভার-দারোয়ান-চাকরের সামনে, মাছ-তরকারীওয়ালাদের সামনে।

কর্মক্ষেত্রে পর্দার সুবিধা

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষের দায়িত্ব হলো সংসারের সকল খরচ বহন করা। অর্থাৎ পরিবারের ভরণপোষণের সমস্ত দায়দায়িত্ব স্বামীর (সহীহ বুখারী)। স্ত্রী চাকুরী করতে বাধ্য না বা স্ত্রীকে আয়-রোজগার করার জন্য স্বামী বলতেও পারবেন না। হ্যাঁ, যদি স্ত্রী চাকুরী করার কারণে সংসারে অতিরিক্ত কিছু আসে

তাহলে তা আলহামদুলিল্লাহ, তবে স্ত্রী অবশ্যই ১০০% পর্দার মধ্যে থেকে আয়-রোজগার করবেন। তবে অতিরিক্ত আয় করতে গিয়ে যদি স্ত্রীকে সামান্যতম বেপর্দা হতে হয় বা ঠিক মতো পর্দা করা সম্ভব না হয় তাহলে তার দায়-দায়িত্ব নিজের আমলনামা ছাড়াও স্বামীর আমলনামায় এসে পড়বে। অর্থাৎ এই কবীরা গুনাহর জন্য এবং ফরয হুকুম অমান্য করার জন্য আল্লাহর কাছে দু'জনকেই কঠিন জবাবদিহি করতে হবে।

তাই কর্মজীবী মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে পুরুষ কলিগ, কো-ওয়ার্কার, বস, কোম্পানির মালিক এবং অন্যান্য পুরুষদের সামনে অবশ্যই পর্দা করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে লাঞ্চের সময় দেখা যায় সবাই মিলে একসাথে আড্ডা দেয়া বা সময় কাটানো হয় কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সীমালংঘন করা যাবে না। পুরুষ-মহিলার অবাধ মেলামেশা (ফ্রী-মিক্সিং) করা যাবে না, এদের মাঝে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। যদি চাকুরী করার স্বার্থে কর্মক্ষেত্রে পর্দা করা সম্ভব না হয় তাহলে আখিরাতের ময়দানে কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। কারণ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত যেমন ফরয তেমনি পর্দা করাও ফরয। মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে যার যার হিসাব তাকেই দিতে হবে।

বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের ৮০%ই নারী শ্রমিক। আলহামদুলিল্লাহ! এই সম্মানিত বোনদের পরিশ্রমেই বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার একটি বিশাল অংশ রিজার্ভ ফান্ডে এসে থাকে। এদের কারণে আজ উন্নত বিশ্বে বাংলাদেশের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। তবে অতি দুঃখের বিষয় যে এই শ্রমিকদের ঘামের টাকায় মালিকরা মুনাফা অর্জন করেন কিন্তু তাদেরকে খুবই কম মুজরী দিয়ে থাকেন, তাদের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সুযোগ- সুবিধা দেন না বললেই চলে। কোন দুর্ঘটনা ঘটলে শত শত শ্রমিক মারা যান। তাদের দায় দায়িত্ব মালিকরা নেন না। সরকারও উপযুক্ত ক্ষতিপুরণ দেন না।

ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে এই বোনেরা পাবেন তাদের শ্রমের সঠিক মর্যাদা, ইনশাআল্লাহ। তাদের নিরাপত্তা, শ্রম অধিকার, নির্যাতনবিরোধী আইন হলে তাদের সকল বিষয়ে সমঅধিকার নিশ্চিত হবে। এরপর ধর্মীয় অধিকার (রিলিজিয়াস রাইটস) নিশ্চিত করতে হবে যেমন মহিলা সেকশন ও পুরুষ সেকশন আলাদা হবে। হয়তো কোন ফ্যাক্টরীর বেশীরভাগ অংশই হবে মহিলা সেকশন। আলাদা মহিলা সেকশন হলে বোনদের নিজেদের মধ্যে পর্দা করতে হবে না। এতে অমুসলিম মহিলারাও সম্মানের সাথে শান্তিতে থাকবেন, পুরুষ সহকর্মীরা তাদের উত্যক্ত করার সুযোগও পাবে না, কাজের ফাঁকে ফাঁকে

পরপুরুষরা তাদের সাথে আজেবাজে গল্প করার সুযোগও পাবে না। মুসলিমরা ওয়াক্তমত নামায পড়তে পারবেন। রমজান মাসে সময় নিয়ে ইফতার করতে পারবেন। এতে কর্মক্ষেত্রে শান্তি বিরাজ করবে এবং রহমতের ফিরিশতারা তাদেরকে পাহারা দিবেন। আশা করা যায় তারা আখিরাত এবং এই দুনিয়া দুই দিকেই সাফল্য অর্জন করবেন।

মহিলাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ

মহিলাদের জান্নাতে যাওয়া খুবই সহজ তা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাদের গ্যারান্টি দিয়েছেন। জান্নাতে যাওয়ার জন্য মহিলাদের শুধু চারটি কাজ করতে হবে। (আবু দাউদ)

১) পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে হবে।
২) রমাদান মাসে রোযা রাখতে হবে।
৩) স্বামীর আনুগত্য করতে হবে।
৪) পর্দা করে চলতে হবে।

ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমাদের সবচেয়ে বড় ভুল ধারণা এই যে, তারা ভাবে ইসলামে জান্নাত শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য নয়। এ ভুল ধারণা সূরা নিসার ১২৪ নম্বর আয়াত এর দ্বারা দূর করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

"পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেহ সৎকাজ করলে ও মু'মিন হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সামান্যতম অবিচারও তাদের প্রতি করা হবে না।"

একই রূপ বর্ণনায় সূরা আন নাহলে ৯৭ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

"মু'মিন হয়ে পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করবো এবং তাদিগকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার দান করবো।"

শেষ পরিচ্ছেদ

দ্বীনের সঠিক জ্ঞানের অভাব

- দুঃখের বিষয়, আমরা বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ এটাই জানিনা যে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে আমরা জানি না। পাক-ভারত-বাংলাদেশের অনেক মানুষই দ্বীন ইসলামের সওয়াবের কাজ মনে করে অনেক সময় খুব বেশী বেশী শিরক ও বিদ'আতি কাজ নিয়মিত করে যাচ্ছি। আমরা কুরআন থেকে নিজেদেরকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখে নিজেদের মনগড়া ইসলাম পালন করে যাচ্ছি। আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই পাওয়া যাবে যিনি জীবনে একবার সম্পূর্ণ কুরআনটা অর্থ বুঝে ব্যাখ্যাসহ পড়েছি, সহীহ হাদীসগ্রন্থগুলো পড়েছি। আল্লাহ বলেছেন, কুরআন মানুষের জন্যে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান (complete code of conduct for life) অর্থাৎ আমাদের জীবন পরিচালনার গাইডলাইন।

- আফসোস, সারা জীবন শুধু কুরআন তিলাওয়াতই করে গেলাম কিন্তু কিছুই বুঝলাম না! আর যদি কুরআন নাই বুঝি তাহলে আল্লাহর দেয়া জীবন পরিচালনা করব কিভাবে?

- আমাদের সকলের মধ্যে একটা ভুল ধারণা সবসময় কাজ করে যে, যারা কুরআন-হাদীস নিয়ে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন শুধু তারাই ইসলাম চর্চা করবেন এবং এই বিষয়টা শুধু তাদের জন্যই। আমরা যদি উন্নত বিশ্বের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যায় যে, হাজার হাজার ইসলামিক স্কলার

ইউরোপ, আমেরিকা, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকায় দ্বীন ইসলামের কাজ করে যাচ্ছেন যাদের মাদ্রাসার কোন ড্রিগ্রি নাই অথচ তারা এককে জন বিভিন্ন বিষয়ের উপর ডক্টরেট। এদের আহ্বানে হাজার হাজার নন-মুসলিম ইসলাম গ্রহণ করছেন।

- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকটি মুসলিম নরনারীর জন্য ফরয (ইবনে মাজাহ ও বাইহাকী)। ঈমানের অন্যতম দাবী হলো দ্বীনের জ্ঞানার্জন করা। আমার যদি নূন্যতম জ্ঞানই না থাকে তাহলে কিভাবে নিজ পরিবারকে দ্বীনের আলোকে গাইড করবো? কিভাবে সন্তানদের অন্তরকে সামান্য হলেও দ্বীনের আলোয় আলোকিত করবো? যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমার ভাসাভাসা আর আবোলতাবোল দ্বীনি জ্ঞান দিয়ে উঠতি বয়সের সন্তানদের আর বুঝ দেয়া যাবে না। তারা এখন লজিক চায়, তারা দ্বীনের ইনটেলেকচুয়াল ব্যাখ্যা চায়।

ভুল ইসলাম চর্চার প্রভাব

- ইবলীস শয়তানের পলিসি হচ্ছে মুসলিমদেরকে কুরআনের সঠিক শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে না দেয়া। কারণ আমি যদি কুরআন বুঝে সেই অনুযায়ী আমার জীবন পরিচালনা করতে থাকি তাহলে সেখানেই ইবলীস শয়তানের ব্যর্থতা।

- তাই শয়তান সুকৌশলে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য বেছে নিয়েছে কুরআনকেই কিন্তু ভিন্ন উপায়ে। যেমন ঃ খুব সহজে কিভাবে কিছু দু'আ-দুরূদ পড়ে জান্নাত লাভ করা যাবে, কোন্ দু'আ কত হাজার বার পড়লে কী হবে, কোন্ আয়াত জাফরান দিয়ে লিখে পেটে বেঁধে রাখলে বাচ্চা হবে, কোন্ দু'আ পড়ে চাল পড়া দিয়ে চোর ধরা যাবে, কোন্ আয়াত লিখে বালিশের নিচে রেখে ঘুমালে প্রেমিকাকে পাওয়া যাবে, কোন্ দুরূদ কাগজে লিখে পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেলে রোগ মুক্তি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরনের আমলের কোন সহীহ দলিল কুরআন বা সহীহ হাদীসে নেই। বাজারে এই ধরনের অনেক বই-ই পাওয়া যায়, যেমন ঃ মক্বছুদুল মোমিনীন, বেহেশতের পথ, নেয়ামুল কুরআন, আমলে নাজাত, আমালে কুরআন, সোলেমানী খাবনামা, নূরানী মজমুয়ায়ে পাঞ্জেগানা অজিফা, ফাজায়েলে

আমল, বেহেশতী জেওর ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই এই ধরনের ভিত্তিহীন বই-পত্র, অজিফা এবং মানুষের বানানো দুরূদ হতে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

- ইবলীস শয়তান আমাদের সহজে অনেক সওয়াব অর্জন করা যায় এমন আমলের লোভ দেখায়, জান্নাতে যাওয়ার শর্টকাট রাস্তা দেখায়। সে বলে এই দু'আ ৪০ বার পড়লে ৮০ বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, ঐ দুরূদ এতোবার পড়লে ১ লক্ষ ফিরিশতা কিয়ামত পর্যন্ত দু'আ করতে থাকে। এ কথা শুনে আমরা বলি 'সুবহানাল্লাহ', এর ফজিলত এতো!
- এসব সহজে অর্জিত ফযিলতের মিথ্যা আশ্বাসের কারণে গুনাহের প্রতি মানুষের ভয় কমে যাচ্ছে, ফলে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। তখন মানুষ মনে করে ২-৫ টা গুনাহ করলে কী আর ক্ষতি হবে? অমুক দু'আ পড়লে তো ৮০ বছরের গুনাহ মাফ হয়েই যাবে। এভাবে শয়তান অসচেতন লোকদেরকে তথাকথিত সহজ আমলের মাধ্যমে অর্জিত অফুরন্ত সওয়াবের লোভ দেখিয়ে ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।
- মনে রাখতে হবে, আমি আমার জীবনে ইবাদত মনে করে যা কিছু করবো তা কুরআন অথবা সহীহ হাদীসে অবশ্যই থাকতে হবে। কেউ যদি আমাকে কোন স্পেশাল দু'আ-দুরূদ বা কোন মহাপূণ্যের আমলও শিখিয়ে দেয় তাহলে অবশ্যই তার authentic দলিল চাইতে হবে অথবা আমি নিজে কুরআন ও সহীহ হাদীস ঘেঁটে তা অবশ্যই যাচাই করে নেবো। বাজারে দু'আ-দুরূদ এর যেসব বইপত্র পাওয়া যায় তার মধ্যে বেশীর ভাগই সহি (authentic) নয় অর্থাৎ কুরআন-হাদীস দ্বারা সমর্থিত নয়।

ভুলে ভরা তথাকথিত ইসলামি সাহিত্যের প্রভাব

- ভুল শিক্ষা, বানোয়াট গল্প কাহিনী মানুষকে সহজেই পথভ্রষ্ট করে। ইসলামের উপর বাজারে অনেক বই-ই পাওয়া যায় যাতে মানুষের মধ্যে আবেগ (জজ্‌বা) সৃষ্টির জন্য এমন সব কথা তুলে ধরা হয়েছে যা সত্য নয়, যা কুরআন-হাদীসের আলোকে গ্রহণযোগ্য নয়।
- কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে কোন ইসলাম নেই। কারামত ও সাজানো মজাদার গল্প-কাহিনী মানুষকে বিমোহিত করে ঠিকই কিন্তু তাতে অনেক সময় সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু ইসলাম-বিরোধী শক্তি

মুসলিমগণকে কুরআন ও হাদীস দিয়েই ঘায়েল করার জন্য কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা ও অসংখ্য মিথ্যা হাদীস ও গল্প বেশী ফায়েদার লালসা দেখিয়ে মুসলিম সমাজে ঢুকিয়ে দিয়েছে সেহেতু আমাদের প্রত্যেকের আরো বেশী সচেতন হওয়া উচিৎ। বিশেষ করে আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.), মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.), ইমাম গাজ্জালী (রহ.), রূমী (রহ.), বায়েজীদ বোস্তামী (রহ.), শাহজালাল (রহ.), শাহপরাণ (রহ.) প্রমুখ ব্যক্তিদের নামে বাজারে নানা রকম কারামত সম্বলিত গল্পের বই পাওয়া যায় যা সত্য নয় এবং তাঁদের সঠিক জীবনীর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আর এই ধরনের বানানো গল্প কিচ্ছা-কাহিনী বিশ্বাস করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। ['কারামত' কথাটা ফার্সি যার অর্থ অলৌকিকতা, অসাধারণ শক্তি।]

- বাংলাদেশে ইসলামকে সহজ ভাষায় উপস্থাপন না করে এটাকে ভিনদেশী কায়দায় বিকশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। মাওলানারা তাদের বয়ানে ঘনঘন উচ্চারণ করেন আরবি-ফার্সি ও উর্দু শব্দ, ভাষা ও কবিতা যা আমাদের সাধারণ লোকেরা বুঝেন না, এসব বলে তারা পান্ডিত্য জাহির করেন, শ্রোতারা চমৎকৃত হয়। যেহেতু কুরআনের ভাষা আরবী ও এদেশের মানুষের ভাষা বাংলা, তাই আরবী ও বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় ইসলাম প্রচার বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হতে পারে ইংরেজী যা আজকাল অনেক শিশুর মাতৃভাষায় পরিণত হয়েছে।

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট সাহায্য চাওয়া

- একটা কথা সব সময় স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে মহান আল্লাহ ছাড়া কারো কিছু করার বা দেয়ার ক্ষমতা নেই, তার জীবনকালে তিনি যতো বড় ওলি বা বুজুর্গই হোক না কেন। আমার ভাগ্যের পরিবর্তন, যেমন ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, প্রোমোশন, সন্তান-সন্ততি, বাড়ি-গাড়ি, রোগ-মুক্তি, আয়-উন্নতি, ব্যাংক ব্যাল্যান্স, ফসলের উন্নতি, পরীক্ষায় ভাল রিজাল্টস, স্বামী-স্ত্রীর মিল, বিদেশ গমন ইত্যাদি কোন পীর-মুর্শিদ বা কোন মাজার দিতে পারবে না। আর আমি যদি গায়রুল্লাহর (আল্লাহ বাদে অন্যকেউ) কাছে কোন কিছু পাওয়ার আশায় কোথাও যাই তাহলে সেটা হবে সরাসরি আল্লাহর সাথে শিরক।

- আমার যা কিছু চাওয়ার সরাসরি আল্লাহর কাছে চাইব এবং ইন্‌শাআল্লাহ, আমার জন্য যা সবচেয়ে উত্তম ও কল্যাণকর, সেটাই আল্লাহ আমাকে দেবেন। এখানেই খাঁটি ঈমানের পরীক্ষা।

দেয়ালে ছবি টাঙানো এবং শোকেসে মূর্তি রাখা

- আমরা অনেকে ঘরের দেয়ালে নানা রকম ছবি ফ্রেমে বাঁধাই করে ঝুলিয়ে রাখি। যেমন ঃ বিয়ের ছবি, নিজ পিতা-মাতার ছবি, পারিবারিক ছবি, রবীন্দ্র-নজরুল, নেতা-নেত্রীর ছবি, পীরের ছবি, বিভিন্ন স্টারদের ছবি বা পশু-পাখির ছবি ইত্যাদি। আবার অনেকে আর্ট-কালচারের নামে শোপীস হিসাবে ঘরে নানা রকম মূর্তিও রাখে। মনে রাখতে হবে ঘরে যে কোন ধরনের মূর্তি এবং কোন প্রাণীর ছবিই রাখা নিষেধ/হারাম। কারণ যে ঘরে ছবি এবং মূর্তি থাকে সে ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করে না। আমি কি চাই না যে আমার ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করুক?
- রাস্তার মোড়ে মোড়ে মূর্তি তৈরী করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে মূর্তি তৈরী করা, বিনা প্রয়োজননে ছবি তোলা বা ভিডিও করা ইত্যাদিও বড় গুনাহ।
- যে দেশে মুসলিমদের ঘরে ঘরে শিরক হচ্ছে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে শিরক হচ্ছে সেখানে অশান্তি ছাড়া আল্লাহর রহমত তো থাকার কথা না। এসবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে সন্তানরা ইসলাম থেকে এমনিতেই দূরে সরে যাবে।

ভুল-ভ্রান্তিতে পূর্ণ জীবন

- আমরা বিভিন্ন রকম ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে জীবন কাটাচ্ছি, ছোট একটা উদাহরণ হলো বিয়ের অনুষ্ঠান। আজকাল আমাদের মুসলিমদের বিয়ের অনুষ্ঠানের অনেক কিছুই সম্পন্ন হয় হিন্দুদের রীতিতে। কিছু রীতি আছে যা একেবারেই ইসলাম পরিপন্থী।

১) গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে ছেলেমেয়েদের একত্র আনন্দ ফুর্তি করা।

২) পরিশোধ না করার নিয়তে বড় অংকের মোহরানা ধার্য্য করা।

৩) বিয়ের আগেই বর-কনের অবাধ অবৈধ মেলামেশা।

৪) পাত্রের পুরুষ আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক পাত্রী দেখা।

৫) মুখে স্বামীর নাম না নেয়া।

৬) বিয়েতে 'উকিল বাবা' নিয়োগ একটা সম্পূর্ণ ইসলাম-বিরোধী প্রথা। প্রকৃত বাবা একজনই, অন্য কাউকে বাবা বানানো যাবে না। উকিল বাবার নিকট পর্দাও ফরয।

৭) বিবাহ বার্ষিকী বা Marriage anniversary পালন করা।

৮) মৃত স্বামীর এবং মৃত স্ত্রীর মুখ না দেখা।

কুসংস্কারে বিশ্বাস করা ও শুভ-অশুভ মেনে চলা শিরক

আমাদের জীবনে আজ আল্লাহ ও রসূল (সা.)-এর আদেশ-নিষেধ দিয়ে নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছু কুসংস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

১) শনির দশা অর্থাৎ শনিবার অলক্ষুণে দিন এবং এই দিনে কোন কাজ শুরু না করা।

২) ঘর থেকে বাইরে বের হওয়ার সময় কেউ হাঁচি দিলে সাথে সাথে বের না হওয়া, একটু পরে বের হওয়া।

৩) ঘর থেকে বাইরে বের হওয়ার সময় পায়ের সাথে হোঁচট খেলে সাথে সাথে বের না হওয়া, একটু বসে তার পরে বের হওয়া।

৪) ১৩ সংখ্যাকে অশুভ বা unlucky thirteen মনে করা শিরক।

৫) ভর দুপুরে কাকের কা কা ডাক শুনে বিপদ সংকেত মনে করা।

৬) বাইরে যাওয়ার সময় ঝাঁড়ু দেখলে অশুভ মনে করা।

৭) কোন কাজ ঠিক মতো না হলে আজকের দিনটিই কুফা (অশুভ) এই ধরনের মনে করা।

৮) অনেকে নিজেকে নিজে গালি দেয় যেমন 'আমার ভাগ্যটাই খারাপ' বা 'আমার কপালটাই মন্দ'।

৯) বরকতের আশায় ব্যবসার ক্যাশ বাক্সে হলুদের টুকরা এবং কড়ি (এক ধরনের ঝিনুক) রাখা।

১০) বরকতের আশায় দোকান খোলার শুরুতে সোনা-রূপার পানি ছিটানো বা তুলসি পাতার পানি ছিটানো এবং আগরবাতি জ্বালানো।

১১) ব্যবসার শুরুতে প্রথম কাষ্টমারের কাছে বিক্রি করতেই হবে এই ধরনের মনে করা।

১২) বরকতের আশায় ব্যবসার শুরুতে মিলাদ দেয়া অথবা কোন মাজারে যাওয়া।

১৩) কেউ গাড়ি কিনলে বা গাড়ির ব্যবসা শুরু করলে ঐ গাড়িটি পীরের দরবারে নিয়ে যাওয়া অথবা কোন মাজারে নিয়ে যাওয়া।

১৪) এক্সিডেন্ট থেকে রক্ষা পাবার আশায় গাড়ির লুকিং গ্লাসে বিভিন্ন কুরআনের আয়াত ঝুলানো, কাবা ঘরের ছবি ঝুলানো, তসবি ঝুলানো ইত্যাদি। (খ্রীষ্টানরা যেমন তসবি ও ক্রস ঝুলায়)

১৫) কালো বিড়াল বা এক পাওয়ালা পশু-পাখি দেখলে অশুভ মনে করা।

১৬) আয়না ভাঙ্গা বা তেল পড়ে গেলে বা লবনের বাটি উল্টে পড়া অশুভ সংকেত মনে করা।

১৭) এটা বিশ্বাস করা যে কোন কোন মহিলা দুর্ভাগ্য বয়ে আনে (অলক্ষুণে)।

১৮) টেরা চোখের মেয়েলোক লক্ষী বা অলক্ষী এরকম মনে করা।

১৯) পাথরে ভাগ্য পরিবর্তন হয় এই ধরনের বিশ্বাস থাকা।

২০) পাথরে নানা রকম বিপদ কেটে যায়, এই ধরনের বিশ্বাস থাকা। এবং গায়ে সেসব পাথরের আংটি অথবা মাদুলি ধারণ করা।

২১) শনিবার নতুন বউকে মায়ের বাড়িতে যেতে না দেয়া।

২২) রবিবার ও বৃহস্পতিবার বাঁশ ঝাড় না কাটা।

২৩) মঙ্গলবার কোন আত্মীয় মারা গেলে উক্ত বারেই তিনজন আত্মীয় মরে যাবে ধারণা করা ইত্যাদি।

২৪) মৃত ব্যক্তির রূহ চল্লিশদিন পর্যন্ত বাড়িতে আসে বিশ্বাস রাখা।

২৫) জ্যোতিষের কাছে ভবিষ্যত জানতে যাওয়া (ভবিষ্যত জ্ঞান আছে একমাত্র আল্লাহর)

বিয়ে নিয়ে নানারকম কুসংস্কারে বিশ্বাস করার প্রভাব

১. চৈত্র মাসে বিয়ে করা যাবে না এই মাস অশুভ। এই কুসংস্কার হিন্দুদের থেকে এসেছে।

২. মহরম মাসে বিয়ে-শাদী নিষেধ, এই মাস শোকের মাস। এই ধরনের কুসংস্কার শিয়াদের থেকে এসেছে।

৩. শনিবারে বিয়ে করা যাবে না, শনিবার অশুভ, এই ধরনের বিশ্বাস কুসংস্কার।

৪. বিয়ের দিন ধান-ঘাস দিয়ে বধুবরণ করা এবং দুধের উপর দিয়ে বরকনে হেটে যাওয়া। মনে রাখবেন এসব হিন্দুদের রীতি।

৫. বিয়ের কাবিনে এক লক্ষ এক টাকা ধার্য্য করা অর্থাৎ মূল অংকের সাথে এক টাকা সংযুক্ত করতেই হবে এটা মনে করা কুসংস্কার।

অন্যান্য কুসংস্কার অনুসরণ করার প্রভাব

১. কারো কথা স্মরণের সাথে সাথে সে উপস্থিত হলে তার দীর্ঘ হায়াত আছে বলা।

২. খাওয়ার সময় গলায় আটকে গেলে (hiccup) আসলে অন্যকেউ তাকে মনে করেছে এটা মনে করা।

৩. মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখে অবশ্যই বৃষ্টি আসবে বলা।

৪. ঘুম থেকে উঠে অপয়া বলে বিশেষ কারো মুখ না দেখা।

৫. কারো বা কোন কিছু দ্বারা বারবার বাধাগ্রস্ত হলে কুফা বলা।

৬. বাজী ধরা। লটারী খেলা। বা লটারীর টিকেট কেনা।

৭. পেঁচা ডাকলে বিপদ আসন্ন মনে করা।

৮. ক্লাশরুমে শিক্ষক প্রবেশ করলে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য উঠে দাঁড়ানো ইত্যাদি।

৯. ছোট বাচ্চারা নতুন হাঁটা শিখতে শুরু করলে তার উপর দিয়ে বিভিন্ন ফল, পিঠা ছোট ছোট টুকরো করে ঘরে বা বারান্দায় ফেলা। এরূপ করলে বাচ্চারা তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারবে বলে মনে করা।

১০. নজর লাগবে বলে কপালে বা পায়ে কাজলের ফোঁটা দেয়া।

১১. ছোট বাচ্চাদের নতুন দাঁত উঠলে যে প্রথমে দেখবে তাদের সবাইকে পায়েস বা মিষ্টি খাওয়াতে হবে মনে করা।

১২. বাচ্চারা যদি ঘর বা বারান্দা ঝাড় দেয় তাহলে মেহমান আসবে বলে মনে করা।

১৩. বাচ্চাদের গায়ে লাঠি বা ঝাড়ুর ছোঁয়া লাগলে জ্বর আসবে বলে মনে করা এবং পায়ে পানি ছিটিয়ে দেয়া।

১৪. ভয় পেলে লবণ পানি খাওয়ানো বা বুকের মধ্যে থুতু দেয়া।

১৫. বাচ্চাদের টপকিয়ে বা ডিঙিয়ে গেলে আর বড় হবে না মনে করা।

ইসলাম শুভ-অশুভ এই প্রথাগুলি বাতিল করেছে কারণ এগুলি তাওহীদ আল-আসমা-সিফাত এর ভিত ক্ষয় করে ফেলে এবং মানুষকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য শক্তিতে বিশ্বাস করতে শিখায়। কারণ এই প্রথাগুলি ঃ

১) একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা (তাওয়াক্কুল) বাদ দিয়ে মানুষকে অন্য কোন মানুষ বা শক্তির (গায়রুল্লাহ) উপর নির্ভর করতে শেখায়

২) ভাল-মন্দ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করার এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়তি এড়ানোর ক্ষমতা মানুষের অথবা সৃষ্ট জিনিষের (গায়রুল্লাহ) আছে একথা মনে করা এবং নিয়তি পরিবর্তন করতে এদের উপর নির্ভর করতে শেখায়।

সুতরাং তাওহীদের সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে শুভ-অশুভ সংকেত বিশ্বাস সুস্পষ্ট শিরকের শ্রেণীভুক্ত। সূরা আল-হাদীদ এর ২২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

"পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি উহা সংঘটিত করার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে।"

তাবিজ-কবচের উপর নির্ভর করার প্রভাব

- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআনের আয়াত নিজের শরীরে রেখেছেন বা অন্যকে রাখার অনুমতি দিয়েছেন বলে হাদীসের কোথাও কোন দলিল নেই। কুরআনীয় তাবিজ-কবচ শরীরে রাখা এবং রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক বর্ণিত শয়তান এড়ানো এবং বান ও যাদু ভেঙ্গে ফেলার পদ্ধতি পরস্পর বিরোধী। যাদু থেকে বেঁচে থাকার জন্য সূরা ফালাক ও নাস পড়ার অনুমতি রয়েছে।

বিদ'আত পালন করার প্রভাব

- বিদ'আত কথাটা আমরা সবাই হয়তো শুনেছি কিন্তু এর অর্থ কি আমরা জানি?
- যে সব ধরনের কাজ বা অনুষ্ঠান ইবাদত বা সওয়াবের কাজ বলে কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা স্বীকৃত নয়, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে যা কখনো করেননি বা কাউকে কখনো করতে বলেননি, তাঁর সাহাবাদের সময়ও তা ইবাদত হিসেবে প্রচলিত ছিলোনা এমন সব কাজ বা অনুষ্ঠানাদি সওয়াবের উদ্দ্যেশে পালন করার নামই বিদ'আত।
- বিদ'আত বলতে বুঝায় দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন আনা।
- আমরা বাংলাদেশের মুসলিমরা ইসলামে যা আছে তা ঠিক মতো পালন না করে ইসলামে যা নেই তা খুব সওয়াবের কাজ মনে করে পালন করে যাচ্ছি। যেমন ঃ

    ১) ঈদে মিলাদুন্নবী দিবস পালন করা।

    ২) মিলাদের মাহফিল করা।

    ৩) শবে বরাতকে ভাগ্য রজনী মনে করে এ রাত্রি পালন করা। (এটার কোন সহীহ ভিত্তি নেই)

    ৪) শবে মিরাজ দিবস পালন করা।

    ৫) ওরছ করা, ইছালে সওয়াবের মাহফিল করা।

৬) মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা ।

৭) মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কুলখানি, চল্লিশা অথবা চেহলাম করা ।

৮) মৃত ব্যক্তিকে সামনে নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করা ।

৯) মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জিয়াফত, কুরআনখানি, ইছালে সওয়াব অনুষ্ঠান করা ।

১০) মৃত ব্যক্তির উপর সূরা ইয়াসীন পাঠ করা ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সৃষ্টাকে ভুলে যাওয়া

অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও তারা মুশরিক (সূরা ইউসুফ ঃ ১০৬)

বিশেষ নোট ঃ ব্যক্তিগতভাবে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে কাফির, মুশরিক বা মুরতাদ বলা যাবে না। কে কাফির অথবা কে মুশরিক সেই সিদ্ধান্ত দেবার অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার। তবে ইসলামি সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে বা কোন কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বা ফতোয়া বোর্ড এই ধরনের ঘোষণা দিতে পারে। এছাড়া কে জান্নাতী অথবা কে জাহান্নামী তাও নির্ধারন করার মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলা।

মুশরিক সেইসব লোকদের বলা হয় যারা ইবাদতের ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান আল্লাহর একচ্ছত্র অধিকারের, তাঁর নামের, অথবা তাঁর গুণাবলীর সংগে (অর্থাৎ আল্লাহর এককত্ব বা তাওহীদের সংগে) অন্য কোন ব্যক্তি, বস্তু অথবা ধারণা-মতবাদকে অংশীদার (শরীক) সাব্যস্ত করে সেসবের ইবাদত, পূজা বা অনুসরণ করে ।

তাঁর কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন-

১) (হে নবী) আপনি যদি অধিকাংশ লোকের কথা মানেন, তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করে দেবে। কেননা তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণার অনুকরণ করে এবং অনুমান করে কথা বলে। নিশ্চয়ই আপনার প্রভু সবচাইতে বেশী জানেন, কারা আল্লাহর পথ

হতে গোমরাহ হয়েছে এবং তিনিই অধিক জানেন কারা হিদায়াতপ্রাপ্ত বা সঠিক পথে আছে। (সূরা আল-আনআম ঃ ১১৬-১১৭)

২) (হে নবী) আপনি যতই আকাঙ্খা করেন না কেন (আপনার কাথার প্রতি) অধিকাংশ লোকই ঈমান আনবে না। (সূরা ইউসূফ ঃ ১০৩)

৩) অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেও তারা মুশরিক। (সূরা ইউসূফ ঃ ১০৬)

৪) আলিফ-লাম-মীম-র; এগুলো কিতাবের আয়াত। যা কিছু আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না। (সূরা আর-রা'দ ঃ ১)

৫) বরং অধিকাংশ লোক জ্ঞানহীন (অজ্ঞ)। (সূরা আন নামল ঃ ৬১; সূরা ইউনুস ঃ ৫৫; সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৩১; সূরা আত-তূর ঃ ৪৭, সূরা আয যুমার ঃ ২৯, ৪৯; সূরা লুকমান ঃ ২৫, সূরা আনআম ঃ ৩৭; সূরা কাসাস ঃ ১৩, ৫৭)

৬) আপনার পালনকর্তা মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (সূরা আন নামল ঃ ৭৩; সূরা ইউনুস ঃ ৬০)

৭) নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (সূরা আশ শুয়ারা ঃ ৮, ৬৭, ১০৩, ১২১, ১৩৯, ১৫৮, ১৭৪, ১৯০)

৮) তাদের পূর্বে অগ্রবর্তীদের অধিকাংশ পথভ্রষ্ট ছিল। (সূরা আস সাফফাত ঃ ৭১)

৯) বরং তাদের অধিকাংশ লোকই সত্যকে জানে না; অতএব তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা আম্বিয়া ঃ ২৪)

১০) বরং তিনি তাদের নিকট সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশ লোক সত্যকে অপছন্দ করে। (সূরা মু'মিনূন ঃ ৭০)

১১) এটা একটি কিতাব। এর আয়াতসমূহ আরবী কুরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। অতঃপর তাদের অধিকাংশ লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ফলে তারা শুনেও না। (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ ৩-৪)

১২) আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ লোক শোনে অথবা বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং আরও অধিক পথভ্রান্ত। (সূরা ফুরকান ঃ ৪৪)

১৩) আর আমি এই পানি তাদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে তারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই করে না। (সূরা ফুরকান ঃ ৫০)

১৪) তারা তো শয়তানের কথা শোনে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। (সূরা আশ শুয়ারা ঃ ২২১-২২৩)

১৫) কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (সূরা ইউসুফ ঃ ৩৮)

১৬) কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জ্ঞানহীন। (সূরা আনফাল ঃ ৩৪; সূরা দুখান ঃ ৩৯; সূরা জাসিয়াহ ঃ ২৬; সূরা আন নাহল ঃ ৩৮, ৭৫, ১০১; সূরা আর রূম ঃ ৬, ৩০; সূরা ইউসুফ ঃ ২১, ৪০, ৬৮; সূরা সাবা ঃ ২৮, ৩৬; সূরা মু'মিন ঃ ৫৭)

১৭) তারা আল্লাহর নিয়ামাত বা অনুগ্রহ চিনে, এরপর তারা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই কাফির। (সূরা আন নাহল ঃ ৮৩)

১৮) কিন্তু অধিকাংশ লোকই ঈমানদার না। (সূরা হুদ ঃ ১৭; সূরা আল আরাফ ঃ ১৮৭)

১৯) আর তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ-অনুমানের উপর চলে, অথচ আন্দাজ-অনুমান সত্যের মুকাবেলায় কোন কাজেই আসে না। (সূরা ইউনুস ঃ ৩৬)

২০) আপনি তাদের অধিকাংশ লোককে কৃতজ্ঞ পাবেন না। (সূরা আল আরাফ ঃ ১৭)

২১) তাদের অধিকাংশই বিবেকবুদ্ধি নেই। (সূরা মায়িদা ঃ ১০৩; সূরা আনকাবুত ঃ ৬৩)

২২) আর তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক। (সূরা মায়িদা ঃ ৫৯; সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০; সূরা তাওবা ঃ ৮)

২৩) নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক শুকরিয়া প্রকাশ করে না। (সূরা বাকারা ঃ ২৪৩; সূরা মু'মিন ঃ ৬১; সূরা ইউনুস ঃ ৬০)

২৪) যে দিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং ফিরিশতাদেরকে বলবেন ঃ এরা কি তোমাদেরই ইবাদত বা পূজা করত? ফিরিশতারা বলবে, আপনি পবিত্র আমরা আপনার পক্ষে, তাদের পক্ষে নই, বরং তারা জ্বিনদের পূজা করত। তাদের অধিকাংশই শাইতানে বিশ্বাসী। (সূরা আস সাবা ঃ ৪০-৪১)

২৫) তাদের অধিকাংশের জন্য শাস্তির বিষয় অবধারিত হয়েছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (সূরা ইয়াসিন ঃ ৭)

২৬) আমি তোমাদের কাছে সত্য ধর্ম পৌঁছিয়েছি, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই হাক্বকে (সত্যকে) অপছন্দ করে। (সূরা আয যুখরুফ ঃ ৭৮)

২৭) আমি এই কুরআনে মানুষকে বিভিন্ন উপকার দ্বারা সব রকম বিষয়বস্তু বুঝিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই অস্বীকার না করে থাকেনি। (সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ৮৯)

২৮) আমি আপনার প্রতি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেছি। অবাধ্যরা ব্যতীত কেউ এগুলো অস্বীকার করে না। কি আশ্চর্য! যখন তারা কোন অঙ্গীকার-চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন তাদের একদল চুক্তিপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে। বরং তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমানদার নয়। (সূরা বাকারা ঃ ৯৯-১০০)

২৯) কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই মূর্খ। (সূরা আন'আম ঃ ১১১)

৩০) আর তাদের অধিকাংশ লোককেই আমি প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নকারী রূপে পাইনি, বরং তাদের অধিকাংশ লোককে ফাসিক বা হুকুম অমান্যকারী পেয়েছি। (সূরা আরাফ ঃ ১০২)

৩১) তাদের অধিকাংশ লোকই মুশরিক ছিল। (সূরা আর রূম ঃ ৪২)

৩২) মানুষের মধ্যে অনেক লোকই ফাসিক। (সূরা মায়িদা ঃ ৪৯)

উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যেও মুশরিক আছে!

শিরক এমন এক মহামারী পাপ যা সকল নবীর উম্মাতের মধ্যে কিছু কিছু ছিল। তা শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মাতদেরকেও ছাড়বে না। যার বাস্তবতা অহরহ দেখা যাচ্ছে। অনেক লোক ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক।

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার উম্মাতের কিছূ গোত্র মুশরিকদের সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এবং কিছু গোত্র মূর্তি পূজা না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। (আবু দাউদ)।

আসুন আমরা যে সব শিরক জেনে কিংবা না জেনে সব সময় করে থাকি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি।

- **পীর-দরবেশ, ওলী-আওলিয়া এবং কবরে শায়িত ব্যক্তির নিকট দু'আ করার মাধ্যমে শিরক করে আমরা মুশরিক হয়ে যাচ্ছি!**

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে না, যে তোমার উপকার করতে পারবে না ও অপকারও করতে পারবে না। যদি তুমি অন্যকে ডাক তাহলে তখন তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (সূরা ইউনুস ঃ ১০৬)

- **কারো ইলমে গায়িব (অদৃশ্য জ্ঞান) জানা আছে এ দাবী করার মাধ্যমে শিরক করা**

হে নবী বলে দিন, আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সে গায়েবের খবর কেউ-ই জানে না। (সূরা আন্-নামাল ঃ ৬৫)

- **মাজার বা কবরের নিকট সমাবেশ, ওরস, মেলা, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি জ্বালানোর মাধ্যমে শিরক করা**

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারা যারা শেষ দিনে (কেয়ামতের আগে) জীবিত থাকবে এবং যারা কবরকে ইবাদতের স্থান করে নেবে। (আহমদ, আত-তাইয়ালাসী)

- **পীর-দরবেশ, অলী-আউলিয়ার কুরআন ও সুন্নাহবিরোধী কথা মানার মাধ্যমে শিরক করা**

তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অলী-আউলিয়াদের অনুসরণ করো না। তোমরা অল্পসংখ্যক লোকই তা স্মরণ রাখ। (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৩)

- **অসুখ, বালা-মুসীবতে তাবীজ-কবজ, বালা-চুরি ইত্যাদি ব্যবহার করার মাধ্যমে শিরক করা**

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ এবং যাদুটোনা করা শিরক। (আবু দাউদ)

- **কবর পাকা করা বা বাঁধানো, কবরে লিখা, গম্বুজ তৈরী করা এবং বাতি জ্বালানো হারাম**

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবর চুনকাম অর্থাৎ - পাকা করতে, কবরের উপর বসতে এবং কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ মুসলিম)

- **কবর, মাযার, দরগা, খানকা ইত্যাদিতে দান বা ভোগ দেয়ার মাধ্যমে শিরক করা (মুসনাদে আহমাদ)**

- **গাছে সুতা বাঁধা, গজার মাছ-কচ্ছপ ইত্যাদিকে খাওয়ানোর মাধ্যমে কিছু পাওয়ার আশা করে শিরক করা (তিরমিযী)**

- **কোন ওলী বা পীরের অসীলা অন্বেষণ করা এবং পীর ধরা নাযায়েজ**

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো; তার নিকট অসীলা অন্বেষণ কর এবং তার পথে জিহাদ কর। যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা মায়িদা ঃ ৩৫)

- **তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণ, পূর্ববর্তীদের দোহাই বাপ-দাদার দোহাই দেয়া মুশরিকের নীতি**

যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তাঁর অনুকরণ কর। তখন তারা বলে ঃ বরং আমরা তো সে বিষয়েরই অনুকরণ করব যে বিষয়ে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জ্ঞান রাখেতো না এবং তারা সঠিক পথপ্রাপ্তও ছিল না। (সূরা বাকারা ঃ ১৭০)

- **আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ (গাইরুল্লাহ) তথা পীর, আওলিয়া ও দরগায় পশু যবেহ করার মাধ্যমে শিরক করা**

হে নাবী! আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার সলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সককিছুই কেবলমাত্র সমগ্রবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি (কোন রূপ শরীক না করার জন্যই) আদিষ্ট হয়েছি এবং মুসলিমদের মধ্যে আমিই প্রথম। (সূরা আন'আম ঃ ১৬২-১৬৩)

- **কবরবাসী জীবিতদের ডাকে সাড়া দিতে অক্ষম একথা বিশ্বাস করা শিরক**
  আপনি কবরে শায়িত ব্যক্তিদেরকে শোনাতে পারবেন না। (সূরা নামল ঃ ৮০; সূরা রূম ঃ ৫২; সূরা ফাতির ঃ ২২)

- **গণকের নিকট যাওয়া, গণকের কথা বিশ্বাস করা শিরক**

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গণকের নিকট আসে এবং তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে এবং তা বিশ্বাস করে তার চল্লিশ দিনের ইবাদত কবুল হয় না। (সহীহ মুসলিম)

- **রিয়া বা লোক দেখানো 'আমাল করা শিরক**

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের জন্য আমি সবচেয়ে অধিক ভয় করি শিরকে আসগার বা ছোট শিরকের। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রসূল, সেটা কি? তিনি বললেন ঃ রিয়া বা লোক দেখানো 'আমাল। (বায়হাকী, আহমাদ)

- **যুগ বা সময়কে গালি দেয়া শিরক**

মহান আল্লাহ বলেন ঃ "আদম সন্তান দাহার বা সময়কে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়। অথচ আমি নিজেই দাহার বা সময়। আমার হাতেই সকল কর্ম। রাত ও দিনকে আমিই পরিবর্তন করি। (সহীহ বুখারী)

- **মূর্তি বানানো শিরকী কাজ**

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "ঐ ব্যক্তির থেকে কে বড় যালিম হতে পারে, যে আমার মত মাখলুক সৃষ্টি করতে চায়? (এতই যদি পারে) তাহলে তারা যেন অণু সৃষ্টি করে অথবা একটি শস্য তৈরী করে অথবা যেন একটি যব তৈরী করে।" (সহীহ বুখারী)

- **(ইচ্ছা করে) সলাত (নামায) পরিত্যাগ করা শিরক**

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, মুসলিম ব্যক্তি এবং মুশরিক ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হল সলাত পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ সলাত পরিত্যাগকারী মুশরিক ও কাফির। (সহীহ মুসলিম)

- **নানা রকম গানের মাধ্যমে শিরক**

মারেফতী, মরমী, নজরুলগীতি, রবীন্দ্র সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক, পল্লীগীতি, লালন গীতি, ব্যান্ড সঙ্গীত এমনকি কিছু কিছু হামদ ও নাতে রসূলে এমন অনেক কথাই আছে যা ইসলামের আকিদা-বিরোধী ।

ঈমান ও ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় সমূহ

আমাদের দেশে যে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে অযু ভঙ্গের কারণ জিজ্ঞেস করলে বলে দিতে পারবে, সবগুলো বলতে না পারলেও বেশীরভাগ কারণগুলো বলতে পারবে । আবার নামায ভঙ্গের কারণগুলো জিজ্ঞেস করলে তাও বলে দিতে পারবে, সবগুলো বলতে না পারলেও বেশীরভাগ কারণগুলোই বলতে পারবে । কিন্তু যদি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে কিছুই বলতে পারবে না । অথবা ইসলাম ভঙ্গের কারণসমূহ জিজ্ঞস করা হয় তাহলেও কিছুই বলতে পারবে না ।

এর কারণ হচ্ছে আমাদের সমাজে আকীদা শিক্ষার উপর তেমন গুরুত্ব নেই, শিক্ষার ব্যবস্থাও নেই এবং যাদের কাছ থেকে শিক্ষা পাওয়ার কথা তাদের কাছ থেকেও বেশী কিছু আশা করা যায় না । এছাড়া আমাদের দেশে মাদ্রাসায় মাসলা-মাসায়েল শিখানো হয় কিন্তু আকীদা বিষয়ে তেমন কিছু শিখানো হয় না । মাদ্রাসার সিলেবাসে মাসলা-মাসায়েলের উপর মোটা মোটা বই রয়েছে কিন্তু আকীদা বিষয়ে তেমন কোন বই নেই । যার কারণে আমাদের দেশের মানুষ আকীদা বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখে না । ঈমান ও ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ হচ্ছে আকীদা নির্ভর বিষয় । যে জ্ঞান না থাকলে ঈমান ও ইসলাম রক্ষা করা কঠিন । যে জ্ঞান না থাকলে মুসলিম হওয়া যায় না সেই জ্ঞানের খুব অভাব ।

যে শিক্ষা না থাকলে মুসলিম হওয়া যায় না, সে শিক্ষা হচ্ছে আকীদার শিক্ষা, বিশ্বাসের শিক্ষা, ঈমানের শিক্ষা, ঈমানের পরিপন্থি বিষয়ের শিক্ষা, শিরকের শিক্ষা, কুফরীর শিক্ষা । শিরকের শিক্ষাগ্রহণ এজন্য করতে হবে যে, শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হবে । কারণ যে শিরক করে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, আর আল্লাহ কোন দিন শিরকের গুনাহ মাপ করবেন না । আমাদের মুসলিম সমাজের ভিতরে অজ্ঞতার কারণে কোটি কোটি লোক শিরকে লিপ্ত ।

তাই এই শিরককে চিহ্নিত করতে হবে। বিদ'আতের জ্ঞান এজন্য অর্জন করতে হবে যে বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা সকল বান্দার উপর ইসলামে প্রবেশ করা, উহা আঁকড়ে ধরা এবং উহার পরিপন্থী বিষয় থেকে সতর্ক থাকা ফরয করেছেন। আর নবী মুহাম্মাদ (সা.)- কে সে দিকে আহবান করার জন্যই প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ এই মর্মে ঘোষণা দিয়ে বলেন, "যে ব্যক্তি নবী-র অনুসরণ করবে সে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে পক্ষান্তরে যে তাঁর থেকে বিমুখ হবে সে পথভ্রষ্ট হবে।" (সূরা নূর ঃ ৫৪)

আমাদেরকে জানতে হবে যে শুধু মুসলিম ঘরে জন্ম নিলেই মুসলিম হওয়া যায় না। বাবা মুসলিম, মা মুসলিম, তাই বলে আমিও মুসলিম বিষয়টা এতো সহজ নয়। প্রত্যেক শিশু মুসলিম হিসেবে জন্মগ্রহণ করে ঠিকই এবং নাবালক বয়স পর্যন্ত মুসলিম থাকে কিন্তু পরবর্তীতে তার মা-বাবা তাকে অমুসলিম বানায়। বড় হয়ে কেউ নাস্তিক হয়, কেউ সেকুলার হয়, কেউ, কমিউনিস্ট হয়, কেউ জাতিয়তাবাদী হয়, কেউ মুনাফিক হয়, কেউ জালিম হয়, কেউ কাফির হয়, কেউ পীর পুজারী হয়, কেউ মাজার পুজারী হয়, আবার কেউ মানব রচিত দল করে।

স্বাবালক-স্বাবালিকা হওয়ার পর যে নিজেকে ইসলাম ভঙ্গের একটি কারণের মধ্যেও আসতে দেয় না সেই শুধু মুসলিম থাকে; এছাড়া কেউ যদি ইসলাম ভঙ্গের কারণগুলোর মধ্যে একটি কারণও করে তাহলেই সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। ইসলাম থেকে একবার বেরিয়ে গেলে তাকে আবার মুসলিম হতে হবে। আকীদায় মুসলিম হতে হবে, বিশ্বাসে মুসলিম হতে হবে, কাজে-কর্মে, চলাফেরায় মুসলিম হতে হবে। মুসলিম কোন সম্প্রদায় বা জাতির নাম নয়, মুসলিম কোন গোষ্ঠির নাম নয়। মুসলিম নাম হচ্ছে আকীদা বিশ্বাস ও কর্মের। যার মধ্যে ইসলামি ঐ আকীদাগুলো থাকবে, আমলগুলো থাকবে যেগুলো মুসলিম হওয়ার জন্য আবশ্যক সেই সত্যিকার মুসলিম।

কী কী কারণে ঈমান ও ইসলাম নষ্ট হয়ে যায়?

এমন কোন ভ্রান্ত বিশ্বাস, এমন কোন ভ্রান্ত কথা, এমন কোন কাজকর্ম যা সরাসরি কুরআন এবং সুন্নাহ বিরোধী, এবং যে সকল বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা.) ঈমান বা ইসলাম ভঙ্গকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন, সেগুলোকে কুফরী, শিরকী কাজ বলে, ইসলাম থেকে বহিস্কৃত কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন সেগুলো হচ্ছে ঈমান বা ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়। আর যার মধ্যে ইসলামের সেই আকীদা বিশ্বাস নেই, বিশ্বাসের সাথে কাজের মিল নেই সে মুসলিম নয়।

অথবা তার মধ্যে বিশ্বাস আছে কিন্তু কর্মে উল্টো করছে, ইসলামিক বিষয় নাকচ করে দিচ্ছে, উল্টো যুক্তি দেখাচ্ছে সেজন্য তার ঈমান থাকবে না। তাই ঈমান বা ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়ে আমাদের জ্ঞান থাকা অত্যন্ত জরুরী। কারণ আজকাল মুসলিম দেশে মুসলিমরাই বেশী ইসলাম বিরোধী কথা-বার্তা বলছে। ইসলামের শত্রুরা মুসলিম দেশের মুসলিম নামধারী মুনাফিকদের দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কলম ধরিয়ে বিভিন্ন পত্রিকা-ফেইসবুকে লেখা-লেখি করাচ্ছে, বিভিন্ন টকশোতে ইসলামের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়াচ্ছে।

ইসলাম ধ্বংসকারী বিষয় দুই রকম আছে। কতক আকীদা ও কতক আমলী বিষয়। যেমন কিছু আছে ধর্ম মনে করে করা হয় না বরং ধর্মের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে করা হয়। যেমন ইসলামের বিরুদ্ধে এই বক্তব্য ঐ বক্তব্য ইত্যাদি, যেমন ঃ

- কেউ যদি বলে ইসলামে নারীদের অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়েছে, নারীদের সাথে বৈরী আচরণ করা হয়েছে, তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।
- মানব রচিত দলই উত্তম এটা মনে করলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।
- কেউ ইসলামকে নিয়ে কটুক্তি করলে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।
- কেউ যদি বলে যে আমি সব মানি কিন্তু কুরবানী মানিনা, বা সব মানি কিন্তু হাজ্জ মানিনা বা সব মানি কিন্তু রোযা মানিনা বা সব মানি কিন্তু পর্দা মানিনা তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

- কেউ যদি বলে আমি ধর্ম-টর্ম মানিনা তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

- কেউ যদি মনে করে যে কুরআনের আইনের চেয়ে মানব রচিত আইন ভাল তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

- কেউ যদি বলে কুরআন চৌদ্দশত বছর আগের পুরানো, এ দিয়ে কি আর আজ কাল চলে! তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

- কেউ যদি মনে করে বা বলে যে ইসলাম কায়েম হলে দেশ চৌদ্দশত বছর পিছিয়ে যাবে তাহলে যে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

- কেউ যদি মনে করে বা বলে যে ইসলাম কায়েম হলে দেশ জাহিলিয়াতের যুগে চলে যাবে তাহলে যে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

- কেউ যদি শরীয়াতের কোন একটি বা একাধিক বিষয়কে ঘৃণা করে তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

যে যে কারণে মুসলিম ব্যক্তির ঈমান এবং ইসলাম বিনষ্ট হয়ে যায় বা মুসলিম ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় তা নিম্মে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১) আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা বা তাতে কোন প্রকার সন্দেহ করা।

- আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা। যেমন নাস্তিকেরা করে থাকে এই বলে যে, স্রষ্টা বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব নেই। তারা বলে প্রাকৃতিক কারণেই এগুলো ঘটে থাকে।

- এই দাবী করা যে, দুনিয়াতে অলীদের মধ্যে কিছু কুতুব আছেন যারা দুনিয়ার কার্যসমূহ নিয়ন্ত্রণ করেন, যদিও তারা আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের অস্তিত্ব স্বীকার করে।

২) ইবাদাতে শিরকের মাধ্যমে ঈমান নষ্ট। আল্লাহ যে সত্যিকার মাবুদ তা অস্বীকার করা অথবা তাঁর সাথে কোন শিরক করা।

- তারা যারা সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গাছগাছালী, শয়তান ও অন্যান্য সৃষ্টির ইবাদাতকারী। তারা, যে আল্লাহ এই সমস্ত জিনিসের স্রষ্টা, তাঁর ইবাদাত

হতে বিরত থাকে। অথচ এ সমস্ত জিনিস কারও ভাল করতে পারে আর না পারে ক্ষতি করতে।

আর তাঁর নিদর্শনের মধ্যে আছে রাত্র, দিবস, সূর্য, চন্দ্র। তোমরা সূর্য বা চন্দ্রকে সিজদা কর না বরঞ্চ ঐ আল্লাহর সিজদা কর যিনি এদের সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা সত্যিকারভাবে তারই ইবাদাত করতে চাও। (সূরা ফুসসিলাত ঃ ৩৭)

- ঐ সমস্ত ব্যক্তিরা যারা এক আল্লাহর ইবাদাত করে এবং তার ইবাদাত করার সাথে সাথে অন্য মাখলুকেরও ইবাদাত করে থাকে। যেমন আউলিয়াদের ইবাদাত করে তাদের ছবি বা কবরকে সামনে রেখে। এরা মুশরিকদের সমতুল্য। কারণ তারা প্রচন্ড বিপদের সময় আল্লাহকে ডাকত আর সুখের সময় বা বিপদ কেটে গেলে অন্যদের ডাকত।

আর যখন তারা কোন নৌকায় আরোহন করতো তখন ইখলাসের সাথে তাঁকে ডাকত আর যখন তিনি তাদের রক্ষা করে তীরে পৌঁছিয়ে দিতেন তখনই তারা তার সাথে শিরক করতো। (সূরা আনকাবুত ঃ ৬৫)

- মুসলিম বলে দাবীদার এমন ব্যক্তি যারা আউলিয়া বলে কথিত লোকদের কবরে যেয়ে আশ্রয় ও বিপদমুক্তি চায় যেমন ঃ রোগ মুক্তি, চাকুরী চাওয়া, ব্যবসা চাওয়া, সন্তান চাওয়া, উন্নতি চাওয়া, গাড়ি-বাড়ি চাওয়া, বিপদ মুক্তি চাওয়া ও এই জাতীয় অন্যান্য জিনিস চাওয়া। অথচ এর ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারোই নেই। ঐ সমস্ত মৃত ব্যক্তিদের হাতে কোন ক্ষমতাই নেই। তারা অন্যদের কান্নাকাটি শুনতেই পায় না।

আর তোমরা তাঁকে ছেড়ে অন্যদের যে ডাকছ তারাতো সামান্যতম জিনিসেরও অধিকারী নয়। যতই তাদের ডাকনা কেনো তারাতো তোমার দু'আ শুনতেই পায় না। আর যদি শুনত, কক্ষণই তোমাদের উত্তর দিত না। আর কিয়ামতের দিন তোমরা যে শিরক করছ তাকে তারা পুরাপুরি অস্বীকার করে বসবে। (সূরা ফাতির ঃ ১৪০)

- কেউ কেউ বলেন আমরা তো এই ধারণা পোষণ করি না যে, এই সমস্ত আউলিয়া ও নেককারগণ কোন ভাল বা মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন। বরঞ্চ তাদেরকে মধ্যস্থতাকারী বা শাফায়াতকারী হিসাবে গ্রহণ করছি যাদের অসিলায় আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করি। তাদের সম্বন্ধে কুরআন বলছে ঃ

আর তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের যে ইবাদত করত তারা তাদের না কোন ক্ষতি করতে পারত, আর না ভাল করতে পারত। তারা বলত, এরা হচ্ছে আমাদের

জন্য আল্লাহর নিকট শাফায়াতকারী। হে নবী আপনি বলুনঃ তোমরা কি আল্লাহকে এমন কোন কথা বলতে চাও যা আসমান ও জমিনের কেহ জানে না? সমস্ত পবিত্রতাতো আল্লাহর। আর এরা যে শিরক করেছে তিনি তার অনেক উর্ধ্বে। (সূরা ইউনুস ঃ ১৮)

আর যারা তাঁকে ছেড়ে অন্যদের আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করে, তারা বলে যে, আমরাতো তাদের ইবাদত করি এজন্য যে, তারা আমাদের আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করায়ে দিবে। আল্লাহপাক, তারা যে সমস্ত ব্যাপারে মতবিরোধ করছে তার বিচার অবশ্যই করবেন। আল্লাহ কখনই কোন মিথ্যাবাদী কাফিরদের হিদায়াত দান করবেন না। (সূরা যুমার ঃ ৩)

- এ আয়াতে স্পষ্টভাবে এটা বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের জন্য গাইরুল্লাহর নিকট দু'আ করবে তারা কাফির। কারণ, রসূল (সা.) বলেন ঃ নিশ্চয়ই দু'আ হচ্ছে ইবাদাত। (তিরমিযী)
- এই ধারণা পোষণ করা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দ্বারা বিচার করা বর্তমান যামানায় সম্ভব নয়। অথবা অন্যান্য যে মানুষের বানানো নিয়ম কানুন আছে তাকে যদি সঠিক মনে করা হয় তাহলেও সে কাফির। কারণ এই হুকুম দেয়াটাও হচ্ছে ইবাদাত।

আর যারা আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত আয়াত দ্বারা বিচার করবে না তারাই হচ্ছে কাফির। (সূরা মায়িদা ঃ ৪৪)

- ঈমান নষ্টকারী আমলের মধ্যে আছে ঃ আল্লাহ প্রদত্ত বিচারে খুশী না থাকা। অথবা এতটুকুও ধারণা করা যে, ঐ বিচার বড়ই সংকীর্ণ ও কষ্টদায়ক।

আর যারা কুফরি করে তাদের জন্য ধ্বংস, আর তাদের আমলসমূহ গোমরাহীতে পরিণত হবে। কারণ, তারা আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ (হুকুম) সমূহকে অপছন্দ করেছিল। ফলে তাদের আমলসমূহকে তিনি নষ্ট করে দিয়েছেন। (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৮-৯)

৩) ঈমান নষ্টকারী আমলের মধ্যে আল্লাহর সিফাতসমূহে অস্বীকার করা

আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামসমূহ অস্বীকার করা অথবা তাঁর সিফাতসমূহ অস্বীকার করা অথবা তাতে কোন সন্দেহ প্রকাশ করা।

- যেমন ঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা তা অস্বীকার করা, অথবা তাঁর কুদরতকে বা তাঁর জীবনকে বা শোনা বা দেখাকে, অথবা তাঁর কথাকে বা তাঁর রহমাতকে

অথবা তিনি যে আরশের উপর আছেন তাকে অথবা তিনি যে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন তাকে অথবা তাঁর হস্তকে অথবা চক্ষুদ্বয়কে অথবা পদদ্বয়কে অথবা অন্যান্য যে সিফাতসমূহ আছে তার মর্যাদা অনুযায়ী আর উহা কোন মাখলুকের সাথে কোন মিল রাখে না এসব বিষয়কে অস্বীকার করা।

তাঁর মত কেউ নয়, কিন্তু তিনি শুনেন ও দেখেন। (সূরা শুরা ঃ ১১)

- আল্লাহ তা'আলার জন্য এমন কিছু সিফাত রেখেছেন যা তাঁর সৃষ্টির কারো মধ্যেই নেই। যেমন গায়েবের ইলম।

আর তাঁর নিকট আছে সমস্ত গায়েবের চাবি কাঠি যা অন্য কেউ জানে না। (সূরা আনআম ঃ ৫৯)

হে নবী! আপনি বলুন, আসমান ও জমিনের গায়েব কেউ জানে না আল্লাহ ব্যতীত। (সূরা নামল ঃ ৬৫)

রসূল (সা.) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন গায়েব জানার দাবীদার ব্যক্তি বা গণক (যারা হাত দেখে)-এর নিকট যাবে এবং তারা যা বলে তা বিশ্বাস করবে তবে সে যেন মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাকে অস্বীকার করে কুফরি করল। (মুসনাদে আহমাদ)

ইসলামে এমন কিছু নেগেটিভ কাজ আছে, তার কোনো একটিও যদি কোনো মুসলিম সম্পাদন করে তবে সে শিরক করল বলে বিবেচিত হবে। সেসব গুনাহ মহান আল্লাহ তওবা ব্যতীত ক্ষমা করেন না। নিম্নে সেগুলি বর্ণিত হল ঃ

৪. ইসলামি কোনো রীতি মোট কথা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত কোনো বিষয়কে অপছন্দ করলে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন:

তা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। অতএব তিনি তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন। (সূরা মুহাম্মাদ : ৯)।

৫. কুরআন কিংবা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ইসলামের কোনো আদেশ নিষেধ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করলে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে'? তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ। (সূরা তাওবা : ৬৫-৬৬)।

৬. কুরআনুল কারীম কিংবা সহীহ হাদীসের কোনো আদেশ-নিষেধ জেনে বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করলে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। যেমন ঃ

যদি কেউ মনে করে যে মহিলাদের পর্দা না করলেও চলে তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। কারণ পর্দা নামাযের মতোই ফরয।

৭. আল্লাহকে তিরষ্কার-র্ভৎসনা করলে, দ্বীন ইসলামকে অভিশাপ দিলে, রসূল (সা.)-কে গালি দিলে কিংবা তাঁর কোনো কাজকে বিদ্রুপ করলে, অথবা তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন তার কোনো সমালোচনা করলে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

৮. আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত বিধান মত বিচার না করলে, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে এই যুগে ইসলামের সেসব নীতি সঙ্গত ও উপযোগী নয়, অথবা অন্য যেসব (কুফরি) আইন চালু আছে তা সঠিক মনে করলে সেই ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

আর যারা আল্লাহ প্রদত্ত আইনে বিচার করে না তারাই কাফির। (সূরা মায়িদা: ৪৪)

৯. ইসলাম বহির্ভূত আইনে বিচার করা, কিংবা ইসলামি বিচারকে অপছন্দ করলে সেই ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়। (সূরা নিসা: ৬৫)

১০. মানব রচিত আইনকে সঠিক মনে করা। যেমন একনায়কত্ব, গণতন্ত্র কিংবা ইসলামের সাথে সাজ্ঘর্ষিক অন্য কোনো মতবাদপুষ্ট যারা আল্লাহর শরিয়ত বিরোধী আইন প্রণয়ন করে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? (সূরা শুরা : ২১)

১১. কেউ যদি মনে করে যে কুরআন দ্বারা কি পার্লামেন্ট চলতে পারে? তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে (অনুগ্রহকে) সম্যকভাবে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম [মনোনীত করলাম]। (সূরা মায়িদা ঃ ৩)

১২. আল্লাহ কতৃক হালালকৃত বিষয়াদিকে হারাম করা বা হারামকৃত বিষয়াদিকে হালাল করা। যেমন সুদকে হালাল মনে করলে সেই ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। (সূরা বাকারা: ২৭৫)

১৩. ধ্বংসকারী চিন্তা ও মতবাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, যেমন নাস্তিক্যবাদ, ইয়াহুদিবাদ, মার্কসবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদিতে বিশ্বাস করলে সেই ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আলে ইমরান: ৮৫)

১৪. ইসলাম বিরোধী কাফিরদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য সহযোগিতা করলে সেই ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু না বানায়। আর যে কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে যদি তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের ব্যাপারে সতর্ক করছেন এবং আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তন। (সূরা আলে ইমরান: ২৮)

১৫. দ্বীনকে রাষ্ট্রীয় কার্য হতে, অনুরূপ রাষ্ট্রকে দ্বীন হতে আলাদা করে ফেলা, আর বলা যে ইসলামে রাজনীতি নেই। এই ধরণের মনে করলে সেই ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। কারণ, এসব মতবাদ কুরআন হাদীস অথবা রসূল (সা.)-এর জীবনীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে।

১৬. কেউ যদি মনে করে বা বলে যে ইসলাম কায়েম হলে দেশ মধ্যযুগে চলে যাবে তাহলে যে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে ।

এ-বিষয়গুলোর প্রতিটিই খুবই বিপজ্জনক, আর তা অনেকের জীবনে অহরহ সংঘটিত হয়ে থাকে । অতএব প্রতিটি মুসলিমের উচিত এ বিষয়গুলো থেকে সতর্ক থাকা ও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা । আমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর ক্রোধ ও কঠিন শাস্তির কারণগুলোতে পতিত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি ।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়া

বিশ্বের সব সমস্যার মুলে আছে বান্দার আল্লাহকে ভুলে যাওয়া, স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়া । যিনি আমাকে বানিয়েছেন তাঁকে ভুলে যাওয়া । আল্লাহ নিজেই বলেছেন: "ইয়া আইয়্যুহাল ইনসানু মা গর্রাকা বি রাব্বিকাল কারীম" অর্থাৎ, হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহিমান্বিত রব সম্পর্কে উদাসীন করল? (সূরা ইনফিতার ৮২ ঃ ৬)

সত্যিকার অর্থেই বেশীর ভাগ মানুষ বাস্তবে স্রষ্টাকে ভুলে গিয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকায় নাস্তিকের সংখ্যা অনেক। রাশিয়া আগে রাষ্ট্রীয়ভাবে নাস্তিক ছিল। তাদের মধ্যেও অনেকে সন্দেহবাদী (skeptic) অর্থাৎ বলবে না যে স্রষ্টা নেই, কিন্তু বাস্তবে স্রষ্টাকে স্মরণ করবে না বা তার আদেশ মেনে চলবে না। স্রষ্টাকে মেনে চলে এরকম লোকের সংখ্যা খুব কম।

স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়ার ফলে কতগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে যা আজকের বিশ্বসংকটের উৎস । এগুলো হলো বস্তুবাদ, নাস্তিকতা এবং সেক্যুলারিজম (যা নাস্তিকতার মতই) ।

আসুন প্রথমে আমরা আলাপ করি নাস্তিকতা সম্পর্কে । নাস্তিকরা ভাবেন এই জগতের কোন সৃষ্টিকর্তা নেই । নিজে নিজেই সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে । যেখানে একটি ছোট খেলনা বানাতেও একজন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন হয় সেখানে এই বিশাল পৃথিবী, এর মধ্যে বসবাসকারী অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে এটা একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ তো দূরের কথা, একটি শিশুও বিশ্বাস করবে না । যদি মহাবিশ্বের কথা ভাবি, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রের কথা ভাবি, যেগুলো সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান এখনও সীমাবদ্ধ, তাও যদি নিজে নিজে হঠাৎ

করে সৃষ্টি হয়েছে বলা হয় তাহলে সুস্থ বুদ্ধির মানুষের পক্ষে তা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এরপর আসছে সেক্যুলারিজম। নাস্তিকরা অন্তত তাদের চিন্তা ভাবনা নিয়ে কপটতা করেন না, এরা পরিষ্কারভাবে তাদের স্রষ্টাতে অবিশ্বাসকে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। কিন্তু সেক্যুলারিষ্টরা হলেন গোপন নাস্তিক, এরা সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করেন না এবং এই তথ্য প্রকাশ করার সৎসাহসও তাদের নেই। অতএব এরা চেষ্টা করেন ধর্মকে মসজিদের চার দেয়ালে আবদ্ধ করে মানুষকে ধর্মহীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তুলতে। এটা সম্ভব হলে কিছুদিন পর পুরো সমাজই ধর্মকে ভুলে ধর্মহীন নাস্তিক সমাজে পরিণত হবে। অতএব স্বঘোষিত নাস্তিকের চাইতে অঘোষিত নাস্তিক তথা সেক্যুলারিষ্টদের সম্পর্কে মুসলিমদের বেশী সতর্ক থাকতে হবে, ইনশাআল্লাহ।

আধুনিক বিশ্বের তৃতীয় অভিশাপ হলো বস্তুবাদ। আজ ধর্মহীন মানুষ বস্তুবাদী তথা স্বার্থপর হয়ে গেছে। গরীবের জন্য ধনীরা কোন দায়িত্ব্য বোধ করেনা। ঢাকাতে ধনী মানুষেরা বিদেশী ফাষ্টফুডের দোকান থেকে উচ্চমূল্যে অস্বাস্থ্যকর খাবার কিনে খাচ্ছে কিন্তু শিশু ভিখারীকে খাবারের জন্য কিছু টাকা দিকে মন চায়না। অতীতের সাম্রাজ্যবাদ আর নেই, এর জায়গায় এসেছে মুক্ত বাজারের (free market) নামে দেশীয় ও বহুজাতিক করপোরেশনগুলোর আগ্রাসন। এখন মুনাফার কোন সীমা নেই, গরীবের রক্ত শোষণ করে মুনাফা অর্জন করবার কোন সীমা নেই। ফলে গরীব আরো গরীব হচ্ছে এবং ধনী আরো ধনী হচ্ছে। মানুষের মাঝে এই অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য ইসলামে ধনীদের যাকাত প্রদান ফরয করা হয়েছে ও দান সাদাকা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু বস্তবাদী নীতির দাস ভোগবাদী মানুষেরা আজ যাকাত ও সাদাকা করতে উৎসাহিত হয়না, ভাবে নিজের ভোগে কিছুটা কম পরে যাবে। মানবিক গুণাবলীর অভাবে এসব মানুষ আর পশুতে কি খুব বেশী পার্থক্য আছে কি?

স্রষ্টাতে বিশ্বাস ফিরে এলে, মানুষ ধর্মের অনুশাষণ মেনে চললে ক্ষুধা, দারিদ্র, নিরাপত্তাহীনতা ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যাগুলো খুব সহজেই সমাধান করা সম্ভব। এটা কোন গল্পকথা নয়, এরা বাস্তব উদাহরণ আমরা দেখেছি উমাইয়া শাসক দ্বিতীয় ওমরের (র.) শাসনামলে যখন যাকাত দেবার মত লোক খুজে পাওয়া যেতনা।

আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের অনুশাষণ পূর্ণভাবে পালন করে সকল সামাজিক সমস্যা দূর করার তওফিক দান করুন, আমিন।

কুফরী কী?

কুফরীর সংজ্ঞা

কুফরীর আভিধানিক অর্থ আবৃত করা ও গোপন করা। আর ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায় ঈমানের বিপরীত অবস্থানকে কুফরী বলা হয়। কুফরী হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) প্রতি ঈমান না রাখা (তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক কিংবা না হোক)। আল্লাহ ও তার রসূল (সা.) সম্পর্কে কোন সংশয়, সন্দেহ, উপেক্ষা, ঈর্ষা করা কুফরী। আবার যে ৬টি বিষয়ের উপর আমাদেরকে ঈমান আনতে (বিশ্বাস করতে) বলা হয়েছে অর্থাৎ ঈমানের ৬টি রুকনের (আল্লাহ, ফিরিশতা, নবী, কিতাব, কিয়ামত দিবস ও আখিরাত, পূর্বনির্দ্ধারিত ভাগ্য) কোন একটিকে অস্বীকার করাও কুফরী। কুফুরী দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার : বড় কুফরী

এ প্রকারের কুফরী মুসলিম ব্যক্তিকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। এটি আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত:

১. ঈমানের রুকনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কুফরী : এর দলীল আল্লাহর বাণী:

যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা রচনা করে, অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? জাহান্নামই কি এইসব কাফিরের আবাস নয়? (সূরা আনকাবুত ঃ ৬৮)

২. ঈমানের রুকনসমূহ সম্পর্কে মনে বিশ্বাস রেখেও অহংকারশত মুখে অস্বীকার করা কুফরী । এর দলীল আল্লাহর বাণী:

যখন আমি ফিরিশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল, সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। (সূরা বাকারা ঃ ৩৪)

৩. ঈমানের রুকনসমূহ সম্পর্কে সংশয়জনিত কুফরী: একে ধারণাজনিত কুফরীও বলা হয়। এর দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী:

নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমার মনে হয়না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আমি মনে করিনা যে,

কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। আর যদি আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়ই, তবে তো আমি নিশ্চয়ই এর চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান পাব। তদুত্তরে তার সাথী তাকে বলল, তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে? কিন্তু আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরীক করিনা। (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ৩৫-৩৮)

৪. ঈমানের রুকনসমূহের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন ও মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কুফরী ।এর দলীল আল্লাহর বাণীঃ

আর কাফিররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা আহক্বাফ ঃ ০৩)

৫. মুনাফিকী ও কপটতার কুফরী ।এর দলীল হল আল্লাহর বাণী :

এটা এজন্যে যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না। (সূরা মুনাফিকুন ঃ ০৩)

দ্বিতীয় প্রকার : ছোট কুফরী

এ প্রকারের কুফরী মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিস্কৃত করে না। একে 'আমলী কুফরী'ও বলা হয়। ছোট কুফরী দ্বারা সে সব গোনাহের কাজকেই বুঝানো হয়েছে, কুরআন ও সুন্নায় যাকে কুফরী নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের কুফরী বড় কুফরীর সমপর্যায়ের নয়।

- যেমন আল্লাহর নিয়ামতের কুফরী করা যা নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এমন এক জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। তথায় প্রত্যেক স্থান হতে আসত প্রচুর রিযিক ও জীবিকা। অতঃপর সে জনপদের লোকেরা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞা প্রকাশ করল। (সূরা নাহল ঃ ১১২)

- এক মুসলিম অপর মুসলমানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াও এ ধরনের কুফরীর অন্তর্গত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

কোন মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী কাজ। আর তার সাথে যুদ্ধ করা কুফুরী। (সহীহ বুখারী , সহীহ মুসলিম)

তিনি আরো বলেন ঃ

আমার পর তোমরা পুনরায় কাফির হয়ে যেও না, যাতে তোমরা একে অপরকে হত্যা করবে । (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

- গায়রুল্লাহর নামে কসমও কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে কসম করল সে কুফরী কিংবা শিরক করল। (তিরমিযী, হাকিম)

মূল কথা

১. বড় কুফরী মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় (ফাসিক) এবং তার অতীতের আমলসমূহ নষ্ট করে দেয়। পক্ষান্তরে ছোট কুফরী ইসলাম থেকে বের করে না এবং অতীতের আমলও নষ্ট করে না। তবে তা আমলে ত্রুটি সৃষ্টি করে এবং ছোট কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তিকে শাস্তির মুখোমুখি করে।

২. বড় কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তি চিরস্থায়ী ভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে। কিন্তু ছোট কুফরীর কাজে লিপ্ত ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করলেও তাতে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে না। বরং কখনো আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

৩. বড় কুফরীতে লিপ্ত হলে সে ব্যক্তির জান–মাল মুসলিমদের জন্য বৈধ হয়ে যায়। অথচ ছোট কুফরীতে লিপ্ত হলে জান–মাল বৈধ হয় না।

৪. বড় কুফরীর ফলে মু'মিন ও অত্র কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃত শত্রুতা সৃষ্টি হওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়। তাই সে ব্যাক্তি যত নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন, তাকে ভালবাসা ও তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা মু'মিনদের জন্য কখনোই বৈধ নয়। পক্ষান্তরে ছোট কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে কোন বাধা নেই। বরং তার মধ্যে যতটুকু ঈমান রয়েছে সে পরিমাণ তাকে ভালবাসা ও তার সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত এবং যতটুকু নাফরমানী তার মধ্যে আছে, তার প্রতি ততটুকু পরিমাণ ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব পোষণ করা যেতে পারে।

নিফাক ও মুনাফিকী

নিফাকের সংজ্ঞা

শরীয়তের পরিভাষায় নিফাক অর্থ হল– অন্তরে কুফরী ও অবিশ্বাস লুকিয়ে রেখে বাহিরে ইসলাম জাহির করা। যারা নিফাক করে তারাই মুনাফিক।

একে নিফাক নামকরণের কারণ হলো সে এক দরজা দিয়ে শরীয়তে প্রবেশ করে অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়। এ জন্যই এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন:

'নিশ্চয়ই মুনাফিকরাই ফাসিক–পাপচারী। (সূরা তাওবা ঃ ৬৭)

এখানে ফাসিক মানে হল– শরীয়তের সীমানা থেকে যারা বের হয়ে যায়। আল্লাহ মুনাফিকদেরকে কাফিরদের চেয়েও নিকৃষ্ট বলে গণ্য করেছেন।

'নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। (সূরা নিসা ঃ ১৪৫)

তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে প্রতারিত করতে চায় অথচ তারা যে নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রতারিত করেনা, তা তারা বুঝতে পারেনা। তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে।আর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি কারণ তারা মিথ্যাচারী। (সূরা বাকারা ঃ ৯-১০)

নিফাকীর প্রকারভেদ ঃ নিফাকী দুই প্রকার

প্রথম প্রকার ঃ ইতেক্বাদ বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নিফাক

একে বড় নিফাক বলা হয়। এতে মুনাফিক ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে ইসলামকে জাহির করে এবং কুফরীকে গোপন রাখে। এ প্রকারের নিফাকী ব্যক্তিকে পুরোপুবিভাবে দ্বীন থেকে বের করে দেয়। উপরন্তু সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে যায়।

আল্লাহ তাআলা এ প্রকারের মুনাফিকদেরকে যাবতীয় নিকৃষ্ট বিশেষণে অভিহিত করেছেন। কখনো কাফির বলেছেন, কখনো বেঈমান বলেছেন, কখনো দ্বীন ও দ্বীনদার লোকদের প্রতি ঠাট্রা– বিদ্রূপকারী হিসাবে তাদেরকে বর্ণনা করেছেন এবং এও বলেছেন যে, তারা দ্বীন ইসলামের শত্রুদের প্রতি পুরোপুরিভাবে আসক্ত, কেননা তারা ইসলামের শত্রুতায় কাফিরদের সাথে অংশগ্রহণ করে

থাকে। এরা সবযুগেই বিদ্যমান, বিশেষ করে যখন ইসলামের শক্তি প্রবলভাবে প্রকাশ পায়।

মুসলিমরা শক্তিশালী হলে মুনাফিকরা যেহেতু প্রকাশ্যে ইসলামের মোকাবেলা করতে সক্ষম নয়, তাই তারা বলে বেড়ায় যে তারা ইসলামের মধ্যে আছে। ফলে তারা নিজেদের জান মালের পূর্ণ নিরাপত্তা ভোগ করে, এবং যারা তাদের নিরাপত্তা দিয়েছে সেই মুসলিমদের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করে।

অতএব মুনাফিক প্রকাশ্যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেস্তাগণ, কিতাবসমূহ, রসূলগণ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনার ঘোষণা দিলেও অন্তরে এসব কিছুই সে বিশ্বাস করেনা, বরং এগুলোকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহর প্রতি তার ঈমান নেই, এবং এ বিশ্বাস ও নেই যে, তিনি তাঁর এক বান্দার উপর কালামে পাক নাযিল করেছেন, তাকে মানুষের প্রতি রসূল করে পাঠিয়েছেন, আল্লাহর হুকুমে তিনি তাদেরকে হেদায়াত করবেন, তাঁর প্রতাপ সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করবেন এবং তাঁর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করবেন। কুরআন পাকে আল্লাহ তাআলা এসব মুনাফিকদের স্বরূপ উম্মোচন করেছেন, তাদের রহস্য উদঘাটন করে দিয়েছেন, যাতে তারা এসব মুনাফিকদের ব্যাপারে সতর্ক থাকে।

আল্লাহ তাআলা সূরা বাক্বারার শুরুতে তিন শ্রেণীর লোকদের কথা বর্ণনা করেছেন: মুমিন, কাফির এবং মুনাফিক। মুমিনদের সম্পর্কে চারটি আয়াত, কাফিরদের সম্পর্কে দু'টি আয়াত এবং মুনাফিকদের সম্পর্কে তেরটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। (সূরা বাকারা ঃ ২-২০) সংখ্যায় মুনাফিকদের আধিক্য, মানুষের মধ্যে তাদের নিফাকীর ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং ইসলাম ও মুসলমানদের উপর তাদের ভীষণ ফিতনা সৃষ্টির কারণেই তাদের ব্যাপারে এত বেশী আলোচনা করা হয়েছে। কাফিরদের চাইতে মুনাফিকদেও গোপন শত্রুতার কারণে ইসলামের উপর অনেক বেশী বালা–মুসীবত নেমে আসে। কেননা ইসলামের প্রকৃত দুশমন হওয়া সত্ত্বেও তারা মুসলিম হিসাবে পরিচিত এবং তাদেরকে ইসলামের সাহায্যকারী ও বন্ধু ভাবা হয়। তারা নানা উপায়ে ইসলামের শত্রুতা করে থাকে। ফলে অজ্ঞ লোকেরা ভাবে যে, এ হল তাদের দ্বীনী এলেম ও সংস্কার মূলক কাজের বহিঃপ্রকাশ। অথচ প্রকারান্তরে এটা তাদের মূর্খতা এবং ফিতনা ও ফাসাদ সৃষ্টিরই নামান্তর।

এ প্রকারের নিফাকী আবার ছয় ভাগে বিভক্ত ঃ

১. রসূল সাল্লাল্লহু আলাইহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে (মনে মনে) মিথ্যা সাব্যস্ত করা।

২. রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত শরীয়তের কোন অংশকে (মনে মনে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

৩. রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি (অন্তরে) বিদ্বেষ পোষণ করা।

৪. তাঁর আনীত দ্বীনের কিয়দংশের প্রতি (অন্তরে) বিদ্বেষ রাখা।

৫. তাঁর আনীত দ্বীনের পতনে (মনে মনে) খুশী হওয়া।

৬. তাঁর আনীত দ্বীনের বিজয়ে অখুশী হওয়া এবং মনে কষ্ট অনুভব করা।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ আমলের নিফাক

এ প্রকারের নিফাকী হল– অন্তরে ঈমান থাকা সত্ত্বেও মুনাফিকদের সাথে কোন কাজে লিপ্ত হওয়া। এ নিফাকীর ফলে ব্যক্তি ইসলামী মিল্লাতের গন্ডী থেকে বের হয়না, তবে বের হবার রাস্তা সুগম হয়ে যায়। এ ধরনের লোকদের মধ্যে ঈমান ও নিফাকী উভয়ের অস্তিত্বই রয়েছে। নিফাকীর পাল্লা ভারী হলে সে পূর্ণ মুনাফিকে পরিণত হয়। একথার দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ঃ

চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এ চারটি স্বভাবের কোন একটি থাকবে তার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব থাকবে যে পর্যন্ত না সে তা পরিহার করে। যখন তাকে আমানতদার করা হয়, সে খিয়ানত করে। যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে। যখন চুক্তি করে, বিশ্বাস ঘাতকতা করে, আর যখন ঝগড়া–বিবাদ করে, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

অতএব যার মধ্যে এ চারটি স্বভাব একত্রিত হয় তার মধ্যে সকল প্রকার অসততার সম্মিলন ঘটে এবং মুনাফিকদের সব দোষগুলোই তার মধ্যে প্রকৃষ্ট ভাবে পাওয়া যায়। আর যার মধ্যে সেগুলোর যে কোন একটি পাওয়া যার তার মধ্যে নিফাকীর এ কটি স্বভাব বিদ্যমান। কেন না বান্দার মধ্যে কখনো কখনো একইসাথে ভালো ও মন্দ স্বভাবসমূহ এবং ঈমান ও কুফুরী– নিফাকীর স্বভাবসমূহের সমাহার ঘটে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে তার ভাল ও মন্দ কাজের পরিমাণ অনুযায়ী সে সওয়াব ও শাস্তির উপযুক্ত হয়। আমলী নিফাকের মধ্যে

রয়েছে– মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায আদায়ে অলসতা করা। কেননা এটি মুনাফিকদেরই একটি গুণ।

মোট কথা নিফাকী অতীব খারাপ ও বিপজ্জনক একটি স্বভাব, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এতে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে শংকিত থাকতেন। ইবনে আবি মুলাইকা বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ত্রিশজন সাহাবীর দেখা পেয়েছি যারা প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে নিফাকে পতিত হবার ভয় করতেন।

বড় নিফাক ও ছোট নিফাকের মধ্যে পার্থক্য ঃ

১. বড় নিফাক বান্দাকে ইসলামী মিল্লাতের গন্ডী থেকে বের করে দেয়। পক্ষান্তরে ছোট নিফাক (আমলী নিফাক) মিল্লাত থেকে বের করেনা।

২. বড় নিফাকের মধ্যে আক্বীদার ক্ষেত্রে অন্তরে ও বাহিরে (বাতেন ও জাহের) দু'রকম থাকে। আর ছোট নিফাকীর মধ্যে আক্বীদাহ নয়, বরং শুধু আমলের ক্ষেত্রে অন্তরও–বাহিরে দু'রকম থাকে।

৩. বড় নিফাক কোন মু'মিন থেকে প্রকাশ পায় না। কিন্তু ছোট নিফাক কখনো মু'মিন থেকে প্রকাশ পেতে পারে।

৪. বড় নিফাকীতে লিপ্ত ব্যক্তি সাধারণতঃ তওবা করে না। আর তওবা করলেও তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অথচ ছোট নিফাকীতে লিপ্ত ব্যক্তি অনেক সময়ই তওবা করে থাকে এবং আল্লাহও তার তওবা কবুল করেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন : অনেক সময় মু'মিন বান্দা নিফাকীর কোন কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করে নেন। কখনো তার অন্তরে এমন বিষয়ের উদয় হয় যা নিফাকীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আল্লাহ ঐ বিষয়কে তার অন্তর থেকে দূর করে দেন। মুমিন বান্দা কখনো শয়তানের প্ররোচনায় এবং কখনো কুফরীর কুমন্ত্রণায় পড়ে যায়। এতে তার হৃদয়ে সংকীর্ণতার সৃষ্টি হয়। যেমন সাহাবায়ে কেরাম রাদি আল্লাহু আনহুম বলেছিলেন: হে রসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তার অন্তরে এমন কিছু অনুভব করে, যা ব্যক্ত করার চেয়ে আসমান থেকে জমীনের উপর পড়ে যাওয়াই সে অধিক ভাল মনে করে। একথা শুনে তিনি বললেন: এটা ঈমানেরই স্পষ্ট আলামত। (আহমদ, সহীহ মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় এসেছে ঃ ‘‘অন্তরের কথাটি মুখে ব্যক্ত করাকে সে খুবই গুরুতর ও বিপজ্জনক মনে করে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এক ষড়যন্ত্রকে কুমন্ত্রণায় পরিণত করেছেন।’’ একথার অর্থ হল প্রবল অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়া এবং হৃদয় থেকে তা দূরীভূত হওয়া ঈমানের স্পষ্ট নিদর্শন। (কিতাবুল ঈমান, ২৩৮) আর বড় নিফাকীতে লিপ্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

‘তারা বধির, মূক, অন্ধ, সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। (সূরা বাকারা ঃ ১৮)

অর্থাৎ তারা অন্তরের দিক দিয়ে ইসলামে ফিরে আসবে না। এদের সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেন ঃ

‘তারা কি দেখেনা যে, প্রতি বছর তারা একবার কি দুইবার বিপর্যস্ত হচ্ছে? এর পরও তারা তাওবা করেনা এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।’ (সূরা তাওবা ঃ ১২৬)

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন ঃ প্রকাশ্যেভাবে তাদের তাওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে উলামাদের মতানৈক্য রয়েছে। কেননা তাদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব হয় না। কারণ তারা তো সব সময়ই প্রকাশ্যে ইসলামের দাবিদার।

আল্লাহ, রসূল (সা.) এবং দ্বীন ইসলামকে আমরা কতোটুকু ভালবাসবো?

তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে পৌঁছে যাবে? (সূরা বাকারা ঃ ২১৪)

(হে রসূল! আপনি তাদেরকে) বলুন, তোমাদের পিতা, সন্তানাদি, ভাই-বোন, স্ত্রীগণ, আত্মীয়-স্বজন, ঐ সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের ঐ ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার মন্দার ভয় কর এবং তোমাদের ঐ সম্পদ যা তোমরা পছন্দ কর – (এসব) যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফায়সালা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসেকদেরকে হিদায়াত করেন না। (সূরা আত তাওবা, ৯ ঃ ২৪)

দুনিয়ার জন্য ৮টি ভালবাসা	দ্বীনের জন্য ৩টির ভালবাসা
১. পিতা	১. আল্লাহ
২. সন্তানাদি	২. রসূল
৩. ভাই-বোন	৩. আল্লাহর পথে জিহাদ বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা
৪. স্ত্রীগণ	
৫. আত্মীয়-স্বজন	
৬. জমানো সম্পদ	
৭. ব্যবসা-বাণিজ্য	
৮. বাড়িঘর	

এ আয়াতে মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা স্পষ্ট ভাষায় দুনিয়ার ভালোবাসার জিনিসগুলোকে কী পরিমাণ ভালোবাসা যাবে তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমাদের পরিবার ও সম্পদের প্রতি ভালোবাসা থাকতেই পারে তবে তা মুমিনকে যেন কোন অবস্থাতেই দ্বীন ইসলামের প্রতি তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন থেকে বিরত না রাখে।

মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে খারাপ ধারণা করলে ঈমান থাকবে?

এ প্রশ্নের সরল উত্তর হলো ঈমান থাকবে না।

- আমাদের রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রিসালাতকে অস্বীকার করা যাবে না। কারণ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে আল্লাহর রসূল এবং তাকে অনুসরণ করা এই সাক্ষ্য দেয়া ঈমানের ছয়টি স্ত ম্ভের এক স্তম্ভ।

- মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জীবনে যা কিছু বলেছেন বা করেছেন তা মহান আল্লাহ তাআলার হুকুমেই করেছেন। তিনি নিজে ইচ্ছায় কিছুই করেননি। তাই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সমস্ত কথাই আমাদেরকে মান্য করতে হবে।

- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা পোষণ করা বা তাঁর সত্যবাদিতা সম্পর্কে বা আমানত বা পবিত্রতা সম্পর্কে সন্দেহ

পোষণ করা যাবে না। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে গালি দেয়া, অথবা কোন ঠাট্টা বিদ্রূপ করা, অথবা তাঁর অবমূল্যায়ন করা অথবা তার কার্যসমূহ সম্পর্কে কোন আজেবাজে কথা বলা যাবে না।

- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোন সহীহ হাদীস সম্পর্কে খারাপ কথা বলা বা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা অথবা তিনি যদি কোন সত্য খবর দিয়ে থাকেন তাকে অস্বীকার করা যাবে না।
- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বহু বিবাহ নিয়ে কোন খারাপ মন্তব্য করা যাবে না। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং মা আয়িশার বাল্য বিয়ে নিয়ে কোন প্রকার খারাপ মন্তব্য করা যাবে না।
- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিচার ব্যবস্থা নিয়ে কোন খারাপ মন্তব্য করা যাবে না।

মুহাম্মাদ (সা.)-এর নির্দেশ পালনে আমরা কি বাধ্য?

হ্যাঁ, আমরা মুসলিমরা তা করতে বাধ্য। কারণ আল্লাহ বলেন ঃ

- "আল্লাহর রসূল নিজের প্রবৃত্তি থেকে কিছুই বলেন না, তাঁর কথা হল ওহী যা তাঁর প্রতি প্রেরিত হয়।" (সূরা আন নাজম ৫৩ ঃ ৩-৪)
- "আর রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক।" (সূরা আল হাশর ৫৯ ঃ ৭)
- "আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করে তখন কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর ঐ নির্দেশের ব্যতিক্রম করার কোন অধিকার থাকে না; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করল, সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।" (সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৩৬)
- "আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন যাতে তারা সর্বদা-চিরকাল অবস্থান করবে।" (সূরা আল জ্বিন ৭২ ঃ ২৩)
- "কিন্তু না, তোমার রবের কসম! তারা প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত তারা তাদের যাবতীয় বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে তোমাকে বিচারক সাব্যস্ত

না করে এবং তুমি যে ফায়সালা প্রদান কর তা দ্বিধাহীন চিত্তে পরিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে গ্রহণ করে না নেয়।" (সূরা আন নিসা ৪ ঃ ৬৫)

- "সুতরাং যারা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে, তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে কিংবা তাদের উপর কোন যন্ত্রণাময় আযাব নাযিল হয়ে পড়ে।" (সূরা আন নূর ২৪ ঃ ৬৩)

আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুহাম্মাদ (সা.)-কে অবমাননার পরিণতি

মানব জাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবী এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাঁরা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করেছেন। নবীগণ ছিলেন মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠ মানুষ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে, প্রত্যেক নবীই তাঁর স্বজাতির পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকমের বাধা বিপত্তি, অবমাননার শিকার হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"আর এমনিভাবেই আমরা প্রত্যেক নবীর জন্যে বহু শয়তানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি, তাদের কতক শয়তান মানুষের মধ্যে এবং কতক শয়তান জ্বিনদের মধ্য থেকে হয়ে থাকে, এরা একে অপরকে কতগুলো মনোমুগ্ধকর, ধোঁকাপূর্ণ ও প্রতারণাময় কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে। আর আপনার রবের ইচ্ছা হলে তারা এমন কাজ করতে পারত না, সুতরাং আপনি [মুহাম্মাদ] তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা রচনাগুলোকে বর্জন করে চলুন। [সূরা আল-আন'আম-১১২] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

"আর এভাবেই আমরা প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের থেকে শত্রু করে দিয়েছি। আর আপনার রবই তো হিদায়াতকারী ও সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট"। [সূরা আল-ফুরকান: ৩১]

আর এই ধারাবাহিকতা থেকে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও মুক্ত ছিলেন না। তাঁর উপরও নবুওয়তী জীবনের শুরু থেকে বিভিন্ন রকমের কটুক্তি, অবমাননা এমনকি তাঁর পরিবারের উপরও অপবাদ দেয়া হয়েছে। মূলত ইসলাম এবং নবীর প্রতি হিংসার কারণেই অমুসলিমরা একাজ করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

“তাদের অন্তরে আছে শুধু অহংকার, যা সফল হবার নয়। [সূরা গাফির-৫৬]

বাস্তবে হিংসা তাদেরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে, ইসলাম এবং নবীর কোনো ক্ষতিই তারা করতে পারে নি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ

তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, কীভাবে আল্লাহ আমাকে কোরাইশদের অবমাননাকর গালি, অভিসম্পাত থেকে পবিত্র রাখেন, তারা আমাকে মুযাম্মামকে (নিন্দিতকে) গালি দেয়, মুযাম্মামকে অভিসম্পাত করে, আর আমি মোহাম্মাদ (প্রশংসিত) ।

তারা নবীকে নিয়ে যতই কটূক্তি এবং অবমাননা করেছে আল্লাহ ততই তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। আল্লাহ্ বলেন,

“আর আমরা আপনার খ্যাতিকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি। [সূরা ইনশিরাহ ৯৪ ঃ ৪)।

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের আযানে বিশ্বব্যাপী মসজিদে মসজিদে তাঁর নাম উচ্চারিত হচ্ছে। মুয়ায্যিন বলছেন,

(আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্) “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল।”

তাঁর অবমাননাকারীদের অবমাননা থেকে তাঁকে রক্ষার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ্ বলেন,

“অবমাননাকারীদের জন্য আমরাই আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট।” [সূরা আল-হিজর-৯৫]।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন,

“আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?” [সূরা আয-যুমার: ৩৬]

এই আয়াতের তাফসীরে সুদ্দী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন ঃ যে কেউই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর আনিত বিধান নিয়ে বিদ্রূপ বা অবমাননা করেছে আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করেছেন এবং নির্মম শাস্তি দিয়েছেন।

যুগে যুগে যারা নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অবমাননা করেছে তাদের কেউ রক্ষা পায়নি, আল্লাহ তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন, “নিশ্চয়ই যারা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কষ্ট দেয়, তাঁকে অবমাননা করে, আল্লাহ তাদেরকে

উপযুক্ত শাস্তি দিবেন, তিনি তাঁর দ্বীনকে বিজয় করবেন, আর মিথ্যুকদের মিথ্যা রটনাকে মিথ্যায় পরিণত করবেন, যদিও মুসলিমরা তাদেরকে শাস্তি দিতে না পারে।”

রসূল (সা.)-কে অবমাননার ভয়াবহ পরিণতি ঃ

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অবমাননা করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কখনও কখনও সেটা দুনিয়ার জীবনেও অবমাননাকারীর উপর নেমে আসে, আবার কখনও কখনও সেটা আখিরাতের জন্য বরাদ্দ থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

“নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি।” [সূরা আল-আহযাব: ৫৭]

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নাসারা ছিল সে ইসলাম গ্রহণ করল এবং সূরা আল-বাকারা ও আলে ইমরান শিখল। সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কেরাণীর কাজ করত। সে পুনরায় নাসারা হয়ে গেল এবং বলতে লাগল মুহাম্মাদ আমি যা লিখি তাই বলে এর বাইরে সে আর কিছুই জানে না। এরপর সে মারা গেল, তখন তার সাথীরা তাকে দাফন করল, সকালে উঠে দেখল তার লাশ বাইরে পড়ে আছে। তখন নাসারারা বলতে লাগল মুহাম্মাদের সাথীরা এই কাজ করেছে কেননা সে তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছিল। তখন তারা আরো গভীর করে কবর খনন করে তাকে আবার দাফন করল, আবার সকালে উঠে দেখল তার লাশ বাইরে পড়ে আছে। তখন তারা বলল এটা মোহাম্মাদ এবং তার সাথীদের কাজ; কেননা সে তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছিল। তখন তারা আবার আরো গভীর করে কবর খনন করল এবং তাকে দাফন করল। আবার সকালে উঠে দেখল তার লাশ আবার বাইরে পড়ে আছে, তখন তারা বুঝল এটা কোনো মানুষের কাজ নয়, তখন তারা তার লাশ বাইরেই পড়ে থাকতে দিল। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

নিয়মিত দৈনিক সলাত (নামায) না পড়লে কেউ মুসলিম থাকতে পারে কিনা?

(ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত সলাত ছেড়ে দিলেও)

মুমিন এবং কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সলাত (নামায)

রসূল (সা.) বলেছেন, "মুমিন ও কাফির-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সলাত পরিত্যাগ করা।" [সহীহ্ মুসলিম]

সলাত (নামায) ত্যাগকারী ইসলাম হতে বের হয়ে যায়

কেউ যখন ইচ্ছা করে এক ওয়াক্ত সলাত ত্যাগ করে তখন সে বস্তুত আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর সলাত আদায় করার আদেশকে অমান্য করছে। যখন কোন মুসলিম আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সা.) আদেশ অমান্য করে, তখন সে আর মুসলিম থাকতে পারেনা। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত (নামায) ত্যাগকারী ইসলাম হতে বের হয়ে যায় অর্থাৎ ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) ও কাফির হয়ে যায়। রসূল (সা.) বলেছেন, "আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মাঝে চুক্তি হচ্ছে সলাতের। অতএব যে ব্যক্তি সলাত ত্যাগ করল সে কুফরীর করল।" [আবু দাউদ, আহম্মদ, তিরমিজি, নাসাঈ]

এরকম লোকের ইসলামে ফিরে আসার একমাত্র পথ হলো অনুতাপের সাথে তওবা করা এবং দৃঢ় অংগীকার করা যে সে এধরনের কাজ আর কখনও করবে না।

"তবে এখন যদি তারা তওবা করে সলাত পড়ে ও যাকাত প্রদান করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।" [সূরা আত তাওবা ঃ ১১]

বেনামাযির জানাযা পড়া নিষেধ

আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা.)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ আর তাদের কেউ মরে গেলে তার জানাযা তুমি কখনই পড়বে না তার কবরের পাশে কখনই দাঁড়াবে না কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং ফাসিক (পাপাচারী) অবস্থায় ওদের মৃত্যু হয়েছে। [সূরা আত তাওবা ঃ ৮৪]

বেনামাযির জন্য জাহান্নাম

(ডান পার্শ্বস্থ লোকেরা) অপরাধীদের সম্পর্কে বলবে, তোমাদের কিসে জাহান্নামে পাঠিয়েছে? তারা বলবে আমরা সলাত পড়তাম না, অভাবগ্রস্তদের আহার দিতাম না। [সূরা মুদ্দাস্‌সির ঃ ৪১-৪৪]

যারা সলাত (নামায) বিনিষ্ট করল তাদের জন্যে আযাব অনিবার্য

অতঃপর তাদের পর সেই অযোগ্য অবাঞ্ছিত লোকেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হল যারা সলাতকে বিনষ্ট করল, আর কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। [সূরা মারইয়াম ঃ ৫৯]

যারা তাদের সলাত সম্বন্ধে উদাসীন তাদের জন্য দুর্ভোগ। [সূরা মাউন ঃ ৪, ৫]

মুসলিম হয়েও ইসলামের বিরোধিতার পরিণতি

মুসলিম হলো সেই ব্যক্তি যে ইসলামের সকল বিধি-বিধানের প্রতি নিজেকে বিনাদ্বিধায় সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করেছে।

মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যে লোক চিন্তা-ভাবনায়, কথায় বা কাজে ইসলামের বিরোধিতা করে সে নিজেকে আর মুসলিম দাবী করতে পারে না। এলোকের জন্য দুনিয়া ও অখিরাতে ভয়ংকর পরিণতি অপেক্ষা করছে। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা আল-মায়িদা ঃ ৭২)

জাবির (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুর শিরক করার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জাহান্নামে যাবে। (সহীহ মুসলিম)

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে শরীক হল না কিংবা দ্বীন প্রতিষ্ঠা নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনাও করল না আর এই অবস্থায়-ই মারা গেল, সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করল। (সহীহ মুসলিম)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ

দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্রই আল্লাহর আযাব নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা (তা হতে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্যে) দু'আ করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দু'আ কবুল হবে না। (জামে আত তিরমিযী)

ইসলাম নিয়ে বিদ্রূপের ভয়ঙ্কর প্রবণতা

যে কর্মগুলো সম্পাদনের মাধ্যমে মানুষ ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায় এবং জাহান্নাম হয়ে যায় তার স্থায়ী ঠিকানা, তার একটি হলো আল্লাহ, তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাঁর কিতাব (কুরআন শরীফ) অথবা মুমিনদের বিদ্রূপ করা। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রয়োজন সুপরিসর জায়গা এবং দীর্ঘ সময়। তাই আমরা নিচের কয়েকটি উপশিরোনামে ভাগ করে বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্ট করছি, ইনশাআল্লাহ।

১. বিদ্রূপের সংজ্ঞা এবং এর কিছু দৃষ্টান্ত।
২. বিদ্রূপের বিধান, বিদ্রূপকারীর কুফরের প্রমাণ এবং এ ব্যাপারে আলিমদের অভিমত।
৩. বিদ্রূপকারীর তাওবার বিধান, তা কবুল হবে কি হবে না?
৪. বর্তমান যুগের বিদ্রূপের কিছু চিত্র।

বিদ্রূপের সংজ্ঞা ঃ

আরবী যে ইস্তিহযা' শব্দের অর্থ করা হয়েছে বিদ্রূপ, তার উদ্ভব استهزأ يستهزئ শব্দ থেকে। আরবী এ শব্দের ধাতুমূল হলো (ء– ز –ه), শব্দটি বরাবরই ব্যবহৃত হয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও খেল-তামাশা অর্থে। [ইবন ফারেস, মাকায়ীস # ৬/৫২; রাগেব ইসফাহানী, মুফরাদাত # ৫৪০]

আলিমদের মতে বিদ্রূপ দুই প্রকার। যথা :

১. প্রত্যক্ষ বিদ্রূপ ঃ

এটা হলো সেসব লোকদের ব্যঙ্গোক্তি যা সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছিল। আর তা হলো, মুনাফিকদের বাক্য : 'আমাদের এই পাঠকদের মতো আর দেখিনি, এরা সবচেয়ে বড় পেটুক। কিংবা এই ধরনের অন্য যে কোনো কথা যা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হিসেবেই বলা হয়ে থাকে। যেমন কেউ বলল, তোমাদের এ ধর্ম খারাপ।

কিংবা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধকারীকে দেখে কেউ বলল, দেখ তোমাদের সামনে এক জব্বর পরহেযগার এসেছে। এককথায় উপহাস ও বিদ্রূপের হেন বাক্য নেই যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। [মাজমু'আতুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা : ৪০৯]

শায়েখ ফাওযান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এসব কথার মতোই অভিন্ন হুকুম সেই কথাগুলোর বর্তমানে যা অনেকে উচ্চারণ করে থাকেন। যেমন : 'আরে এই একবিংশ শতাব্দীতে ইসলাম অচল', 'ইসলাম এক মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা', 'ইসলাম মানে পশ্চাৎপদতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা', 'ইসলামের দণ্ডবিধি ও ফৌজদারি বিধিতে রয়েছে বর্বরতা ও অমানবিকতা', 'তালাক বৈধ করে এবং একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়ে ইসলাম নারীর উপর জুলুম করেছে' ইত্যাদি উক্তি। এসবের সঙ্গে আরও যোগ করা যায় নিচের উক্তিগুলোকে :

'শরীয়া ব্যবস্থার চেয়ে মানব রচিত ব্যবস্থায়ই আমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর'। কেউ শিরক ও কবরপূজা পরিহার করে তাওহীদের প্রতি সমর্পিত হবার আহ্বান জানালে তাকে এমন বলা, 'সে একজন চরমপন্থী', 'সে মুসলিম জামাতে বিভক্তি সৃষ্টি করতে চাইছে', 'সে ওহাবী', 'সে দেখছি পঞ্চম মাজহাব প্রবর্তন করতে চাইছে'। এককথায় ইসলাম, মুসলিম ও বিশুদ্ধ আকীদার প্রতি বিদ্রূপাত্মক সব কথাই এর অন্তর্ভুক্ত। [কিতাবুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা : ৪৭]

২. পরোক্ষ বিদ্রূপ ঃ

পরোক্ষ বিদ্রূপ বা কটাক্ষের কোনো নির্ধারিত সীমা বা বাক্য নেই। যেমন : পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের সময় কিংবা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস চর্চা বা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে দেখে চোখ টিপে দেয়া, জিভ বের করা, ঠোঁট প্রলম্বিত করা কিংবা হাতে ইশারা করে ভেংচি কাটা ইত্যাদি। [মাজমু'আতুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা : ৪০৯]

ইসলাম নিয়ে বিদ্রূপের পরিণাম ঃ

ইসলামকে বিদ্রূপ করা, ব্যঙ্গ বা কটাক্ষ করা সরাসরি কুফরের নামান্তর। যে দশটি কাজের মাধ্যমে মানুষ ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় তার অন্যতম এই বিদ্রূপ। তাছাড়া এটি মুনাফিকদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে অনেক প্রমাণ বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে ? (সূরা আত-তাওবা ঃ ৬৫)

নিশ্চয় যারা অপরাধ করেছে তারা মুমিনদেরকে নিয়ে হাসত। আর যখন তারা মুমিনদের পাশ দিয়ে যেত তখন তারা তাদেরকে নিয়ে চোখ টিপে বিদ্রূপ করত। আর যখন তারা পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসত তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে ফিরে আসত। আর যখন তারা মুমিনদের দেখত তখন বলত, 'নিশ্চয় এরা পথভ্রষ্ট'। (সূরা আল-মুতাফফিফীন ঃ ২৯-৩২)

তারা আল্লাহর কসম করে যে, তারা (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের জড়িয়ে) ব্যঙ্গাত্মক কিছু বলেনি, অথচ তারা কুফরী বাক্য বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী করেছে। আর মনস্থ করেছে এমন কিছুর যা তারা পায়নি। (সূরা আত-তাওবা ঃ ৭৪)

এসব আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট ঃ

ইবন উমর, মুহাম্মাদ ইবন কা'ব, যায়েদ ইবন আসলাম ও কাতাদা প্রমূখ রাদিআল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি গাযওয়ায়ে তাবূকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিল। সে বলল, 'আমাদের এই লোকদের চেয়ে বড় পেটুক, এদের চেয়ে অধিক মিথ্যাভাষী দেখিনি এবং যুদ্ধের সময় এদের চেয়ে ভীরু আর কাউকে দেখিনি'। সে তার কথার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের দিকে ইঙ্গিত করছিল। এ কথা শুনে আবদুর রহমান ইবন আউফ রাদিআল্লাহু আনহু গেলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। দেখলেন কুরআন তাঁর চেয়ে আগ্রবর্তী হয়েছে (তিনি বলার আগেই সে বিষয়ে কুরআনের ওহী নাযিল হয়েছে)।

অতপর ওই ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এলো। ততক্ষণে তিনি পথ চলতে শুরু করেছেন এবং তাঁর উটনীর পিঠে উঠে বসেছেন। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল, আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। আর দশজন আরোহীর মতো আমরা গল্প-গুজবের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম। ইবন রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি যেন তার সে দৃশ্য অবলোকন করছি, সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনীর জিনের বেল্টের সঙ্গে লেপ্টে আছে আর তার দু পায়ের সাথে পাথরের ঘঁষা লাগছে। সে বলছে,

আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উদ্দেশে বললেন,

আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে ? (সূরা আত-তাওবা ঃ ৬৫)

তিনি আর কথা বাড়ালেন না। তার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। [তাফসীর ইবন জারীর # ১৬৯৭০, পৃষ্ঠা নং ৪০৩৬/৫]

শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহ. বলেন, আল্লাহ, তাঁর কুরআনের আয়াতসমূহ ও তাঁর রসূলকে কটাক্ষ করা কুফরী। এর মাধ্যমে একজন মানুষ ঈমান আনার পরও কাফির হয়ে যায়। [মাজমু' ফাতাওয়া # ২৭৩/৭]

ইমাম নাববী রহ. বলেন, যদি কেউ মদের পাত্র আদান-প্রদানের সময় কিংবা ব্যভিচারে লিপ্ত হবার প্রাক্কালে আল্লাহকে তাচ্ছিল্য করে বিসমিল্লাহ বলে, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। [রাওদাতুত তালিবীন # ৬৭/১০]

শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহাব রহ. তদীয় গ্রন্থ 'আত-তাওহীদ' এ বলেন, 'এ অধ্যায় তার আলোচনায় যে আল্লাহর যিকর বা কুরআন অথবা রসূলকে তাচ্ছিল্য করে': প্রথম হলো আর সেটিই সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ: যে এসবকে বিদ্রূপ করবে সে কাফির। [আত-তাওহীদ : ৫৮]

শায়খ সুলায়ইমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহাব বলেন, যে এ ধরনের কিছু বলবে তার কাফির হওয়ার ব্যাপারে সকল আলিম একমত। অতএব যে আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল অথবা তাঁর দ্বীনকে বিদ্রূপ করবে, প্রকৃতই ঠাট্টাচ্ছলে এমন বললে সবার ঐকমত্যে সে কাফির হয়ে যাবে। [তাইসীরুল আযীযিল হামীদ : ৬১৭]

শায়খ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম রহ. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে দাড়িকে ঘৃণা করবে এবং বলবে এটি আবর্জনা, সে কি মুরতাদ হয়ে যাবে? উত্তরে তিনি বলেন, যদি সে জানে যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক দাড়ি প্রমাণিত, তাহলে তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত দ্বীনকে অস্বীকার করার শামিল হবে। ফলে তাকে মুরতাদ আখ্যা দেয়াই হবে যুক্তিযুক্ত। [ফাতাওয়া শায়খ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম # ১৯৫/১১]

সেই বাক্যগুলোর মাধ্যমেও মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় যে কুফরী বাক্যগুলো মুসলিম সন্তানেরা বেখেয়ালে অহরহই উচ্চারণ করে থাকেন। ইমাম

বুখারী ও মুসলিম রহিমাহুমাল্লার একটি হাদীস এখানে তুলে ধরা যায়। আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

'নিশ্চয় বান্দা অনেক সময় এমন বাক্য উচ্চারণ করে যার অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে ভেবে দেখা হয় না। অথচ তা তাকে জাহান্নামের এত নিচে নিক্ষেপ করে যার দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝের দূরত্ব থেকেও বেশি।' [সহীহ বুখারী # ৬৪৭৭; সহীহ মুসলিম # ৭৬৭৩]

বিদ্রূপকারীর তাওবা ঃ

বিদ্রূপকারীর তাওবা সম্পর্কে শায়খ ইবন উসাইমীন রহ. তাঁর 'আল-কাওলুল মুফীদ ফী শারহি কিতাবি আত-তাওহীদ' গ্রন্থে বলেন ঃ 'অতপর জেনে রাখুন, আল্লাহ, রসূল ও কুরআনকে কটাক্ষকারীর তাওবা গ্রহণযোগ্য কি-না এ সম্পর্কে আলিমগণের দুই রকম মত ব্যক্ত হয়েছে:

প্রথম. তার তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়। হাম্বলীদের মাঝে এ মতটি অধিক প্রসিদ্ধ। আদালত তাকে কাফির হিসেবে মত্যুদণ্ড প্রদান করবে। তার জানাযা পড়া হবে না আর তার জন্য দু'আও করা হবে না। মুসলিমদের কবরস্থান থেকে দূরে কোথাও তাকে কবর দেওয়া হবে। যদিও বলা হয় সে তওবা করেছে অথবা ভুল করেছে। কারণ, তাঁরা বলেন, এই ধর্মত্যাগ বা আল্লাহদ্রোহিতার ব্যাপারটি বড় ভয়াবহ। এর তাওবাও কার্যকর হয় না।

দ্বিতীয়. তবে অপর একদল আলিমের মতে, তার তাওবা কবুল করা হবে যখন আমরা জানব যে সে আন্তরিকভাবে তাওবা করেছে, হৃদয় থেকে ভুল স্বীকার করেছে এবং আল্লাহকে তাঁর যথাযোগ্য বিশেষণে বিশেষিত করেছে। আর তাঁরা তা বলেছেন তাওবা কবুলের ঘোষণা সম্বলিত আয়াতটি ব্যাপক হবার যুক্তিতে। আল্লাহ যেমন বলেছেন,

বল, 'হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আয-যুমার ঃ ৫২) ['আল-কাওলুল মুফীদ ফী শারহি কিতাবি আত-তাওহীদ # ২৬৮/২]

ইদানীং ইসলামকে বিদ্রূপ ও কটাক্ষের যেসব রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তার মধ্যে রয়েছে ওই সব কটূক্তি ও ব্যঙ্গচিত্র যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ফেইসবুক ও

ব্লগে দেখা যায়। তথাকথিত মত প্রকাশের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে এসব প্রকাশ করা হলেও এসবের পশ্চাতে থাকে দ্বীন ইসলাম বিমুখতা ও ইসলাম থেকে বিদ্রোহের মানসিকতা।

একজন এঁকেছে একটি মোরগ আর তার অনুসরণ করছে চারটি মুরগী। এর মাধ্যমে সে একাধিক বিয়েকে ব্যঙ্গ করেছে। আরেকজন একটি প্রবন্ধ লিখেছে, যাতে হিজাব ও পর্দা বিধানের উপর ন্যাক্কার হামলা চালানো হয়েছে। সে বলছে এটি হলো পশ্চাৎপদতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রকাশ। আরেক জনকে দেখা গেছে সে পবিত্র কুরআনকে কবিতা বানিয়ে গানের মতো বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সুর দিয়ে পড়ছে। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

আমাদের জেনে রাখা দরকার যারা এসব ব্যঙ্গচিত্র ও কটূক্তির সাথে যারা জড়িত তীব্রভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে। এ কাজের ভয়াবহ অশুভ পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট হয়, তা না হলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকে জাহান্নামে একত্রকারী।' (সূরা আন-নিসা ঃ ১৪০)

শায়খ আবদুল আযীয ইবন বায রহ. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যেসব পত্রিকা ও ব্লগ বা বই-পুস্তক নাস্তিক্যবাদী প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও ব্যঙ্গচিত্র ছাপে এবং কাফির, ফাসেক ও বিশৃঙ্খলাকারীদের ইন্ধন যোগায়, সেসব কেনা-বেচা এবং তার প্রচার করা কি জায়েয আছে?

তিনি উত্তর দেন : যেসব পত্রিকা এ কাজ করে ওয়াজিব হলো তাদের বয়কট করা এবং সেগুলো ক্রয় না করা। আর রাষ্ট্র যদি ইসলামি হয় তাহলে কর্তব্য হবে তা নিষিদ্ধ করা। কারণ এসব বই ও পত্রপত্রিকা সমাজ ও মুসলিমদের জন্য এসব বড্ড ক্ষতিকর। তাই মুসলিমদের দায়িত্ব হবে এসবের কেনা ও বেচা এবং এসবের যে কোনো ধরনের প্রচার বর্জন করা আর মানুষকে এসব বর্জনের প্রতি আহ্বান জানানো। এদিকে দায়িত্বশীলদের কর্তব্য হবে এসবকে একেবারে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। [আল-মাওসু' আল-বাযিয়া ফিল মাসাইলিন নিসাইয়্যা # ১২৭৪/২]

আল্লাহকে সম্মান করা ও তাকে গালমন্দকারীর বিধান

আল্লাহ তা‘আলার নিয়ামত অগণিত, যার যথাযথ শোকর আদায় করা কখনো সম্ভব নয়। তিনি ইহকাল ও পরকালের মালিক এবং তাঁর নিকট সবার প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তাঁর কোনো শরীক নেই, একমাত্র তিনি ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ বা মাবুদ নেই।

যুক্তি ও বিবেকের সবচেয়ে বড় দাবী হচ্ছে, সৃষ্টিকর্তার মর্যাদা ও সম্মান জানা যাঁর তাওহীদের ঘোষণা দেয় গোটা সৃষ্টিজগত। সকল সৃষ্টজীব সৃষ্টিকর্তার বড়ত্ব, মহান সৃষ্টির কারুকার্য ও নিখুঁত পরিকল্পনার স্বাক্ষর বিদ্যমান। মানুষ যদি নিজের দিকে মনোনিবেশ করে ও চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে অবশ্যই তারা সৃষ্টিকর্তার মহত্ত্ব নিয়ামত নিজেদের মাঝে দেখতে পাবে।

নবী নূহ আলাইহিস সালাম তার জাতিকে স্বীয় নফস ও সৃষ্টির স্তরসমূহ সম্পর্কে চিন্তার আহ্বান করেছেন, যেন তারা নিজেদের উপর সৃষ্টিকর্তার হক অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহকে সম্মান করা ও তার অধিকার জানার জন্য নিজের নফস ও সৃষ্টির স্তরসমূহ দেখাই যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি আসমান ও জমিনে বিদ্যমান সকল সৃষ্টজীবের বিষয়ে চিন্তা করবে তার অবস্থা কেমন হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মানুষ আল্লাহর মর্যাদা বুঝে না, কারণ তারা তার নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে দেখে না; চিন্তা গবেষণা করেনা, তারা দেখে শুধু উপভোগ করার জন্য, দ্রুত অবহেলার দৃষ্টিতে।

বিমুখ অন্তর ও গাফিল হৃদয়কে এসব নিদর্শন আকৃষ্ট করে না, মুজিযাসমূহ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না। একমাত্র তারাই আল্লাহকে মর্যাদা দেয় যারা তার নিদর্শন দেখে ও তার গুণ গায়। গাফিল ও বিমুখ অন্তরে আল্লাহর মর্যাদা মূল্যহীন, ফলশ্রুতিতে তার সাথে কুফরী ও তার নাফরমানী করা হয়, কখনো তাকে গালি দেওয়া হয়, তার সাথে উপহাস করা হয়। মহান আল্লাহর মহত্ব সম্পর্কে যতটুকু অজ্ঞতা অন্তরে থাকে তাঁর সেপরিমাণ অবাধ্যতা করা হয়, অন্ত র থেকে তাঁর যে পরিমাণ মর্যাদা হ্রাস পায়, সে পরিমাণ কুফরী করা হয়। আর দুর্বলের আনুগত্য তার দুর্বলতা সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিমাণ অনুযায়ীই করা হয়, অন্তরে যে পরিমাণ তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, সে পরিমাণ তার ইবাদত করা হয় ও তাকে সম্মান করা হয়।

- আল্লাহ তা'আলাকে সম্মান করার অন্যতম একটি উপায় হচ্ছে : তার সিফত ও গুণগানের জ্ঞান হাসিল করা, তার নিদর্শনসমূহ নিয়ে চিন্তা করা, তার নিয়ামত ও অনুগ্রহসমূহ নিয়ে ভাবা। অতীতের জাতিগুলোর অবস্থা, সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী, মুমিন ও কাফিরদের পরিণতি জানা ও সেগুলো থেকে উপদেশ গ্রহণ করা।

- আল্লাহ তা'আলাকে সম্মান করার আর একটি উপায় হচ্ছে : তাঁর শরীয়ত, আদেশ-নিষেধগুলো জানা ও পালন করা, তার বিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও সাধ্যানুসারে তার উপর আমল করা। কারণ এগুলো অন্তরে ঈমানকে পুনর্জীবিত করে। কেননা, ঈমানেরও জ্যোতি ও উত্তাপ আছে। কিন্তু যিনি নির্দেশ প্রদান করলে তাঁর নির্দেশনা অনুসরণ করা হয় না, যিনি নিষেধ করলে তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা হয় না, তাঁর প্রতি ঈমানের উত্তাপ হ্রাস পাবে ও জ্যোতি নিষ্প্রভ হবে।

- আদেশ ও নিষেধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মানে হুকুমদাতাকে সম্মান করা। তাই নাস্তিকতা, আল্লাহকে অস্বীকার করা ও তার সাথে কুফরী করার পূর্বে, তার আদেশ ও নিষেধের প্রতি উপেক্ষা ও তার সাথে তাচ্ছিল্যের আচরণ প্রকাশ পায়।

সারসংক্ষেপ ঃ

যেসব কথা বা কর্ম দ্বারা আল্লাহকে খাটো ও হেয় করা হয় সেটাই কুফরী। এই অপমান ইচ্ছায় হোক, খেল-তামাশা করে হোক, কিংবা অবহেলা ও মূর্খতা করে হোক না কেন এটা যে কুফরি এতে কোনো মুসলিমের দ্বিমত নেই। এ ব্যাপারে উদ্দেশ্য কিংবা নিয়ত দিয়ে কিছু আসবে যাবে না, বরং বাহ্যিক অবস্থার উপরই ফয়সালা করা হবে।

আল্লাহ তা'আলাকে অপমান করা সকল কুফরী অপেক্ষা বড় কুফরী, এমনকি মূর্তিপূজকদের কুফরী অপেক্ষাও বড়। এর কারণ হলো মূর্তিপূজক আল্লাহ অপমান করে না, সে শুধু তার মূর্তিকে আল্লাহর মর্যাদা দেয়। কারণ তারা আল্লাহর প্রতি তাদের সম্মান থেকে পাথরকে অধিক সম্মান করে। তারা আল্লাহর সম্মান কমিয়ে আল্লাহকে পাথরের সমকক্ষ করে নি, বরং তারা পাথরের সম্মান বৃদ্ধি করে পাথরকে আল্লাহর সমকক্ষ করেছে। তারা তাদের ধারণা মতে, আল্লাহর সম্মানের অংশ হিসেবে পাথরকে সম্মান করে, পক্ষান্তরে আল্লাহকে গালমন্দকারী তাঁকে নীচে নামায়, যেন তিনি তার গালির কারণে পাথরের চেয়ে

মূল্যহীন হন। মুশরিকরা তাদের প্রভুকে খেলার ছলেও গালি দেয় না, কারণ তারা প্রভুকে সম্মান করে।

যারা তাদের প্রভুকে গালি দেয়, তাদেরকে মুশরিকরা গালি দেয়। মুশরিকরা যদিও কাফির, তবু আল্লাহ তার নবীকে তাদের মূর্তিদের গালমন্দ করতে নিষেধ করেছেন, যেন তারা এরচেয়ে বড় কুফরীতে লিপ্ত না হয়, অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাবুদকে গালি দিয়ে না ফেলে।

আল্লাহকে গালমন্দ করা বাহ্যিক ও অন্তরের ঈমানের এবং স্বীকৃতিরও পরিপন্থী, অর্থাৎ সেটা আল্লাহকে বিশ্বাস করা, তার অস্তিত্বের উপর ঈমান আনা ও একমাত্র তিনি ইবাদতের হকদার; এই আকীদার পরিপন্থী।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতা

ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতা

ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism) মতবাদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন

ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ ইংরেজী Secularism শব্দেরই বাংলা অনুবাদ। ইসলাম হল আল্লাহর অনুমোদিত ধর্ম। আল্লাহ যা যা বানিয়েছেন, শয়তান ঠিক তার উল্টোটা বানিয়েছে। যেমন, আল্লাহ বানিয়েছেন খিলাফত আর শয়তান বানিয়েছে মূলূকীয়া বা রাজতন্ত্র। আল্লাহ বানিয়েছেন যাকাত ব্যবস্থা আর শয়তান বানিয়েছে সুদভিত্তিক অর্থনীতি। আল্লাহ বানিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম আর শয়তান বানিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা অজ্ঞতার কারণে বলে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। আসলে বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থই হচ্ছে ধর্মহীনতা। বিশ্ববিখ্যাত সব Dictionary থেকে জানা যাক ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কী?

<u>Random House Dictionary of English Language-</u>র মতে ঃ

1. Not regarded as religious form or spiritually sacred - এর অর্থ হল ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বলে বিবেচিত নয়।

2. Not pertaining to or connected with any religion – যা কোন ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়।

3. Not belonging to any religious order - যা কোন ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত নয়। এটার নামই হল Secularism.

Chambers Dictionary-র মতে ঃ

The belief that the state morals s«ohould be independent of religion. অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ হচ্ছে এমন এক বিশ্বাস যার মতে রাষ্ট্র-নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছু অবশ্যই ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে হবে।

Oxford Dictionary-র মতে ঃ

Secularism means that the doctrine should be based solely on the wellbeing of the mankind in the recent life to the exclusion of all religious considerations drawn from belief in God. - এর অর্থ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ হচ্ছে এমন এক মতবাদ যা আল্লাহতে বিশ্বাস বা পরকালে বিশ্বাস-নির্ভর সমস্ত বিবেচনা থেকে মুক্ত। মানবজাতির বর্তমান কল্যাণ চিন্তার উপর ভিত্তি করে এই নৈতিকতা ও মতবাদ গড়ে উঠবে।

Encyclopedia Britannica-র মতে ঃ

1) Secular spirit or tendency especially based on social philosophy that rejects all forms of religious faith. ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ হচ্ছে সেই ধর্মহীন রাজনৈতিক দর্শন যা সকল ধর্মবিশ্বাসকেই প্রত্যাখান করে।

2) The view the public education and other matters of civil society should be conducted without the introduction of religious elements. এমন দৃষ্টিভঙ্গি যা সমাজের শিক্ষা ও অন্যান্য সাধারণ বিষয়গুলো কোন ধর্মীয় বিধান বা অনুশাষণ থেকে মুক্ত অবস্থায় পরিচালিত।

ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য ঃ Dictionary-র সংজ্ঞা তো দেখলাম। এবার আল্লাহ কী বলছেন তা দেখি ঃ

"তোমরা কি কুরআনের কিছু অংশ মান আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যারাই এরূপ আচরণ করবে তাদের এছাড়া আর কী শাস্তি হতে পারে যে তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে? তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ অবগত আছেন।" (সূরা আল বাকারা ২ ঃ ৮৫)

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত মানে কিন্তু কুরআনের বিচার মানে না, কুরআনের অর্থনীতি মানে না, কুরআনের পররাষ্ট্রনীতি মানে না, কুরআনের সমাজনীতি মানে না, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রাজনীতি মানে না। ধর্ম আর রাজনীতিকে তারা আলাদা করে – সেজন্য আল্লাহ বলেন, তোমরা কুরআনের কিছু কথাকে করবে বিশ্বাস আর কিছু কথাকে করবে অবিশ্বাস/অস্বীকার – এ কাজটি যদি কর – দুনিয়াতে তোমাদেরকে লাঞ্ছনার জীবন দেয়া হবে – আর দেয়া হবে কিয়ামতে কঠিন শাস্তি (জাহান্নাম)। ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ এমন এক বিষাক্ত মতবাদ যা ঐশ্বরিক নয় – যা সম্পূর্ণ মানব-রচিত – ধর্মদ্রোহী/আল্লাহদ্রোহী মতবাদ – একটি কুফরী মতবাদ। রাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদের মূল কথা –

১) রাষ্ট্রনীতির সাথে ধর্ম সংযুক্ত থাকবে না;

২) ধর্ম থাকবে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ;

৩) রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনায় কোনভাবেই ধর্মকে বিবেচনা করা হবে না;

৪) মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ইসলাম হতে মুক্ত শাসন। ইসলামকে ব্যক্তির জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে;

৫) ধর্মনিরপেক্ষতা মানে হচ্ছে রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি তথা সমাজ ও রাষ্ট্রসম্পৃক্ত সকল কিছু থেকে ইসলামকে বর্জন করা। তাই ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ মুসলিম বিশ্বের জন্য এক মারাত্মক অভিশাপ।

আইন করে ধর্মীয় প্রবণতাকে মানুষের ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার নামই ধর্মনিরপেক্ষতা। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্ত র্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে পরিত্যাগ করাই এর লক্ষ্য। সে হিসেবে এ মতবাদকে ধর্মহীনতা বলাই সমীচীন। ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

“তারাই সেই লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিনষ্ট/নিষ্ফল হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। তারাই সেই লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য তাদের আমলকে ওজনের কোন মানদন্ড স্থাপন করবো না। জাহান্নামই তাদের

প্রতিফল; কারণ তারা কাফির হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে। (সূরা কাহাফ ঃ ১০৪-১০৬)

Secularism-এর যারা পূজারী তাদের চরিত্রে ও তাদের প্রতিটি কর্মের মধ্যে থাকে দুনিয়ার কোন স্বার্থ পূরণের ভাবনা। সে চেতনায় আখিরাতের কোন ভাবনা থাকে না। বস্তুত সেক্যুলারিজমের আভিধানিক অর্থ হলো ইহলৌকিকতা। সে ইহলৌকিক ভাবনা নিয়েই তাদের রাজনীতি এবং তা নিয়েই তাদের সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তি। প্রতিটি কর্মের মধ্যে সেক্যুলারিস্টগণ তাই নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থসিদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রাপ্তির বিষয়টি সর্বাগ্রে দেখেন। স্বার্থলাভ ও অর্থনৈতিক প্রাপ্তি ছাড়া কেউ কোন কাজ করতে পারে এটা তারা ভাবতেও পারে না।

বাস্তবতা ঃ বাংলাদেশে যারা ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে কথা বলেন তাদের মূল মাথা ব্যাথা হলো ইসলামকে নিয়ে। এরা অন্য ধর্মের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে খুবই গর্বিত বোধ করে কিন্তু কোন ইসলামিক অনুষ্ঠানে যোগ দেয়াকে খুবই খারাপ দৃষ্টিতে দেখে। এদের ইচ্ছা হলো সকল ধর্ম তার জায়গা মতোই থাকবে শুধু ইসলামকে বাদ দিতে হবে।

"লাকুম দীনুকুম ওয়াল ইয়াদীন" আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা

অনেক বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিবিদ সূরা কাফিরুনের (কুরআনের ১০৯ নম্বর সূরা) শেষের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে থাকেন। তারা বলেন, আল্লাহ নিজেই তো ধর্মনিরপেক্ষ। তখন তারা সূরা কাফিরুনের শেষ আয়াত quote করে বলেন যে "লাকুম দীনুকুম ওয়াল ইয়াদীন" অর্থাৎ তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার। কিন্তু তারা এই সূরার আগের আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পড়েন না এবং এই সূরা নাযিলের উদ্দেশ্যই জানেন না। কখন এবং কেন আল্লাহ তাঁর নবীকে (সা.) এই কথা কাফিরদেরকে বলতে বলেছিলেন সে সম্পর্কে এদের কোন ধারণাই নেই। দেখা যাক পুরো সূরাতে আল্লাহ কাফিরদেরকে কী বলছেন। আল্লাহ নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন...

(১) বল ঃ হে কাফিররা! (২) আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর। (৩) এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। (৪) এবং আমি ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা করে আসছো। (৫) এবং তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। (৬) তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল (দ্বীন) এবং আমার জন্য আমার কর্মফল (দ্বীন)।

কাফিররা যখন ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করছিল না এবং এক পর্যায়ে তারা রসূল (সা.)-কে প্রস্তাব দিয়েছিল যে ঠিক আছে, আসুন আমরা একটা চুক্তি করি। আপনি কিছুদিন আমাদের মূর্তি পূজা করবেন তারপর আমরা কিছুদিন আপনার ইসলাম পালন করবো। এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা কঠোর হয়ে বলেছেন ঐ চুক্তির কোন প্রয়োজন নেই, বল তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার। অর্থাৎ বিধর্মী ও ধর্মহীনরা (যেমন আজকের বুদ্ধিজীবি শ্রেণী) তোমরা তোমাদের ধর্মবিশ্বাস বা অবিশ্বাস নিয়েই থাকো আমরা মুসলিমরা আমাদের ধর্ম নিয়েই থাকব। অতএব এই আয়াত এবং এই সূরা ধর্ম নিরপেক্ষতার সম্পূর্ণ বিপরীত।

এই আয়াতটি বুঝার জন্য আমাদেরকে সবগুলো মক্কী সূরার তাফসীর ভাল করে পড়তে হবে। শুধু মাঝখান থেকে একটি বা দুটি আয়াত নিয়ে quote করলে হবে না কারণ তাতে ভুল ব্যাখ্যার আশংকাই অধিক, যেমনটি আজকাল হচ্ছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদের ইতিহাস

Secularism (সেকিউলারিজম) শব্দের সঠিক অনুবাদ হচ্ছে- ধর্মহীনতা। তবে বাংলা ভাষায় শব্দটির অনুবাদ তা না করে করা হয়ে থাকে ধর্মনিরপেক্ষতা। বস্তুত এ মতবাদটি ধর্মকে এড়িয়ে নিছক বস্তুবাদী স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে মানববিদ্যা ও বুদ্ধির ভিত্তিতে মানবজীবন প্রতিষ্ঠার প্রতি আহ্বান করে। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি বলতে বুঝানো হয় - ধর্মের প্রভাবমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা। এ মতবাদটি ১৭শত শতাব্দীতে ইউরোপে আত্মপ্রকাশ করে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এটি প্রাচ্যে প্রসারিত হয়। প্রথমদিকে মিসর, তুরস্ক, ইরান, লেবানন, সিরিয়াতে প্রসার লাভ করে। ধীরে ধীরে তিউনিশিয়াতে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ইরাকে প্রসারিত হয়। এছাড়া বিংশ শতাব্দীতে এসে অন্যান্য আরব দেশগুলোতেও বিস্তার লাভ করে।

আরব বিশ্বে এই মতবাদকে বুঝাতে ‘লা-দ্বীনিয়্যাহ্’ (لا دينية) বা ‘ধর্মহীনতা’ বলার কথা থাকলেও এ মতবাদের প্রবর্তকরা সে শব্দটির পরিবর্তে ‘ইলমানিয়্যাহ্’ (علمانية) বা ‘বিজ্ঞানময়’ শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। প্রথম দৃষ্টিতে কারও কারও মতে হতে পারে যে শব্দটি বোধ হয় ‘ইলম’ তথা ‘জ্ঞান’ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। বস্তুত বিষয়টি এ রকম নয়। এ মতবাদের সাথে বিজ্ঞান বা Science-এর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু তারা এ শব্দটি ব্যবহারে বেশি সাচ্ছন্দ্য বোধ করে; কারণ শব্দটিকে জ্ঞানের দিকে সম্পর্কযুক্ত করতে পারলে আরব সমাজে অপেক্ষাকৃত কম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। তাই এ বিভ্রান্তির নিরসনার্থে শব্দটিকে আরবীতে ‘ইলমানিয়্যাহ্’ উচ্চারণ না করে ‘আলামানিয়্যাহ’ বলা উচিত।

আগেই বলা হয়েছে যে, এ মতবাদের শুরুতে এর জন্য Secularism শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যার অর্থ হচ্ছে ধর্মহীনতা বা ধর্মের সাথে সম্পর্কহীনতা। কিন্তু বাংলাভাষাভাষি মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এর একটি ভুল অনুবাদ করা হয়ে থাকে, আর বলা হয় যে, এর অর্থ, ধর্মনিরপেক্ষতা।

এ প্রবন্ধে এটাকে এ প্রচলিত অর্থেই বর্ণনা করা হচ্ছে যাতে পাঠকগণ সেটাকে তার আসল অর্থে বুঝে নিতে পারেন।

Secularism, যাকে ধর্মনিরপেক্ষতা বলা হয়ে থাকে, তার সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে- রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা, বাদ দেয়া। ধর্ম ব্যক্তির অন্তরের খাঁচায় বন্দী থাকবে। ধর্মের পরিধি ব্যক্তি ও তার উপাস্যের

সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ধর্মকে প্রকাশ করার কোনো সুযোগ থাকলে সেটা শুধুমাত্র উপাসনাতে এবং বিবাহ ও মত্যু সংক্রান্ত রসম-রেওয়াজে থাকবে।

রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা রাখার ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে খ্রিস্টান ধর্মের মিল রয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতা থাকবে সীজার (Caesar) বা কায়সার (খ্রিস্টান সরকার প্রধানের উপাধি) এর হাতে, আর গির্জার ক্ষমতা থাকবে আল্লাহর হাতে। যীশুর নামে প্রচারিত বাণী ‘‘সীজারের অধিকার সীজারকে দাও এবং আল্লাহর অধিকার আল্লাহকে দাও’’ থেকেও এ বিষয়টি সুস্পষ্ট। কিন্তু ইসলাম এ ধরনের দ্বিমুখী নীতির অনুমোদন করে না। মুসলিম নিজেও আল্লাহর মালিকানাধীন এবং তার গোটা জীবনও আল্লাহর জন্য। কুরআনে কারীমে এসেছে, ‘‘হে রসূল! আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার সলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য।’’ [সূরা আন‘আম ঃ ১৬২]

ধর্মনিরপেক্ষতার উৎপত্তি ও উল্লেখযোগ্য ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব

- এই মতবাদটি প্রথমে ইউরোপে প্রসার লাভ করে। তারপর প্রাশ্চাত্যের উপনিবেশিক শাসন ও কমিউনিজমের প্রভাব-প্রতিপত্তির সুবাদে বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করে। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে শিল্প বিপ্লবের আগে ও পরের বেশকিছু পরিস্থিতি ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপক প্রসার ঘটায় এবং ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ ও চিন্তাধারার বিকাশ ঘটায়। নীচে ক্রমানুসারে ঘটনাগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

- এক্লিরোস, বৈরাগ্যবাদ, ঐশ্বরিক নৈশভোজ (Holy Communion), ক্ষমাপত্র (Indulgence) বিক্রি ইত্যাদির আড়ালে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ তাগুতী শক্তি, পেশাদার রাজনীতিবিদ ও স্বৈরাচারীতে পরিণত হয়েছিল।

- গির্জাগুলোর (christian Churches) বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অবস্থান, মানুষের চিন্তাধারার উপর গির্জার একচ্ছত্র আধিপত্য, গির্জা কর্তৃক Inquisition কোর্ট গঠন করা এবং বিজ্ঞানীদেরকে ধর্মদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্তকরণ। উদাহরণ স্বরূপ ঃ

- কোপার্নিকাস (Copernicus) : (১৪৭৩-১৫৪৩ খৃঃ) ১৫৪৩ সালে "আকাশে গ্রহ নক্ষত্রের আবর্তন" নামক একটি বই প্রকাশ করেন। গির্জা কর্তৃক বইটি নিষিদ্ধ করা হয়।
- গ্যালিলিও (Galileo) : (১৫৬৪-১৬৪২ খৃঃ) টেলিস্কোপ আবিস্কার করার কারণে ৭০ বছর বয়সী এই বিজ্ঞানীর উপর কঠোর নির্যাতন নেমে আসে। ১৬৪২ সালে তিনি মারা যান।
- স্পিনোজা (Spinoza) : (১৬৩২-১৬৭৭ খৃঃ) তিনি ইতিহাস সমালোচনার প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর শেষ পরিণতি হয়েছিল তরবারীর আঘাতে মৃত্যুদণ্ড।
- জন লক (John Locke) : (১৬৩২-১৭০৪ খৃঃ) তিনি দাবী উত্থাপন করেছিলেন যে, স্ববিরোধিতা পাওয়া গেলে ঐশীবাণীর বিপক্ষে বিবেকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

- বিবেকবুদ্ধি ও প্রকৃতি নীতির উদ্ভব ঃ ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গ বিবেকের মুক্তির দাবী তোলেন এবং প্রকৃতিকে উপাস্যের বিশেষণে বিশেষিত করার দাবী জানান।

- ফরাসি বিপ্লব ঃ গীর্জা ও নতুন এ আন্দোলনের মাঝে দ্বন্দের ফলে ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে একটি সরকার গঠিত হয়। জনগণের শাসনের নামে এটাই ছিল প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ সরকার। কেউ কেউ মনে করেন যে, ফ্রিমেসন (Freemasons)-এর সদস্যরা গির্জা ও ফরাসি সরকারের ক্রটিগুলোকে পুঁজি করে বিদ্রোহ ঘটায় এবং যতদূর সম্ভব তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্ত বায়ন করার প্রয়াস চালায়। এ বিপ্লবের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, গ্রন্থ ও প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে,
    - জঁ-জাক রুশো (Jean Jacques Rousseau) (১৭১২-১৭৭৮ খৃঃ) মৃত্যু ১৭৭৮ খ্রিঃ - Social Contract (সামাজিক চুক্তি, অনুবাদঃ ননীমাধব চৌধুরী) নামে তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি ইঞ্জিলের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল।
    - মনটাসকিউ (Montesquieu) এর রচিত গ্রন্থ The Spirit of Laws.
    - ইহুদী ধর্মাবলম্বী স্পিনোজা (Spinoza) কে ধর্মনিরপেক্ষতার পথিকৃত মনে করা হয়। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাকে জীবন ও আচার আচরণের

পদ্ধতি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ঈশ্বরতত্ত্ব ও রাজনীতি নিয়ে তাঁর রচিত একটি পুস্তিকা রয়েছে।

- প্রাকৃতিক আইনের প্রবক্তা ভলটেয়ার (Voltaire): (১৬৯৪-১৭৭৮ খৃঃ) তাঁর রচিত বই হচ্ছে- "বিবেকের গন্ডিতে ধর্ম" (১৮০৪ খ্রিঃ)।
- উইলিয়াম গডউইন (William Godwin) (১৭৯৩ খৃঃ) : (১৭৫৬-১৮৩৬ খৃঃ) তাঁর রচিত গ্রন্থ হচ্ছে- Political Justice (রাজনৈতিক ন্যায়পরায়ণতা)। এই গ্রন্থে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে তাঁর আহবান সুস্পষ্ট।
- মিরাবোঁ (Mirabeau): (১৭৪৯-১৭৯১ খৃঃ) যাঁকে ফরাসি বিপ্লবের প্রবক্তা, নেতা ও দার্শনিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।
- বাস্তিল (Bastille) ধ্বংস করার দাবী নিয়ে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে তাদের শ্লোগান ছিল- "রুটি চাই"। পরবর্তীতে এ শ্লোগান "স্বাধীনতা, সমঅধিকার ও ভ্রাতৃত্ব" তে পরিবর্তিত হয়। এটি মূলতঃ ফ্রিমেসন এর শ্লোগান। তাদের আরেকটি শ্লোগান ছিল "পশ্চাৎমুখিতার পতন হোক"। এর দ্বারা তারা ধর্মের পতনকে উদ্দেশ্য করে। এই শ্লোগান দিয়ে ইয়াহূদীরা একটা হট্টগোল বাধিয়ে দেয়, এর মাধ্যমে তারা রাষ্ট্রের কর্ণধারদের সাথে তাদের দূরত্ব নির্মূল করার চেষ্টা করে এবং ধর্মীয় বিরোধগুলো মিটিয়ে দেয়ার প্রয়াশ চালায়। এভাবে ফরাসি বিপ্লব ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরিবর্তে খোদ ধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলনে রূপ ধারণ করে।

- ধর্মবিমুখ বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব: সেকুলারিজমের উদ্ভবের পেছনে বেশ কিছু ধর্মবিমুখ- ধর্মবিদ্বেষী মতবাদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি মতবাদের উল্লেখ করা হলো ঃ

  ✍ বিবর্তনবাদ: ১৮৫৯ সনে ডারউইন (Charles Darwin) এর বই The Origin of Species (প্রজাতির উৎপত্তি, অনুবাদক- অধ্যাপক ম. আখতারুজ্জামান) প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) এবং বংশগতি তত্ত্বের উপর গুরুত্বারোপ করেন। মানুষের আসল পূর্বপুরুষ হিসেবে একটি অনুজীবকে চিহ্নিত করা হয়। যে অনুজীবটি মিলিয়ন মিলিয়ন বছর একটি বদ্ধ ডোবাতে ছিল। বিবর্তনের ফলে এটি এক পর্যায়ে বানর

এবং শেষ পর্যায়ে মানুষে পরিবর্তিত হয়। বিবর্তনবাদ ধর্মীয় বিশ্বাসকে উচ্ছেদ করে নাস্তিকতার বিস্তার ঘটায়। ইয়াহূদীরা সুকৌশলে এই মতবাদকে ব্যবহার করে তাদের স্বার্থ উদ্ধার করে।

✍ নিতশের (Nietzsche) (১৮৪৪-১৯০০ খৃঃ) দর্শনের উদ্ভব : দার্শনিক নিতশে দাবী করেন- ইশ্বরের মৃত্যু হয়েছে। মানুষ হচ্ছে সুপারম্যান। মানুষকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত হওয়া উচিত।

✍ এমিল দুরখীম (ইয়াহূদী) (১৮৫৮-১৯১৭ খৃঃ) এর দর্শন : তিনি সামষ্টিক বিবেক (Group mind) তত্ত্বের ভিত্তিতে মানুষদেরকে জন্তু ও বস্তু সত্তার সম্মিলিত রূপ বলে মত প্রকাশ করেন।

✍ সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Freud) (১৮৫৬-১৯৩৯ খৃঃ) (ইয়াহূদী) এর দর্শনঃ তিনি বস্তুজগতের সবকিছুতে যৌন বাসনাকে মূল প্রেরণা মনে করেন এবং তাঁর দৃষ্টিতে মানুষ নিছক যৌনাকাঙ্ক্ষী একটা প্রাণী।

✍ কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) (১৮১৮-১৮৮৩ খৃঃ) (ইয়াহূদী) এর দর্শনঃ তিনি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেন। মার্ক্স "অনিবার্য বিবর্তন" তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। তিনি কমিউনিজমের প্রচারক ও প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ধর্মকে জাতিসমূহের আফিম হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

✍ জীন-পল সাত্রি (Jean-Paul Sartre) (১৯০৫-১৯৮০৩ খৃঃ) তাঁর Existentialism নামক গ্রন্থে ও কলিন উইলসন (Colin Wilson) তাঁর The Outsider নামক গ্রন্থে অস্তিত্ববাদ (Existentialism) ও নাস্তিক্যবাদের প্রতি আহবান জানান।

আরব ও ইসলামি বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির কিছু নমুনা

✍ মিসরঃ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের আক্রমণের সাথে মিসরে ধর্মনিরপেক্ষতার অনুপ্রবেশ ঘটে। আল-জিবরিতি তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে (মিসরের উপর ফরাসি হামলা ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাপ্রবাহ শীর্ষক অংশে) এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি তাঁর লেখায় এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন যা সেকুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অর্থ বহন করে। যদিও তিনি এ শব্দটি সরাসরি ব্যবহার করেননি। যিনি সর্বপ্রথম 'ইলমানিয়্যাহ্' বা সেকুলারিজম পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন তিনি হচ্ছেন- কাতারের অধিবাসী খ্রিস্টান

ধর্মাবলম্বী ইলিয়াস; ১৮২৭ সালে প্রকাশিত আরবী-ফরাসি অভিধানে। খিদীভ (মিশরের শাসকদের উপাধি) ইসমাঈল ১৮৮৩ সালে ফ্রান্সের আইন মিসরে প্রবেশ করান। এই খিদীভ প্রাশ্চাত্য-সংস্কৃতির অন্ধভক্ত ছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল মিসরকে ইউরোপের একটি টুকরোতে পরিণত করবেন।

- ভারত: ১৭৯১ সাল পর্যন্ত ভারতে ইসলামি আইন (শরিয়া) মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালিত হয়েছে। এরপর ইংরেজদের প্ররোচনায় ক্রমান্বয়ে ইসলামি আইন বিলুপ্ত করা শুরু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সম্পূর্ণভাবে ইসলামি আইন বিলুপ্ত করা হয়।
- আলজিরিয়া: ১৮৩০ সালে ফ্রান্স কর্তৃক উপনিবেশ শাসনের স্বীকার হওয়ার পর ইসলামি আইন বিলুপ্ত করা হয়।
- তিউনিসিয়া: ১৯০৬ সালে তিউনিসিয়াতে ফ্রান্সের আইন স্থান করে নেয়।
- মরক্কো: ১৯১৩ সালে মরক্কোতে ফ্রান্সের আইন অনুপ্রবেশ করে।
- তুরস্ক: ইসলামি খিলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পর এবং মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক সর্বক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের পর তুরস্ক সেকুলারিজমের চাদর পরিধান করে। যদিও তারও আগ থেকেই কিছু কিছু লক্ষণ ও কর্মকাণ্ড দেখা দিয়েছিল।
- ইরাক ও সিরিয়া : উসমানী খিলাফত আমলে ইরাক ও সিরিয়া থেকে ইসলামি আইন বিলুপ্ত করা হয় এবং সেখানে ইংরেজ ও ফরাসিদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।
- আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চল : দখলদার ঊপনিবেশী শক্তির পতনের পর আফ্রিকার অনেক দেশে খ্রিস্টান রাষ্ট্রপ্রধানেরা ক্ষমতা দখল করে নেয়।
- ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশ সেকিউলার রাষ্ট্র।
- সেকিউলার ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের প্রসার: বাথ পার্টি, সিরিয়ান জাতীয়তাবাদী দল, ফেরাউনি মতবাদ, তুরানি মতবাদ, আরব জাতীয়তাবাদ।

আরব ও মুসলিম বিশ্বে উল্লেখযোগ্য সেক্যুলার ব্যক্তিবর্গ

আহমাদ লুতফি সৈয়দ, ইসমাঈল মাযহার, কাসেম আমীন, ত্বাহা হোসাইন, আব্দুল আযিয ফাহমি, মিশেল আফলাক, আন্তন সাদাত, সূকর্ণ, সুহার্তু, নেহেরু, মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক, জামাল আব্দুন নাসের, ''রাজনীতিতে ধর্ম নেই; ধর্মে রাজনীতি নেই'' এই শ্লোগানের প্রবক্তা আনোয়ার সাদাত, ড. ফুয়াদ যাকারিয়া, ড. ফারাজ ফৌদাহ্ প্রমুখ।

সেক্যুলারদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাসাবলী

- ✍ কিছু ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি প্রকাশ্যে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে (নাস্তিক)। বাকিরা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখলেও আল্লাহর অস্তিত্বের সাথে মানুষের জীবনের কোনরূপ সম্পর্ক আছে বলে তাঁরা বিশ্বাস করে না (মুনাফিক)।
- ✍ নিছক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে এবং বিবেক ও অভিজ্ঞতার শাসনাধীনে মানবজীবন প্রতিষ্ঠিত হবে।
- ✍ আধ্যাত্মিক জগৎ ও বস্তুজগতের মধ্যে দুর্ভেদ্য ব্যবধান তৈরী করা। তাদের দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ নেতিবাচক মূল্যবোধ।
- ✍ ধর্মকে রাজনীতি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন রাখা এবং নিরেট বস্তুবাদী ভিত্তির উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করা।
- ✍ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে pragmatism (সুবিধাবাদ) প্রতিষ্ঠা করা।
- ✍ শাসন, রাজনীতি ও নীতি নৈতিকতার ক্ষেত্রে ম্যাকিয়াভেলীর সূত্র অনুসরণ করা।
- ✍ অশ্লীলতা ও চারিত্রিক অবক্ষয় ছড়িয়ে দেয়া এবং পারিবারিক ভিত ভেঙ্গে দেয়া। কারণ পরিবার হচ্ছে সামাজিক বন্ধনের প্রথম বীজ।
- ✍ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও মিশনারী সংস্থাগুলোর অপচেষ্টায় আরব ও মুসলিম বিশ্বে প্রচারিত ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বাসগুলোর প্রধান কাজ হচ্ছে-
  - ইসলাম, কুরআন ও নবুয়তের মূলে আঘাত করা।
  - এ দাবী করা যে, ইসলামের আবেদন নিঃশেষ হয়ে গেছে। ইসলাম কিছু আধ্যাত্মিক পূজা-অর্চনা ছাড়া কিছু নয়।

- এ দাবী করা যে, ইসলামি ফিকহ বা ইসলামি আইন শাস্ত্র রোমান আইন থেকে উদ্ভুত।
- এই দাবী তোলা যে, ইসলাম বর্তমান সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইসলাম মানুষকে পশ্চাৎমুখী হওয়ার আহবান জানায়।
- পাশ্চাত্য চিন্তাধারার আলোকে নারীমুক্তির আহবান জানানো।
- ইসলামি সভ্যতাকে বিকৃতভাবে পেশ করা। ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত ধ্বংসাত্মক আন্দোলনগুলোকে অতিরঞ্জিতভাবে প্রচার করা এবং এ আন্দোলনগুলোকে সংস্কারমূলক আন্দোলন হিসেবে দাবী করা।
- প্রাচীন সভ্যতাগুলোকে পুনর্জীবিত করার চেষ্টা করা।
- পাশ্চাত্যের ধর্মহীন আইনকানুন ও ধর্মহীন শিক্ষার কারিকুলাম আমদানী করা এবং নিজেদের কর্মকাণ্ডে পাশ্চাত্যের ধারা চালু করা।
- নতুন প্রজন্মকে ধর্মহীন প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তোলা।

সেক্যুলারিজম কি মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য?

পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে সেক্যুলারিজম বা ধর্মহীনতা বিকাশের কোনো কারণ যদি থেকেও থাকে, কোনো মুসলিম দেশে তা বিকাশের কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। কেননা কোনো খ্রিস্টানকে যখন মানবরচিত সিভিল ল' দিয়ে শাসন করা হয় তখন সে বিরক্ত হয় না। কারণ এতে করে সে এমন কোনো কিছুকে অকেজো করছে না যা মান্য করা তার ধর্ম তার উপর আবশ্যক করে দিয়েছে; কেননা তাঁর ধর্মে জীবনবিধান হিসেবে কিছু অবশিষ্ট নেই। কিন্তু মুসলিমের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। মুসলিমের ঈমানই তাঁকে আল্লাহর আইনের শাসন গ্রহণে বাধ্য করে।

তাছাড়া - যেমন ড. ইউসুফ আল-কারাদাভী বলেন- ধর্ম থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন রাখা হলেও খ্রিস্টান ধর্ম তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতাতে অটুট থাকবে এবং খ্রিস্টান ধর্মরক্ষী পোপ, ফাদার, মাদার ও ধর্মপ্রচারকগণ বিনা প্রতিবন্ধকতায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবে। পক্ষান্তরে মুসলিম দেশে যদি এ মতবাদ চালু করা হয় তাহলে ইসলাম শক্তিহীন ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়বে। কারণ ইসলাম কোনো ব্যক্তির জন্য পোপ, যাজক, এক্লিউরিস-এর মত আধিপত্য অনুমোদন করে না। ইসলামের তৃতীয় খলিফা

উসমান (রাদিআল্লাহু আনহু) ঠিকই বলেছেন- "আল্লাহ তা'আলা শাসককে দিয়ে যা বাস্তবায়ন করান, কুরআন দিয়ে তা বাস্তবায়ন করান না।"

সেক্যুলার মতবাদের আদর্শিক ও বিশ্বাসগত শেকড়

- প্রথমতঃ গির্জার সাথে শত্রুতা। দ্বিতীয়ত ধর্মের সাথে শত্রুতা, চাই সে ধর্ম বিজ্ঞানের পক্ষে অবস্থান নিক অথবা বিজ্ঞানের বিপক্ষে অবস্থান নিক।

- আলফ্রেড ওয়াইট হু বলেন: "যে ইস্যুতেই ধর্ম বিজ্ঞানের বিরোধিতা করেছে সেখানে বিজ্ঞানের অভিমতই সঠিক পাওয়া গেছে এবং ভুল সবর্দা ধর্মের মিত্র।" যদি এ উক্তিটি ইউরোপে প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে সঠিক হয়েও থাকে, ইসলামের ব্যাপারে এ বক্তব্য সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত এবং কোনো বিবেচনায় সঠিক নয়। কারণ ইসলাম ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণিত তত্ত্বগুলোর মাঝে কোনো সংঘর্ষ নেই। ইসলাম ও বাস্তব বিজ্ঞানের মাঝে কখনো কোনো বিরোধ বাঁধেনি, খ্রিস্টান ধর্মের সাথে যেরূপ বিরোধ বেঁধেছিল। একজন সাহাবী থেকে একটি উক্তি বর্ণিত আছে- "ইসলাম যা আদেশ দিয়েছে সে বিষয়ে বিবেক কখনো বলেনি যে, হায়! এ ব্যাপারে যদি নিষেধ করা হত। অথবা ইসলাম যা থেকে বারণ করেছে সে বিষয়ে বিবেক কখনো বলেনি যে, হায়! ইসলাম যদি এ ব্যাপারে আদেশ দিত!" বৈজ্ঞানিক বাস্তব তত্ত্ব-উপাত্তগুলো এ উক্তিকে সত্য প্রমাণিত করে। পাশ্চাত্যের একদল বিজ্ঞানীও এ কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁদের মুখনিসৃত শত শত উক্তির মাধ্যমে ইসলামের এই বৈশিষ্টের প্রতি তাঁদের অনুরক্ততা ও এ বৈশিষ্টের সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে।

- "বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে শত্রুতা" এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাপকতা প্রদান, যাতে এর আওতায় ইসলামও এসে যায়। অথচ ইসলাম গির্জার ন্যায় জীবন ও বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি। বরং অভিজ্ঞতাবাদ পদ্ধতি (empirical method) প্রয়োগে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে ইসলামই ছিল অগ্রণী।

- আখিরাতকে অস্বীকার করা এবং আখিরাতের জন্য আমল না করা এবং এ বিশ্বাস রাখা যে, ভোগ ও উপভোগের জন্য দুনিয়ার জীবনই একক ক্ষেত্র।

ইসলাম কেন সেক্যুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) প্রত্যাখান করে?

- সেক্যুলারিজম (ধর্মহীনতা) মানব প্রকৃতির একটি বিশেষ দিককে উপেক্ষা করে। দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি। ধর্মনিরপেক্ষতা মানুষের

দেহের চাহিদা পূরণের উপর গুরুত্বারোপ করে। কিন্তু আত্মার চাহিদার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না।

- ○ পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এ মতবাদটির উৎপত্তি হয়েছে। আমরা প্রাচ্যবাসীদের নিকট এটি একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত অজানা-অচেনা চিন্তাধারা বৈ কিছু নয়।
- ○ ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলে। যার ফলে ব্যক্তিতন্ত্র, জাতিভেদ তথা উঁচুনীচু বৈষম্য, বর্ণবৈষম্য, মতবাদভিত্তিক বিভেদ, গোত্রীয় বিভেদ, জাতীয়তাভিত্তিক বিভেদ, দলাদলি, শ্রেণী বৈষম্য ইত্যাদির উন্মেষ ঘটে।
- ○ এই মতবাদ নাস্তিকতা, পাশবিকতা, বিচ্ছিন্নতা, দুর্নীতি, প্রজন্মের বিনাশ ইত্যাদির প্রসার ঘটায়।
- ○ ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদেরকে পাশ্চাত্যের বিবেক দিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করে। যার ফলে আমরা নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশাকে নিন্দা করব না। আমরা মুসলিম সমাজের স্বভাব-চরিত্রকে ভূলুণ্ঠিত করব এবং অনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য সমাজের রুদ্ধদারকে খুলে দেব। ধর্মনিরপেক্ষতা সুদী কারবারের বৈধতা দেয় এবং সিনেমা, নাটক, ইত্যাদিকে শিল্প হিসেবে অতি মর্যাদা দেয়। ধর্মনিরপেক্ষতার ছায়াতলে প্রত্যেক মানুষ অন্যের ক্ষতি করে হলেও নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস চালায়।
- ○ ধর্মনিরপেক্ষতা পাশ্চাত্য সমাজের সমস্যাগুলো আমাদের সমাজে টেনে আনে। যেমন পরকালের হিসাবনিকাশকে অস্বীকার করা। যার ফলশ্রুতিতে মানুষ ধর্মীয় ভাবধারার বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে জাগতিক রিপু যেমন- লোভলালসা, ব্যক্তিস্বার্থ, অস্তিত্বের লড়াই ইত্যাদি দ্বারা তাড়িত হয়ে জীবন যাপন করে; সেখানে আত্মার বিবেচনা একেবারে শূন্য।
- ○ ধর্মনিরপেক্ষতা বিকাশ ঘটলে জাগতিক জ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়; যে জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ নির্ভর। গায়েবী বিষয়াবলীকে উপেক্ষা করা হয়। যেমন আল্লাহর উপর ঈমান, পুনরুত্থান, পূণ্য ও পাপ। এর ফলে এমন এক সমাজের উদ্ভব ঘটে যে সমাজের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে- দুনিয়ার ভোগ ও সস্তা সব খেল-তামাশা।

শেষ কথা

পূর্বের আলোচনা থেকে এ কথা পরিস্কার যে - রাষ্ট্রীয় জীবন ও সামাজিক জীবন থেকে ধর্মকে বহিষ্কার করে জাগতিক জ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধির ভিত্তিতে জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার আহবানই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মতে, ধর্ম মানুষের মনের খাঁচায় বন্দি থাকবে, খুবই সীমাবদ্ধ পরিসরে ধর্মকে প্রকাশ করা যাবে। অথচ যে মুসলিম ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামি শরীয়তকে আইন হিসেবে গ্রহণ করে না এবং আল্লাহ তাআলা যা কিছু হারাম করেছেন সেগুলোকে সে নিষিদ্ধ মনে করে না- ইসলামের দৃষ্টিতে সে মুরতাদ। দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তার যুক্তি খণ্ডন করা ও তাকে তওবা করার আহ্বান জানানো ওয়াজিব- যেন সে ইসলামে ফিরে আসার সুযোগ পায়। তবে এই বিষয়ে সমাজে কোন প্রকার অরাজকতা সৃষ্টি করা যাবে না, কাউকে ব্যক্তিগতভাবে কোন ফাতওয়া দেয়া যাবে না, এসব বিষয়ে ফাতওয়া দেবার যোগ্যতা ও অধিকার আছে শুধুমাত্র শরীয়া বোর্ডের। এই বিষয়ে আইন প্রয়োগের দায়িত্বও সরকারের। ব্যক্তিগতভাবে কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারবে না।

নিম্নোক্ত রেফারেন্সগুলো হতে আরো বিস্তারিত জানা যেতে পারে

– জাহিলিয়াতুল কারনিল ইশরিন (বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াত), লেখক: মুহাম্মাদ কুতুব।

– আলমুস্তাকবাল লি হাযাদ্বীন (এই দ্বীনের ভবিষৎ), লেখক: সাইয়েদ কুতুব।

– তাহাফুতুল ইলমানিয়্যাহ (ধর্মনিরপেক্ষতার অসারতা), লেখক: এমাদুদ্দীন খলিল।

– আল ইসলাম ওয়াল হাদারাতুল গারবিয়্যাহ (ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা), লেখক: মুহাম্মাদ হোসাইন

– আল-ইলমানিয়্যাহ (ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ), লেখক: সাফার ইবনে আব্দুর রহমান আলহাওয়ালী

– তারিখুল জামইয়্যত আসসিরিয়্যাহ ওয়াল হারাকাত আলহাদ্দামাহ (গোপন সংগঠন ও ধ্বংসাত্মক আন্দোলনগুলোর ইতিহাস), লেখক: মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আনান।

– আলইসলাম ও মুশকিলাতুল হাদারাহ (ইসলাম ও সভ্যতার দ্বন্দ্ব), লেখক: সাইয়েদ কুতুব।

– আলগা-রাহ্ আলাল আলাম আল ইসলামী (মুসলিম বিশ্বের উপর হামলা), অনুবাদঃ মুহিববুদ্দীন আলখতীব ও মুসাঈদ আলইয়াফী।

– আল-ফিকর আল-ইসলামী ফি মুওয়াজাতিল আফকার আলগারবিয়্যাহ (ইসলামী চিন্তাধারা বনাম পাশ্চাত্য চিন্তাধারা), লেখকঃ মুহাম্মদ আল-মুবারক।

– আল-ফিকর আল-ইসলামী আলহাদীস ওয়া সিলাতুহু বিল ইসতিমার আলগারবি (আধুনিক ইসলামী চিন্তাধারা ও পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের সাথে এর সম্পর্ক), লেখকঃ মুহাম্মদ আল-বাহী।

– আলইসলাম ওয়াল ইলমানিয়া ওয়াজহান বি ওয়াজহ (ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা পরস্পর মুখোমুখি), লেখকঃ ড. ইউসুফ কারাদাবী।

– আলইলমানিয়াঃ আন্নাশআ ওয়াল আছার ফিশ শারকি ওয়াল গারব (ধর্মনিরপেক্ষতাঃ উৎপত্তি, প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে এর প্রভাব), লেখকঃ যাকারিয়া ফায়েদ।

– ওজুবু তাহকিমুস শরিয়া ইসলামিয়া লিল খুরুজে মিন দায়িরাতিল কুফর আলই‘তিকাদি (কুফরী বিশ্বাসের গন্ডি থেকে বেরোবার জন্য ইসলামি শরিয়া মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালনার আবশ্যকতা), লেখকঃ ড. মুহাম্মদ শাত্তা আবু সাদ, কায়রো, ১৪১৩হিঃ

– জুযুরুল ইলমানিয়্যাহ (ধর্মনিরপেক্ষতার গোড়ার কথা), লেখকঃ ড. আসসাইয়েদ আহমাদ ফারাজ, দারুল ওফা, আলমানসুরা, ১৯৯০ খ্রিঃ

– ইলমানি ওয়াল ইলমানিয়া (ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মনিরপেক্ষতা), লেখকঃ ড. আসসাইয়েদ আহমাদ ফারাজ, ১৯৮৬ খ্রিঃ

অমুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি ইসলামের উদারতা

একটি মুসলিম দেশে ইসলাম মুসলিমকে শুধু অমুসলিমদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতেই বলে না, রাষ্ট্রে তাদের সার্বিক নিরাপত্তা এবং সুখ-সমৃদ্ধিও নিশ্চিত করে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর একাধিক স্থানে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের অধিকার তুলে ধরা হয়েছে। অমুসলিমরা নিজ নিজ উপাসনালয়ে উপাসনা করবেন। নিজ ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মালয়কে সুরক্ষিত রাখবেন। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদের অধিকার সমান। তাদের প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্য ইসলাম সহ্য করে না। যেসব অমুসলিমের সঙ্গে কোনো সংঘাত নেই, যারা শান্তি পূর্ণভাবে মুসলিমদের সঙ্গে বসবাস করেন তাদের প্রতি বৈষম্য দেখানো নয়; বরং ইনসাফ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

আল্লাহ নিষেধ করেন না ঐ লোকদের সঙ্গে সদাচার ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে যারা তোমাদের সঙ্গে ধর্মকেন্দ্রিক যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের আবাসভূমি হতে তোমাদের বের করে দেয়নি। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন। (সূরা আল-মুমতাহিনা ঃ ৮)

আল্লাহ তা'আলা ঈমানের দাবিদার প্রতিটি মুসলিমকে নির্দেশ দিয়েছেন পরমতসহিষ্ণুতা ও পরধর্মের বা মতাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

তারা আল্লাহ তা'আলার বদলে যাদের ডাকে, তাদের তোমরা কখনো গালি দিয়ো না, নইলে তারাও শত্রুতার কারণে না জেনে আল্লাহ তা'আলাকেও গালি দেবে। আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই তাদের কার্যকলাপ সুশোভনীয় করে রেখেছি, অতঃপর সবাইকে একদিন তার মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে, তারপর তিনি তাদের বলে দেবেন, তারা দুনিয়ার জীবনে কে কী কাজ করে এসেছে। (সূরা আল আন'আম ঃ ১০৮)

কোনো বিধর্মী উপসনালয়ে সাধারণ অবস্থা তো দূরের কথা যুদ্ধাবস্থায়ও হামলা করা যাবে না। কোনো পুরোহিত বা পাদ্রীর প্রতি অস্ত্র তাক করা যাবে না। কোনো উপসনালয় জ্বালিয়ে দেয়া যাবে না। হাবীব ইবন অলীদ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্যদল প্রেরণকালে বলতেন,

'তোমরা আল্লাহ ও আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে যাত্রা কর। তোমরা আল্লাহর প্রতি কুফরকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আমি তোমাদের কয়েকটি উপদেশ

দিয়ে প্রেরণ করছি : (যুদ্ধক্ষেত্রে) তোমরা বাড়াবাড়ি করবে না, ভীরুতা দেখাবে না, (শত্রুপক্ষের) কারো চেহারা বিকৃতি ঘটাবে না, কোনো শিশুকে হত্যা করবে না, কোনো গির্জা জ্বালিয়ে দেবে না এবং কোনো বৃক্ষও উৎপাটন করবে না।' [আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ # ৯৪৩০]

মুতার যুদ্ধে রওয়ানার প্রাক্কালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দেন :

'তোমরা কোনো নারীকে হত্যা করবে না, অসহায় কোনো শিশুকেও না; আর না অক্ষম বৃদ্ধকে। আর কোনো গাছ উপড়াবে না, কোনো খেজুর গাছ জ্বালিয়ে দেবে না। আর কোনো গৃহও ধ্বংস করবে না।' [সহীহ মুসলিম # ১৭৩১]

আরেক হাদীসে আছে, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কোনো বাহিনী প্রেরণ করলে বলতেন, 'তোমরা গির্জার অধিবাসীদের হত্যা করবে না।' [ইবন আবী শাইবা, মুসান্নাফ # ৩৩৮০৪; কিতাবুল জিহাদ, যুদ্ধক্ষেত্রে যাদের হত্যা করা নিষেধ অধ্যায়]

আবূ বকর রাদিআল্লাহু আনহুও রসূলুল্লাহ (সা.)-কে অনুসরণ করেছেন। আপন খিলাফতকালে প্রথম যুদ্ধের বাহিনী প্রেরণ করতে গিয়ে তিনি এর সেনাপতি উসামা ইবন যায়েদ রাদিআল্লাহু আনহুর উদ্দেশে বলেন,

'হে লোক সকল, দাঁড়াও, আমি তোমাদের দশটি বিষয়ে উপদেশ দেব। আমার পক্ষ হিসেবে কথাগুলো তোমরা মনে রাখবে। কোনো খিয়ানত করবে না, বাড়াবাড়ি করবে না, (শত্রুদের) অনুরূপ করবে না, ছোট বাচ্চাকে হত্যা করবে না, বয়োবৃদ্ধকেও না আর নারীকেও না। খেজুর গাছ কাটবে না কিংবা তা জ্বালিয়েও দেবে না। কোনো ফলবতী গাছ কাটবে না। আহারের প্রয়োজন ছাড়া কোনো ছাগল, গরু বা উট জবাই করবে না। আর তোমরা এমন কিছু লোকের সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে যারা গির্জাগুলোয় নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে। তোমরাও তাদেরকে তাদের এবং তারা যা ছেড়ে নিজেদের জন্য তাতে ছেড়ে দেবে। [মুখতাসারু তারীখি দিমাশক # ১/৫২; তারীখুত তাবারী]

কোনো মুসলিম যদি কোনো অমুসলিমের প্রতি অন্যায় করেন, তবে রোজ কিয়ামতে খোদ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার বিপক্ষে লড়বেন বলে হাদীসে এসেছে। একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

'সাবধান! যদি কোনো মুসলিম কোনো অমুসলিম নাগরিকের উপর নিপীড়ন চালিয়ে তার অধিকার খর্ব করে, তার ক্ষমতার বাইরে কষ্ট দেয় এবং তার কোনো বস্তু জোরপূর্বক নিয়ে যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ উত্থাপন করব।' [আবূ দাঊদ # ৩০৫২]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

'যে মুসলিম কর্তৃক নিরাপত্তা প্রাপ্ত কোনো অমুসলিমকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ তার ঘ্রাণ পাওয়া যায় চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব থেকে'। [সহীহ বুখারী # ৩১৬৬]

আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবী বাকরা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

'যে ব্যক্তি চুক্তিতে থাকা কোনো অমুসলিমকে অসময়ে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন'। [আবূ দাঊদ # ২৭৬০; নাসাঈ # ৪৭৪৭, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]

ঐতিহাসিক বিদায় হজের দীর্ঘ ভাষণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজ ও রাষ্ট্রের সব দিক ও বিভাগ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি মাতাপিতার হক, সন্তান-সন্ততির হক, আত্মীয়-স্বজনদের হক, অনাথ ও দরিদ্রদের হক, প্রতিবেশীর হক, মুসাফিরের হক, চলার পথের সঙ্গী বা পথচারীর হক, দাস-দাসী বা চাকর-চাকরানীর হক এমনকি ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমের হক সম্পর্কেও নির্দেশনা দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজে মুসলিমদের কাছে অমুসলিমদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে আমানত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মুসলিমদের তিনি অমুসলিমদের নিরাপত্তা দানের নির্দেশ দিয়েছেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনে অমুসলিমদের জান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাদের ইজ্জত-আব্রু ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তার জন্য প্রহরীর দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ অমুসলিম জনগোষ্ঠীও মানুষ, তারাও আল্লাহর বান্দা। ইসলাম সম্পর্কে তারা ভুল বা বিভ্রান্তির শিকার হলে তাদের প্রতি আক্রমণ না করে তাদেরকে মূল সত্য এবং ইসলামের মহানুভবতা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

ইসলামের দৃষ্টিকোণে দুনিয়ায় মানুষের প্রাণ হরণ কিংবা জীবন নাশের চেয়ে বড় অপরাধ আর হয় না। পবিত্র কুরআনে তাই একজন মানুষের হত্যাকে পুরো মানবজাতির হত্যা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল। (সূরা আল-মায়িদা ঃ ৩২)

মানুষের প্রাণহানী ঘটানোকে যেখানে বলা হয়েছে পুরো মানব জাতিকে হত্যার সমতুল্য, সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকে গণ্য করা হয়েছে হত্যার চেয়েও জঘন্য অপরাধ হিসেবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

আর ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৯১)

আমাদের মনে রাখতে হবে, ইসলামের শান্তিপূর্ণ ও উদারনৈতিক শিক্ষার সৌজন্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পরমতসহিষ্ণুতার জন্য বরাবর সারা বিশ্বের সুনাম কুড়িয়েছে। এ দেশের মুসলিম জনগণ সবসময় তাদের ধর্মের শিক্ষা অনুযায়ী অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। এ দেশে মসজিদ-মন্দিরে পাশাপাশি স্ব-স্ব ধর্মের ইবাদত হয়। পবিত্র রমাদান মাসে হিন্দুরা সাড়ম্বরে অষ্টমী পালন করে। খ্রিস্টানরা জাঁকজমকভাবে বড়দিন উদযাপন করেন। বৌদ্ধ ও অন্য ধর্মাবলম্বীরাও নিজ নিজ ধর্মীয় উৎসব নির্বিবাদে পালন করেন।

পক্ষান্তরে আমাদের নিকট প্রতিবেশী ভারতে ক'দিন পরপরই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু কর্তৃক মুসলিমরা আক্রান্ত হন, আরেক প্রতিবেশী মিয়ানমারে এই সেদিনও রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে সাধারণ বৌদ্ধ থেকে নিয়ে শান্তিপ্রিয় হিসেবে খ্যাত ভিক্ষুরা পর্যন্ত নির্বিচার হামলা ও হত্যাযজ্ঞ চালাল মুসলিমের বিরুদ্ধে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। নারী-শিশু-বৃদ্ধকে অকাতরে হত্যা করা হয়েছে। এ

দেশের কোটি মুসলিমের হৃদয় কেঁদেছে তখন, তবে কেউ এ দেশের সংখ্যালঘু হিন্দু বা বৌদ্ধদের উপর সে ক্ষোভ দেখান নি।

আমেরিকায় মহানবীকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবমাননা করে চলচ্চিত্র নির্মাণের ঘটনায় যখন সারা বিশ্ব উত্তাল, বিশ্বের দুইশ' কোটি মুসলিমের হৃদয়ে যখন জ্বলছে ক্ষোভের দাবানল, তখন একের পর এক ফ্রান্সের সাপ্তাহিকে, তারপর স্পেনের একটি ম্যাগাজিনে মহানবীর ব্যঙ্গ কার্টুন প্রকাশের ঘটনা বিশ্ব মুসলিমকে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করেছে। বাকস্বাধীনতার নামে অন্যের পবিত্র ধর্মানুভূতিতে আঘাত কোনো ধর্মই অনুমোদন করে না। তারপরও ঘটছে এমন ঘটনা। স্বল্প বিরতিতে ক'দিন পরপরই ঘটছে এর পুনরাবৃত্তি।

একজনের অপরাধে দশজনকে শাস্তি দেওয়া অনুমোদিত নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা দণ্ডায়মান হও। কোনো কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনোভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার নিকটতর। এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (সূরা আল-মায়িদা ঃ ৮)

সরকারের কর্তব্য হলো ইসলাম অবমাননার সকল পথ বন্ধ করে ও অপরাধীকে তাৎক্ষণিক শাস্তির আওতায় এনে সাম্প্রদায়িক সম্পৃতি ধ্বংসের যে কোন উস্কানিকে অংকুরেই বিনষ্ট করতে হবে। ফলে এ ধরনের ঘটনা থেকে দেশি-বিদেশি যে ষড়যন্ত্রকারী মহল ফায়দা লুটতে চায়, তাদেরও গতি রোধ করা সম্ভব হবে। সর্বোপরি, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সদাচার ও সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির বন্ধনকে অটুট রাখতে সবাইকে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে।

আল্লাহ সকল মুসলিমকে ইসলামের উদারতা ও মহানুভতা সবার সামনে তুলে ধরার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সাম্প্রদায়িকতা শব্দের অপপ্রয়োগ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন

পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ পালিত হয়। বাংলাদেশে ঢাকায় এবং অন্য অনেক স্থানে বাংলা নববর্ষ উৎসাহের সাথে পালিত হয়। পরের দিন একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রথম পাতায় চার কলাম হেডিং দেয়া হয়। হেডিংটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। 'সম্প্রীতি, সাম্প্রদায়িকতা নয়' (Harmony, not Communalism)।

এ শিরোনামে বাংলাদেশের সেক্যুলার মহল এবং অতি সেক্যুলার পত্রপত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পাচ্ছে। এখানে 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দটি এ শিরোনামে কেন ব্যবহার করা হয়েছে ঃ বাংলাদেশে সাধারণভাবে যে অর্থে 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দটি ব্যবহার করা হয় তার আলোকে দেখলে এর অর্থ হচ্ছে, এ কথা বলা যে– বাংলা নববর্ষ উৎসবকে কোনোভাবেই ইসলাম প্রভাবিত করেনি। তাই এটাতে সম্প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে, সাম্প্রদায়িকতা নয়।

চিরদিনই বাংলাদেশের সেক্যুলার পত্রপত্রিকার ইসলামবিরোধী, ধর্মবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। কেননা এ দেশের ৮৩ ভাগ মুসলিমসহ ১০০ ভাগ জনগণ সবাই ধর্মেবিশ্বাসী ও নৈতিকতায় বিশ্বাসী; এখান থেকে বাদ যেতে পারে মাত্র কয়েক হাজার লোক।

সেক্যুলার পত্রপত্রিকা নারী সম্পর্কিত বা মানবাধিকার সংক্রান্ত ইসলামি শিক্ষাকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়। এসব সেক্যুলার পত্রপত্রিকা বিশেষ করে নারী ও যুবকদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায়। তারা ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশাকে উৎসাহিত করে, যার ফলে ব্যভিচার বৃদ্ধি পায়। এসব কোনো ধর্মেই গ্রহণযোগ্য নয়। তারা এমন সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করে, যেখানে অনেক অশ্লীলতা থাকে এবং মেয়েদের শরীর প্রদর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ আইটেম হয়। এভাবে তারা নারীকে পণ্যে পরিণত করে।

এখন সম্প্রদায় (Community) সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। সব মানুষই কোনো না কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ। মুসলিমরাও তাই। স্বাভাবিকভাবেই সব সম্প্রদায় তাদের লক্ষ্য কার্যকর করার চেষ্টা করবে। মুসলিমরাও তাদের সম্প্রদায় বা সমাজের লক্ষ্য কার্যকর করার চেষ্টা করবে। স্বাভাবিকভাবেই মুসলিমরা তাদের উৎসবকে তাদের ধর্মের আলোকে পালন করবে। মুসলিমদের পরিচয় ইসলাম দ্বারা; তাদের বিশ্বাস, আইন ও সংস্কৃতি দ্বারা নির্ধারিত।

মুসলিমরা তাদের উৎসবে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা, প্রকাশ্যে বয়স্ক মেয়েদের নাচ বা কোনো ধরনের শিরকের অন্তর্ভুক্তি অনুমোদন করে না। তারা মঙ্গলপ্রদীপ বা মঙ্গলশোভাযাত্রা চায় না। প্রদীপ থেকে কোনো মঙ্গল আসে না। মঙ্গল আসে কেবল স্রষ্টার কাছ থেকে। তেমনিভাবে অশালীন পোশাক ও বড় বড় পশুর মূর্তিসহ শোভাযাত্রা কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। যদি এগুলো গ্রহণ না করা হয় তাহলে সেকিউলার পত্রপত্রিকার মতে তা হয়ে যায় সাম্প্রদায়িকতা। যদি এগুলো মেনে নেয়া হয় তা হলে তা হয় সম্প্রীতি (harmony)।

স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশে ৮৩% মুসলিম বাস করার কারণে সব উৎসবই ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত। উৎসবগুলোতে যদি নৈতিক পরিবেশ বজায় রাখা হয়, তাহলে তা অধিকতর শালীন হয় এবং কোনো ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক হয় না। কারণ অশালীন পোশাক, অবাধ মেলামেশা কোন ধর্মেরই অংশ নয়। পহেলা বৈশাখে আগের মতো নানা রকম মেলা হওয়া, খেলাধুলা হওয়া, ভালো খাবারের ব্যবস্থা করা এবং দরিদ্রদের এ আনন্দে শরীক করলে এই অনুষ্ঠানটি আবার সর্বাঙ্গসুন্দর ও সফল একটি উৎসবে পরিণত হবে।

দেশের উন্নতিতে ইসলাম কি প্রতিবন্ধক?

ব্লগে, টক শো'তে বা পত্র-পত্রিকার আলোচনায় অনেকে বলেন ঃ 'দেশের উন্নয়নের জন্য ধর্মের প্রয়োজন নেই। ধর্ম আরো সমস্যা তৈরী করে। তাই অনেকেই ধর্ম, বিশেষ করে ইসলামের, বিরোধিতা করে থাকে।' আসলে বিষয়টা কি তাই?

আধুনিক যুগে যে সকল দেশ উন্নত হিসেবে বিবেচিত তাদের দিকে একটু তাকিয়ে দেখি। তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মকে কিভাবে নিয়েছে। কয়েকটি দেশের উদাহরণ দেখা যাক। তারা ধর্মের সাথে, বিশেষ করে ইসলামের সাথে কেমন আচরণ করেন।

ক্যানাডা

ক্যানাডা পৃথিবীর ৪র্থ শান্তিপ্রিয় এবং একটি অমুসলিম দেশ। আমরা জানি বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ, আর স্বাভাবিকভাবেই সে দেশে ইসলামি নীতি পালিত হওয়ার কথা বেশী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে

আমাদের দেশে আমরা মুসলিম হিসেবে যতটা না ইসলামি নিয়ম-কানুন পালন করি ক্যানাডা একটি অমুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও সেদেশের সরকার আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ইসলামি নিয়ম-কানুন পালন করে যাচ্ছে। আমরা মুসলিম হয়ে ইসলামি নিয়ম-কানুন ত্যাগ করেছি আর অমুসলিমরা তা গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছে।

ধর্মীয় অধিকার (**Religious rights**) **ঃ** এদেশে প্রত্যেক ধর্মের লোকদের সমান অধিকার। কেউ কারো ধর্ম নিয়ে কটুক্তি করতে পারবে না বা হেয় করতে পারবে না। যে যার ধর্ম অন্য ধর্মের লোকের নিকট প্রচার করতে পারবে। অর্থাৎ যার যার ধর্ম ঠিক মতো পালন করতে পারবে। যেমন ঃ অফিসে সলাতের সময় হলে সলাতের জন্য সময় দিতে হবে বা রমাদানে ইফতারের জন্য সময় দিতে হবে। আবার কেউ চাইলে যে কারো বাসার দরজায় গিয়ে নক করে তার ধর্মের দাওয়াত দিতে পারে, ধর্মীয় বইপত্র দিতে পারে। অথবা কোন শপিং মলে বা ব্যস্ততম রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে যে কেউ যে কোন ধর্মগ্রন্থ বিলি ও ধর্মপ্রচার করতে পারেন।

আইন ঃ কেউ যদি কোন দাড়িওয়ালা মুসলিমকে দাড়ির কারণে রাস্তা-ঘাটে অপমান করে বা টুপি পড়ার জন্য অপমান করে বা কোন মহিলাকে বোরকা পরার জন্য বা নিকাব করার জন্য অপমান করে তাহলে তৎক্ষনাৎ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার পদ্ধতি বাস্তবে কার্যকর রয়েছে। তাই অন্য ধর্মের লোকেরাও এই বিষয়ে খুবই সাবধাণতা অবলম্বন করে থাকে। ক্যানাডার মুসলিমরা এখানে সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় নাগরিক হিসেবে গন্য হয়েছে।

স্কুল/কলেজ ঃ ক্যানাডাতে প্রচুর ইসলামিক স্কুল রয়েছে। হাজার হাজার ছেলেমেয়েরা সেখানে পড়াশোনা করছে, ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। মেয়ে ছাত্রীরা এবং শিক্ষিকারা হিজাব পরে নিয়মিত স্কুল করছে। ইসলামিক সাবজেক্টগুলো শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায় অতিরিক্ত মার্ক হিসেবে যুক্ত হচ্ছে।

সংগঠন (**অর্গানাইজেশন**) **ঃ** এখানে অনেক ইসলামিক অর্গানাইজেশন রয়েছে যারা ইসলাম প্রচার এবং সামাজিক কর্ম-কান্ড করে থাকে। চাইলেই যে কেউ মিনিষ্ট্রি থেকে রেজিস্ট্রেশন করে ইসলামিক অর্গানাইজেশন চালু করতে পারে। এই সকল ইসলামিক অর্গানাইজেশনের সদস্য হয়ে হাজার হাজার নরনারী সমাজসেবামূলক কাজকর্ম করছেন। এই ধরণের কাজের জন্য ইমিগ্রেশন মিনিষ্টার সরকারীভাবে প্রতি বছর এওয়ার্ড পুরষ্কার দিয়ে থাকেন।

ইনস্টিটিউশন ঃ এখানে অনেক হালাল ফাইনানসিয়াল ইনস্টিটিউশন রয়েছে। যারা সুদমুক্ত অর্থনীতির কারবার করে থাকে। যেমন সুদবিহীন লোন দিয়ে বাড়ি কেনা, সুদমুক্ত পেনশন স্কিম, ছাত্রদের জন্য সুদমুক্ত এডুকেশন স্কিম এবং হালাল ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিস রয়েছে।

সিঙ্গাপুর

ওদেশে সরকার চালান মূলতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ চাইনিজ অরিজিনের লোকেরা। ইসলাম ধর্মের বিরোধিতা করে না তাঁরা। কিন্ত তাঁরা মুসলিমদের কী পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। সিঙ্গাপুরে বসবাসরত যেকোন পরিবারের সাথে কথা বললেই তা জানা যায়। বিশাল বিশাল মসজিদ বানিয়ে সরকারী বেতন দিয়ে খতিব-ইমাম-মুয়াজ্জিনদের রাখা হয়েছে সলাত আদায় করানোর জন্য। প্রতিটি এলাকাতেই একটি করে মসজিদ রয়েছে এবং প্রতিটি মসজিদেই রয়েছে আফটার স্কুল মাদ্রাসা। মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৃত্তি দেয়া হয় আরব দেশে গিয়ে কুরআন অধ্যয়নের জন্য, ইসলাম শেখার জন্যে। মুসলিমদের নানা রকম সেবা দেয়ার জন্য সিঙ্গাপুর সরকারের মন্ত্রনালয়ে 'মুইস' নামক একটি বিভাগ রয়েছে। মুসলিমদের জন্য সর্বত্রই হালাল খাবার পাওয়া যায়। এজন্য হালাল মনিটরিং অথরিটি রয়েছে যারা মুসলিমদের জন্য হালাল মাংস এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের পরীক্ষার পর সার্টিফিকেশন দিয়ে থাকে এবং প্যাকেটের গায়ে লিখা থাকে 'হালাল'।

অষ্ট্রিয়া

অস্ট্রিয়া যদিও একটা সেকিউল্যার দেশ, কিন্তু সেখানে সকল ধর্মকে আন্ত রিকভাবেই সম্মান করা হয়। যদি কোন সরকারী স্কুলের কোন ক্লাসে ৬-৭ জন মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীও থাকে, তাদের জন্যে স্কুলের পক্ষ থেকেই একজন ইসলামিক স্টাডিজের শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেয়া হয়।

ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ড একটা সেকিউল্যার দেশ। তারপরও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুন বলে থাকেন- এই ইংল্যান্ড খৃষ্টানদের। তারপরও কেউ ইসলামসহ অন্য কোন ধর্মকে প্রকাশ্যে অবমাননা করলে তার শাস্তির বিধান আছে এবং শাস্তি দেওয়াও হয়। বাংলাদেশে এখনো মাত্র তিনটি সরকারী মাদ্রাসা। কিন্তু ইংল্যান্ড সরকারী মাদ্রাসার সংখ্যা অনেক।

ইংল্যান্ডের ইস্ট লন্ডন এলাকায় গেলে মনে হবে কোন মুসলিম দেশে প্রবেশ করেছি। চারিদিকে দাড়ি-টুপিওয়ালা লোক। প্রচুর মসজিদ এবং ইসলামিক স্কুল। সেখানে মাইকে আযান দেয়া হয়। মুসলিমদের নামে পার্ক এবং রাস্তা রয়েছে। ইস্ট লন্ডনের রাস্তায় যতো হিজাব পরিহিতা মহিলা দেখা যায় তা মুসিলমদেশের রাজধানী ঢাকার রাস্তায়ও দেখা যায় না।

আমরা বিভিন্ন উন্নত দেশের সরকারগুলোর ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি মনোভাব ও কার্যক্রম সম্পর্কে জানলাম। এর বিপরীতে যদি মুসলিম প্রধান বাংলাদেশের অবস্থা চিন্তা করি? লেখক নিয়মিত ক্যানাডার টরোন্টো শহরের ব্যস্ততম রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ইসলাম প্রচার করেন, ইসলামিক বইপুস্তক ও কুরআন অমুসলিমদের মাঝে বিলি করেন। অসংখ্য লোক এই জায়গায় (ইটন সেন্টার) দাঁড়িয়ে মুসলিম হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আজ যদি লেখক দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের রাজধানী ঢাকার গুলিস্তানে দাঁড়িয়ে কিছু ইসলামি বই বিতরণ করেন তাহলে কি ঘটবে? আমাদের পুলিশ খুবই তৎপর হয়ে তাকে গ্রেফতার করবে, রিমান্ডে দেবে ও পরদিন পত্রপত্রিকাতে খবর আসবে জিহাদী বইসহ জঙ্গী গ্রেফতার। দুঃখজনক হলেও এটাই আজ আমাদের দেশের বাস্তব চিত্র।

বাংলাদেশ উন্নত হবার জন্যে ধর্মের বা ইসলামের দরকার আছে কি-না, বা কতটুকু দরকার আছে তা নিয়ে হয়ত আলোচনা বা বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন দ্বিমত করার সুযোগ নেই যে, ধর্মের বিরোধিতা করে দেশকে কোন ক্রমেই উন্নত করা যায় না। আমাদের সম্মানিত রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদেরকে এই সহজ সত্যটা বুঝতে হবে। এখনো সময় আছে। তা না হলে আমাদেরকে আরো জঘন্য পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

মুসলিম সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য

ইসলামি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দ্বীন ইসলামকে বাস্তবায়ন করাই রাষ্ট্র প্রধানের প্রধান কর্তব্য। তার মধ্যে প্রধান দায়িত্ব হল চারটি। যা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

তারা এমন লোক যাদেরকে আমি জমিনে ক্ষমতা দান করলে সলাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আর সব বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর হাতে। (সূরা হাজ্জ ঃ ৪১)

মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলিমদের কোন বিষয়ের দায়িত্বশীল হল কিন্তু পরে সে তাদের কল্যাণ কামনা ও সেবা দেয়ার জন্য এতটুকু চেষ্টাও করল না যা সে নিজের জন্য করে থাকে, আল্লাহ তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (তাবারানী আল-মুজামুস সগীর)

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে ব্যক্তি মুসলিমদের কোন বিষয়ের দায়িত্বশীল হল, অতঃপর তাতে বিশ্বাসঘাতকতা করল, সে জাহান্নামে যাবে। (তাবারানী আল-মুজামুস সগীর)

আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দুআ করলেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের লোকদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কাজের দায়িত্বশীল হবে সে যদি লোকদেরকে ভয়ানক অশান্তি ও দুঃখ-কষ্টে নিক্ষেপ করে, তবে তুমিও তার জীবনকে সংকীর্ণ ও কষ্টপূর্ণ করে দাও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের সামগ্রিক কাজকর্মের দায়িত্বশীল হবে এবং সে যদি লোকদের প্রতি ভালবাসা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তবে তুমিও তার প্রতি অনুগ্রহ কর। (সহীহ মুসলিম)

৮ম পরিচ্ছেদ

সঠিক জ্ঞান অর্জন

সঠিক জ্ঞান অর্জন

ইবাদত সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণা

"আমি জিন ও মানব জাতিকে কেবল আমারই ইবাদত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।" (সূরা আয যারিয়াত ৫১ ঃ ৫৬)

এ থেকে নিঃসন্দেহে বুঝা গেল যে, মানুষের জন্ম, জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, 'ইবাদত' শব্দটির প্রকৃত অর্থ জেনে নেয়া আমাদের পক্ষে কতখানি জরুরী। এ শব্দটির অর্থ না জানলে যে মহান উদ্দেশ্যে আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা আমি কখনই অর্জন করতে পারবো না, আর আমার সৃষ্টি ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে যাবে।

ইবাদত শব্দটি আরবী 'আবদ' হতে উদ্ভূত হয়েছে। 'আবদ' অর্থ দাস ও গোলাম। অতএব 'ইবাদত' শব্দের অর্থ হবে দাসত্ব বা গোলামী করা। যে ব্যক্তি অন্যের দাস সে যদি তার বাস্তবিকই মনিবের সমীপে একান্ত অনুগত হয়ে থাকে এবং তার সাথে ঠিক গোলাম বা দাসের মত ব্যবহার করে, তবে একে বলা হয় বন্দেগী ও ইবাদত। পক্ষান্তরে কেউ যদি কারো চাকর হয় এবং মনিবের কাছ থেকে পুরোপুরি বেতন গ্রহণ করে, কিন্তু চাকরের কাজগুলো ঠিকমত না করে তবে বলতে হবে যে সে মনিবের অবাধ্য। আসলে একে অকৃতজ্ঞতাই বলা বাঞ্ছনীয়। তাই সর্বপ্রথম জানতে হবে, মনিবের সামনে 'চাকরের' ন্যয় কাজ করা এবং তার সমীপে আনুগত্য প্রকাশ করার উপায় কী হতে পারে।

গোলাম সবসময়ই গোলাম; তার একথা বলার কোন অধিকার নেই যে, ১) আমি মনিবের এ আদেশ মানবো আর অমুক আদেশ মানবো না। ২) আমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মনিবের গোলাম আর অন্যান্য সময় আমি তার গোলামী হতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত। ৩) আমি ইচ্ছা হলে সম্মান করবো ইচ্ছা হলে অপমান করবো।

বান্দা বা চাকরকে প্রথমত মনিবকে 'প্রভু' বলে স্বীকার করতে হবে এবং মনে করতে হবে যে, তিনি আমার মালিক, তিনি আমাকে দৈনন্দিন রুজী দান করেন এবং তিনি আমার হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। অতএব তাঁর অনুগত হওয়া আমার অবশ্য কর্তব্য। তিনি ছাড়া অন্য কেউই আমার আনুগত্য লাভের অধিকারী নয়। সকল সময় মনিবের আনুগত্য করা, তাঁর হুকুম পালন করা, তার আদেশ মূহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ না করা, মনিবের বিরুদ্ধে মনে কোন কথার স্থান না দেয়া এবং অন্য কারো কথা পালন না করাই বান্দার দ্বিতীয় কর্তব্য। মনিবের প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন এবং তার সমীপে আদব রক্ষা করে চলা বান্দার তৃতীয় কাজ। আদব ও সম্মান প্রকাশের যে পন্থা মনিব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সেই সময়ে নিশ্চিতরূপে উপস্থিত হওয়া এবং মনিবের আনুগত্য ও দাসত্ব স্বীকার করে নিজেকে প্রতিজ্ঞা ও আন্তরিক নিষ্ঠা প্রমাণ করা একান্ত আবশ্যক।

এ তিনটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে যে কার্যটি সম্পন্ন হয় আরবী পরিভাষায় তাকেই বলে 'ইবাদত'। প্রথমত মনিবের দাসত্ব স্বীকার, দ্বিতীয়ত মনিবের আনুগত্য করা এবং তৃতীয়ত মনিবের সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করা।

এখন আসুন একজন দাসের কথা ভাবি। সে মালিকের দেয়া কাজ করেনা, শুধু মালিকের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে মালিকের নাম লক্ষবার জপ করে। এই দাস কি তার মনিবের কোন কাজে লাগছে? মালিক তাকে অন্যান্য মানুষের প্রাপ্য আদায় করতে বলেন। কিন্তু সে কেবল সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে মালিকের সামনে মাথা নত করে দশবার সালাম করে এবং আবার হাত বেঁধে দাঁড়ায়। মালিক তাকে অনিষ্টকর কাজগুলো বন্ধ করতে আদেশ করে কিন্তু সে সেখান থেকে একটুও নড়ে না বরং কেবল সিজদাহ করে থাকে। মালিক তাকে চোরের হাত কাটতে বলেন কিন্তু সে দাঁড়িয়ে থেকে সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকে; কিন্তু সে একবারও কুরআন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে না যার অধীনে চোরের হাত কাঁটা সম্ভব হবে।

এমন দাস সম্পর্কে কী মন্তব্য করবো? আমরা কি বলতে পারি যে, সে প্রকৃতপক্ষে মালিকের বন্দেগী ও ইবাদত করছে? আমার কোন দাস বা চাকর এরূপ করলে আমি তাকে কী বলবো? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আল্লাহর যে দাস এরূপ আচরণ করে তাকে আমরা অনেকেই পরহেজগার, বুযুর্গ ইত্যাদি নামে অভিহিত করি। এরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কুরআনের আল্লাহ তা'আলার কত শত হুকুম তিলাওয়াত করে কিন্তু সেগুলো পালন করার এবং কাজে পরিণত করার জন্য একটু চেষ্টাও করে না। বরং কেবল নফলের পর নফল পড়তে থাকে, আল্লাহর নামে হাজার দানা তাসবীহ জপতে থাকে এবং মধুর কণ্ঠে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে থাকে।

আর একজন চাকরের কথা ধরি। সে রাত-দিন কেবল পরের কাজ করে, অন্যের আদেশ শুনে এবং পালন করে, অন্যের আইন মেনে চলে এবং তার প্রকৃত মালিকের যত আদেশই হোক না কেন, তার বিরোধিতা করে। কিন্তু 'সালাম' দেয়ার সময় সে তার প্রকৃত মালিকের সামনে উপস্থিত হয় এবং মুখে কেবল তার নাম জপতে থাকে। আমাদের কারো কোন চাকর এরূপ করলে আমরা কী করবো? মুখে মুখে সে যখন আমাকে মালিক বলে ডাকবে তখন অমি কি তাকে একথা বলবো না যে, তুমি মিথ্যাবাদী; তুমি আমার বেতন খেয়ে অন্যের তাবেদারী করছো, মুখে আমাকে মালিক বলে ডাকছো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেবল অন্যেরই কাজ করে বেড়াচ্ছ? এটা যে নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধির কথা এটা কারো বুঝতে কষ্ট হয় না।

কিন্তু কী আশ্চর্যের কথা! যারা রাত-দিন আল্লাহর আইন ভঙ্গ করে, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে এবং নিজেদের কর্মজীবনে আল্লাহর বিধানের কোন পরোয়া করে না শুধু সলাত-সিয়াম, তাসবীহ পাঠ, কুরআন তিলাওয়াত, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদিকে ইবাদত বলে মনে করে। এ ভুল ধারণারও মূল কারণ ইবাদত শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানা।

আর এটি চাকরের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। মনিব তার চাকরদের জন্য যে ধরনের পোশাক নির্দিষ্ট করেছেন, মাপ-জোখ ঠিক রেখে সে ঠিক সেই ধরনের পোশাক পরিধান করে, বড় আদব ও যত্ন সহকারে সে মনিবের সামনে হাজির হয়, প্রত্যেকটি হুকুম শুনা মাত্রই মাথা নত করে শিরোধার্য করে নেয় যেন তার তুলনায় বেশী অনুগত চাকর আর কেউই নয়। 'সালাম দেয়ার সময় সে একেবারে সকলের সামনে এসে দাঁড়ায় এবং মনিবের নাম জপবার ব্যাপারে সমস্ত চাকরের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিষ্ঠা প্রমাণ করে; কিন্তু অন্যদিকে এ

ব্যক্তি মনিবের শত্রু এবং বিদ্রোহীদের খেদমত করে, মনিবের বিরুদ্ধে তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে এবং মনিবের নাম পর্যন্ত দুনিয়া হতে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে তারা যে চেষ্টাই করে, এ হতভাগা তার সহযোগিতা করে; রাতের অন্ধকারে সে মনিবের নিষিদ্ধ কাজ করে এবং ভোর হলে বড় অনুগত চাকরটির ন্যায় হাত বেঁধে মনিবের সামনে হাজির হয়, এ চাকরটি সম্পর্কে আমরা কী বলবো? নিশ্চয়ই তাকে মুনাফিক, বিদ্রোহী প্রভৃতি নামে অভিহিত করতে একটুও কুণ্ঠিত হবো না।

কিন্তু আল্লাহর কোন চাকর যখন এ ধরনের হাস্যকর ও বিদ্রোহী আচরণ করতে থাকে তখন তাকে আমরা কী বলতে থাকি? তখন আমরা কাউকে 'পীর সাহেব' কাউকে 'হযরত মাওলানা', কাউকে বড় 'কামেল', 'পরহেজগার' প্রভৃতি নামে ভূষিত করি। এর কারণ এই যে, আমরা তাদের মুখে মাপমত লম্বা দাড়ি দেখে, তাদের পায়জামা পায়ের গিরার দু ইঞ্চি ওপরে দেখে, তাদের কপালে সলাতের কালো দাগ দেখে, এবং তাদের লম্বা লম্বা সলাত ও মোটা মোটা দানার তাসবীহ দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি; এদেরকে বড় দ্বীনদার ও ইবাদতকারী বলে মনে করি। এ ভুল শুধু এজন্য যে, 'ইবাদত' ও দ্বীনদারীর ভুল অর্থই আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে।

আমি হয়তো মনে করি যে বুকে হাত বেঁধে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো, হাঁটুর উপর হাত রেখে মাথা নত করে, মাটিতে মাথা রেখে সিজদা করা এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করা- শুধু এ কটি কাজই প্রকৃত ইবাদত। হয়ত আমি মনে করি, রমাদানের প্রথম দিন হতে শাওয়ালের চাঁদ উঠা পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার বন্ধ রাখার নাম ইবাদত। আমি হয়তো এটাও মনে করি যে, কুরআন শরীফ সুন্দর করে তিলাওয়াত করার নামই ইবাদত, আমি বুঝে থাকি মক্কা শরীফে গিয়ে কা'বা ঘরের চারদিকে তাওয়াফ করার নামই ইবাদত। মোটকথা, এ ধরনের বাহ্যিক রূপকে আমরা 'ইবাদত' মনে করে নিয়েছি এবং এধরনের বাহ্যিক রূপ বজায় রেখে উপরোক্ত কাজগুলো থেকেই সমাধা করলেই আমরা মনে করি যে, 'ইবাদত' সুসম্পন্ন হয়েছে এবং (ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন) আয়াতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। তাই জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে আমি একেবারে স্বাধীন- নিজের খেয়াল খুশি অনুযায়ী কাজ করে যেতে পারি।

কিন্তু প্রকৃত ব্যপার এই যে, আল্লাহ তা’আলা যে ইবাদাতের জন্য আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যে ইবাদত করার আদেশ আমাকে দেয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন

জিনিস। সেই ইবাদত এই যে, আমি আমার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তেই আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে চলবো এবং আল্লাহর আইনের বিরোধী এ দুনিয়ায় যা কিছু প্রচলিত আছে তা অনুসরণ করতে আমি একেবারে অস্বীকার করবো। আমার প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি গতিবিধি আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে হতে হবে। এ পন্থায় যে জীবনযাপন করবো তার সবটুকুই ইবাদত বলে গণ্য হবে। এ ধরনের জীবনে আমার শয়ন-জাগরণ, পানাহার, চলাফেরা, কথা বলা, অলোচনা করাও ইবাদত বিবেচিত হবে। এমন কি নিজ স্ত্রীর কাছে যাওয়া এবং নিজের সন্তানদেরকে স্নেহ করাও ইবাদাতের শামিল হবে। যে সকল কাজকে আমরা 'দুনিয়াদারী' বলে থাকি তাও 'ইবাদত' এবং 'দ্বীনদারী' হতে পারে -- যদি সকল বিষয় আমি আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে সমাধা করি; আর পদে পদে এদিকে লক্ষ্য রাখি যে, আল্লাহর কাছে কোন্‌টা জায়েয আর কোনটা নাজায়েয, কী হালাল আর কী হারাম, কী ফরয আর কী নিষেধ, কোন কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন আর কোন কাজে হন অসন্তুষ্ট।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমি রুজি ও অর্থোপার্জনের জন্য বের হই। এ পথে হারাম উপার্জনের অসংখ্য সহজ উপায় আমার সামনে আসবে। এখন আমি যদি আল্লাহকে ভয় করে সেই সুযোগ গ্রহণ না করি এবং কেবল হালাল রুজি ও অর্থ উপার্জন করি এ কাজে যে সময় লেগেছে তা সবই ইবাদত এবং এ হালাল উপায়ে অর্জিত অর্থ ঘরে এনে আমি নিজে খাই আর পরিবার-পরিজনের খাদ্যের ব্যবস্থা করি, সেই সাথে যদি আল্লাহর নির্ধারিত অন্যান্য হকদারের হকও আদায় করি, তাহলে এসব কাজেও আমি অসীম সওয়াব (পুরষ্কার) পাবো। পথ চলার সময় আমি পথের কাঁটা দূর করি এ ধারণায় যে, এটা দ্বারা আল্লাহর কোন বান্দা কষ্ট পেতে পারে তবে এটাও আমার ইবাদত বলে গণ্য হবে। আমি কোন রুগ্নব্যক্তিকে শুশ্রুষা করলে, কোন ব্যক্তিকে পথ চলতে সাহায্য করলে, কিংবা বিপন্ন ব্যক্তিকে চলতে সাহায্য করলে তবে এটাও ইবাদত হবে। কথাবার্তা বলতে আমি মিথ্যা, গীবত, কুৎসা রটনা, অশ্লীল কথা বলে পরের মনে আঘাত দেয়া ইত্যাদি পরিহার করি এবং আল্লাহর ভয়ে কেবল সত্য কথাই বলি তবে যতক্ষণ সময় আমার এ কাজে ব্যয় হবে তার সবই ইবাদতে অতিবাহিত হবে।

অতএব চেতনা লাভের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর আইন অনুযায়ী চলা এবং তাঁরই নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করার নামই হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত। এ ইবাদতের জন্য কোন সময় নেই। এ ইবাদত সবসময়ই হওয়া চাই, এ ইবাদতের জন্য কোন নির্দিষ্ট প্রকাশ্য রূপ নেই, কেবল প্রতিটি রূপের

প্রত্যেকটি কাজই আল্লাহর ইবাদত হতে হবে। আমি একথা বলতে পারি না যে, আমি অমুক সময় আল্লাহর বান্দা আর অমুক সময় আল্লাহর বান্দা নই। আমি একথাও বলতে পারি না যে, অমুক সময় আল্লাহর ইবাদতের জন্য, আর অমুক সময় আল্লাহর কোন ইবাদত করতে হয় না।

এ আলোচনা দ্বারা আমরা ইবাদত শব্দের অর্থ ভালরূপে জানলাম এবং একথা বুঝতে পারলাম যে, প্রত্যেক মুহূর্তে সকল অবস্থায় আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করে চলার নামই ইবাদত। এখানে একটি সাধারণ প্রশ্ন আসতে পারে যে, তাহলে এ সলাত, সিয়াম, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদিকে কি বলা যায়? উত্তরে বলা যায় যে, এসব ইবাদত অবশ্যই, এ ইবাদতগুলোকে আমার উপর ফরয করে দেয়া হয়েছে শুধু এজন্য যে, আমার জীবনে প্রধান ও বৃহত্তম উদ্দেশ্য যে, প্রতি মূহূর্তে ও প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত করা, সেই বিরাট উদ্দেশ্য আমি এসবের মাধ্যমে লাভ করবো। সলাত আমাকে দৈনিক পাঁচবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা (দাস) - তাঁরই বন্দেগী করা আমার কর্তব্য; সিয়াম বছরে একবার পূর্ণ একটি মাস আমাকে এ বন্দেগী করার জন্য প্রস্তুত করে, যাকাত আমাকে বারবার মনে করিয়ে দেয় যে, আমি যে অর্থ উপার্জন করেছি তা আল্লাহর দান, তা কেবল আমার খেয়াল-খুশী মত ব্যয় করতে পারি না। বরং তা দ্বারা আমার মালিকের হক আদায় করতে হবে। হজ্জ মানব মনে আল্লাহ প্রেম ও ভালোবাসা এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির এমন চিত্র অঙ্কিত করে যে, একবার তা মুদ্রিত হলে সমগ্র জীবনেও মন হতে তা মুছে যেতে পারে না।

এসব বিভিন্ন ইবাদত আদায় করার পর আমার সমগ্র জীবন যদি আল্লাহর ইবাদতে পরিণত হওয়ার উপযুক্ত হয় তবেই আমার সলাত প্রকৃত সলাত হবে, সিয়াম খাঁটি সিয়াম হবে, যাকাত সত্যিকার যাকাত এবং হজ্জ আসল হজ্জ হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ উদ্দেশ্য সফল না হলে কেবল রুকু-সিজদাহ, অনাহার-উপবাস, হজ্জের অনুষ্ঠান পালনকরা এবং যাকাতের নামে টাকা ব্যয় করলে কিছুই লাভ হবে না। বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক ইবাদতগুলোকে মানুষের একটি দেহের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এতে প্রাণ থাকলে জীবিত মানুষ, অন্যথায় তা একটি প্রাণহীন দেহ মাত্র।

জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা

আমরা যে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জানি না, এইটাই আমরা জানি না!

- মুসলিম জনগোষ্ঠির বেশীর ভাগই আজ দ্বীন সম্বন্ধে কিছু না জেনেও জানার ভান করে নির্দ্বিধায় দ্বীন-বিরোধী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।
- বরং কেউ বুঝাতে চাইলে চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে তর্ক শুরু করে দেয়।
- কেবল সলাত-সিয়াম পালনকে দ্বীন মনে করছে।
- দ্বীনের অপেক্ষাকৃত কম ও অস্পষ্ট বিষয়কে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে।
- আর সুস্পষ্ট ও ফরয বিষয়াদিকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে।

আমার যদি দ্বীন সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞানই না থাকে তাহলে কিভাবে নিজ পরিবারকে দ্বীনের আলোকে পরিচালিত করবো? ঈমানের অন্যতম দাবী হলো দ্বীনের জ্ঞানার্জন করা। কিভাবে সন্তানদের অন্তরে সামান্য হলেও দ্বীনের আলো ঢুকাবো? যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমার ভাসাভাসা আর আবোলতাবোল দ্বীনি জ্ঞান দিয়ে উঠতি বয়সের সন্তানদের বুঝাতে পারবো না। তারা এখন লজিক চায়, তারা দ্বীনের ইনটেলেকচুয়াল ব্যাখ্যা চায়। গোটা কুরআনে সকল মৌলিক সমস্যার সমাধান আছে। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জটিল বিষয়ে সংশিষ্ট বিজ্ঞানীগণ সারাজীবন চেষ্টা করে একটি সমস্যার যে সমাধান দিয়েছেন, আল-কুরআনে মাত্র এক দুই শব্দে বা এক লাইনে সে সমস্যার নির্ভুল সমাধান দিয়ে দিয়েছে।

আমি যদি মনে করি আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক জানি তাহলে আমি আমার জানার বা জ্ঞান অর্জনের দরজা নিজেই বন্ধ করে দিলাম। তাই জানলেও না জানার ভান করে authentic source থেকে পড়াশোনা করে জানতে থাকা উচিত এবং এক সময় দেখা যাবে আসলে আমি অনেক কিছুই জানি না। আমি যে অনেক কিছু জানি না তা উপলব্ধি করার জন্য একটা level of knowledge প্রয়োজন।

দ্বীনের জ্ঞানার্জন ফরয (রসূলুল্লাহের হাদীস)

- দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরয তথা আবশ্যকরণীয়। (ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী)

- যে ব্যক্তি দ্বীন শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয় সে পুনরায় আপন ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে থাকে। (তিরমিযি)
- যে ব্যক্তি দ্বীনী বিষয়াদি শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে রাস্তায় বের হয়, মহান আল্লাহ সে ব্যক্তির জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। (সহীহ মুসলিম)
- দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা এবং তা অর্জনের চেষ্টা করা বিগত জীবনের গুনাহসমূহকে মুছে দেয়। (তিরমিযী)

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন

১. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দেবেন। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণরূপে অবহিত। (সূরা মুজাদালা ঃ ১১)

২. বল, অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি কখনো এক ও অভিন্ন হতে পারে? (সূরা রাদ ঃ ১৬)

৩. আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? বুদ্ধিমান লোকেরাই তো নসীহত গ্রহণ করে থাকে। (সূরা যুমার ঃ ৯)

তাই আসুন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহ হতে কুরআনের ব্যাখ্যা ও বাস্তব এপ্লিকেশনস জেনে নেই। কুরআনের তাফসীর পড়ি, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী পড়ি, সাহাবীদের (রাদিআল্লাহ আনহুম) জীবনী পড়ি, বর্তমান বিশ্বের সর্বজনগ্রাহ্য ইসলামিক স্কলারদের সাহিত্য পড়লে দেখবো জীবনের নূতন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি। দেখবো আমার ভাগ্যে পরিবর্তন এসেছে।

ইসলামের যথার্থ জ্ঞান অর্জন

একজন মুমিনের ব্যক্তিগত গুণাবলীর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ইসলামের যথার্থ জ্ঞান। যে ব্যক্তি ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাকে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি সে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তা জানতে ও বুঝতে হবে। এ কাজের জন্যে ইসলামের নিছক সংক্ষিপ্ত জ্ঞান যথেষ্ট নয় বরং বিস্তারিত জ্ঞানের প্রয়োজন। আর এর স্বল্পতা ও বিপুলতা মানুষের যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। এজন্যে এ পথের প্রত্যেকটি পথিককে মুজতাহিদ হতে হবে এমন কোন কথা নেই। তবে তাদের প্রত্যেককে অবশ্যই ইসলামি আকীদা সম্পর্কে পরিশুদ্ধ জ্ঞান ও ইসলামি

কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে এবং জীবনের বিভিন্ন বিভাগে ইসলাম মানুষকে কী পথ দেখিয়েছে সে সম্পর্কে অবগত হতে হবে। এ জ্ঞান ও অবগতি ছাড়া মানুষ নিজে সঠিক পথে চলতে পারবে না, অন্যকেও পথ দেখাতে পারবে না এবং সমাজ গঠনের জন্যে যথার্থ কোন কাজ করতেও সক্ষম হবে না।

যারা দ্বীন ইসলামের দাওয়াতী কাজ করেন তাদের মধ্যে ইসলামি জ্ঞান এমন পর্যায়ে থাকতে হবে যে এর ফলে তারা গ্রাম ও শহরের লোকদেরকে সহজ-সরল ভাষায় দ্বীনের কথা বুঝাতে সক্ষম হবে। তাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে, অন্যকেও পথ দেখাতে পারবে। শিক্ষিত লোকদের সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয় নিরসন করতে পারবে। বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ ও সন্তোষজনক জবাব দিতে পারবে। ইসলামি চিরন্তন ভিত্তির ওপর একটি নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাসাদ গড়ে তুলতে অবগতি ছাড়া মানুষ নিজে সঠিক পথে চলতে পারবে না, অন্যকেও পথ দেখাতে পারবে। আধুনিক চিন্তা ও কর্মের ক্রটিপূর্ণ অংশকে ক্রটিহীন অংশ থেকে আলাদা করার মতো সমালোচনার যোগ্যতা তাদের মধ্যে থাকবে।

ইসলামের প্রতি অবিচল বিশ্বাস

ইসলাম সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের পর অবিচল ঈমান রাখতে হবে সেই দ্বীনের প্রতি যার ভিত্তিতে সে জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়। ঐ জীবন ব্যবস্থার সত্যতা ও নির্ভুলতা সম্পর্কে তার নিজের মন নিঃসংশয় হতে হবে। এ ব্যাপারে তার নিজের চিন্তা পুরোপুরি একাগ্র হতে হবে। সন্দেহ, সংশয় ও দোদুল্যমান অবস্থায় মানুষ একাজ করতে পারে না। যে ব্যক্তি এ কাজ সম্পন্ন করবে তাকে নিঃসংশয় চিত্তে আল্লাহর উপর বিশ্বাস করতে হবে এবং কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারের উপর অবিচল ঈমান আনতে হবে। তাকে আখিরাতের ওপর অটল বিশ্বাস রাখতে হবে এবং কুরআনে আখিরাতের চিত্র যেভাবে বর্ণিত হয়েছে হুবহু সেভাবে বিশ্বাস করতে হবে।

তাকে বিশ্বাস করতে হবে, মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদর্শিত পথই একমাত্র সত্যপথ এবং তার বিরোধী বা তার সাথে সামঞ্জস্যহীন প্রত্যেকটি পথই ভ্রান্ত। তাকে বিশ্বাস করতে হবে, মানুষের যে কোনো চিন্তা ও যে কোন পদ্ধতি যাচাই করার একটি মাত্র মানদন্ড আছে এবং তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত। এ মানদন্ডে যে উতরে যাবে সে সত্য ও অভ্রান্ত, আর যে উতরে যাবে না, সে বাতিল ও ভ্রান্ত।

জ্ঞান অর্জনের জন্য চাই সুষ্ঠ পরিকল্পনা ঃ ইসলামকে ভালভাবে জানার জন্য একটি মিনিমাম সিলেবাস পড়ে শেষ করা আমাদের খুবই প্রয়োজন। বিশেষ করে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিস্তারিত জীবনী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুব মনোযোগের সাথে কয়েকবার পড়া উচিত। এছাড়া সাহাবাদের জীবনী, আর গোটা কুরআনের তাফসীর পড়া সম্ভব না হলেও, নির্বাচিত কিছু সূরার তাফসীরগুলো সর্বপ্রথমে পড়ে ফেলা উচিত। 'আমরা দাওয়াতী কাজ কেন করবো?' তার হুকুমগুলো আল কুরআনের আয়াতগুলোর মাধ্যমে আমরা জেনে গেছি। এই আয়াতগুলো বারবার পড়তে হবে, ভাবতে হবে কিভাবে আমরা এই নির্দেশগুলো বাস্তবায়ন করতে পারি।

আমরা যারা দ্বীন ইসলামের দাওয়াতী কাজ করছি এবং যতটুকুই করছি, আমরা যেন এটা মনে না করি যে আমরা অনেক কিছু করে ফেলেছি, দ্বীনের অনেক উপকার করছি, আল্লাহর অনেক কাজ করে দিচ্ছি! কারণ আল্লাহর কাজ আমরা যদি নাও করি এতে আল্লাহর কোন কিছুই যায় আসে না, প্রয়োজনে অন্য কোন অমুসলিমকে মুসলিম বানিয়ে তিনি দ্বীনের কাজ করাবেন। আর বাস্তবে আজ ইউরোপে, আমেরিকা-ক্যানাডায় মূল দ্বীনের কাজের নেতৃত্ব দিচ্ছেন রিভার্টেড/কনভার্টেড (অন্য ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী নব্য মুসলিমগণ)। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হয়েছে যে, যখন আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়তে বলা হয় তখন তোমরা মাটি আঁকড়ে পড়ে থাক? তোমরা কি দুনিয়ার জীবন নিয়েই খুশী থাকতে চাও অথচ দুনিয়ার এই পার্থিব জীবনতো আখিরাতের তুলনায় কিছুই নয়। যদি তোমরা বের না হও তাহলে (এই কাজের জন্যে) তোমাদের জায়গায় আল্লাহ অন্য জাতিকে সুযোগ করে দেবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তো সবকিছুর উপর ক্ষমতাশালী এবং কর্তৃত্বের অধিকারী।" (সূরা আত-তাওবা ঃ ৩৮-৩৯)

আমরা পড়াশোনা করবো নিজের জন্যে, নিজ পরিবারের জন্যে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের (next generation)-এর জন্যে। আর মহান আল্লাহর তরফ থেকে যে দায়িত্ব আমাদের সকলের উপর আছে তা সঠিকভাবে পালন করার জন্যে। আমরা যদি পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে সত্যিকার সুখী হতে চাই তাহলে পড়াশোনা করে ইসলামকে উত্তমভাবে জানা ছাড়া কোন বিকল্প (aternative) নেই। এবং সুখী পারিবারিক জীবনযাপনের জন্য দ্বীন ইসলামের সঠিক বুঝ খুবই প্রয়োজন। আমি নিজেই যদি দ্বীনের সঠিক

জ্ঞান না পাই তাহলে কিভাবে নিজ স্ত্রীকে দ্বীনের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করবো? কিভাবে সন্তানদের মানুষ করবো? তাদেরকে প্রকৃত মুসলিম বানাবো? কুরআনের প্রথম আয়াত-ই নাযিল হয়েছে পড়াশোনার উপর জোর দিয়ে। মহান আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথমে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নির্দেশ দিয়েছেন **"পড় তোমার প্রভুর নামে"** - সূরা আলাক। তাই দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকটি মুসলিম নরনারীর জন্য ফরয (ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী)।

আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে বিশুদ্ধ (সহীহ) জ্ঞান অর্জনের তৌফিক দান করুন এবং আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এই অর্জিত জ্ঞানের সঠিক বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

সকল সমস্যার মূল হচ্ছে আংশিক বা ভুল ঈমান

ঈমানের স্বচ্ছ ধারণা

মানব জীবনের যে গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়েই আলোচনা-পর্যালোচনা বা গবেষণা শুরু করা হোক তা প্রভাবিত হবে ঈমানী জ্ঞান, এর সঠিক উপলব্ধি (knowledge & understanding) ও জ্ঞানের গভীরতার উপর। যে কোন সমস্যা সমাধানে কিছু মৌলিক নীতিমালা মেনে চলতে হয়। ঈমানকে সামনে রেখেই যাবতীয় মানব সমস্যার সূত্র, বিধি ও সমাধান খোঁজার নীতিমালা মেনে চলা কল্যাণকর। এর বাইরে যে সমাধানেরই চেষ্টা করা হোক তা হবে আংশিক, অপূর্ণাঙ্গ ও ক্ষণস্থায়ী। কারণ এতে সবচাইতে বড় ফ্যাক্টর ঈমানকে অগ্রাহ্য করে নিজের অজান্তে মানুষের ক্ষতি ডেকে আনা হয়। ফলে মানুষ কোন বিষয়ে আজ এক কথা বলে তো কাল আরেক সূত্র আবিষ্কার করে। আর ঈমান মানে আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস, মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি যে মৌলিক বিধি বিধান পাঠিয়েছেন তার উপরও সমভাবে বিশ্বাস স্থাপন। এটিই ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ দাবী।

আমরা যদি মানব জীবনের মৌলিক বিষয়গুলোর (যেমন ঃ এর শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনৈতিক নীতিমালা, শ্রমনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন, অপরের কল্যাণ কামনা, পরিবার গঠন ইত্যাদি) কোন আধুনিক ও যুগোপযোগী সমাধান বের করতে চাই তাহলে শুরুতেই সেইগুলির ব্যাপারে আল্লাহর কোন নির্দেশনা আছে কিনা তা অবশ্যই দেখে নিতে হবে। কারণ তা না হলে আমাদের ঈমান যে কেবল প্রশ্নের

মুখোমুখি হবে তা নয় বরং আল্লাহর নির্ভুল নির্দেশ অমান্য করে যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে তা হবে পুরো মানবজাতির উপর যুলুমের শামিল ।

আংশিক বা ভুল ঈমান

ঈমানদারগণের সকল ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ব্যর্থতার জন্য দায়ী আংশিক বা ভুল ঈমান। ঈমানের প্রকৃত সংজ্ঞা, ঈমানের দাবী, এর ভিত্তি, ঈমানের শাখা প্রশাখা, ঈমান বৃদ্ধির উপায়, ঈমানকে সতেজ রাখার উপকরণ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানের অভাব একজন ঈমানদারের ইহকাল ও পরকালকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ বিষয়ে ভুল জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সমাজকে সংক্রামিত করে, রাষ্ট্রীয় চরিত্রের উপরও এর ক্ষতিকর ছাপ ফেলে। ঈমানের জ্ঞানের গভীরতার উপর নির্ভর করে মানুষের আচার-আচরণ ও সারাদিনের কর্মতৎপরতা। ফলে একজন ঈমানদার কবির লেখনী অন্য যে কোন কবির লেখনী হতে সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন হবে। সঠিক ঈমানের অধিকারী মন্ত্রী আর অপর মন্ত্রীদের কর্ম খুব সহজেই ভিন্ন হবে। একজন ঈমানদার ট্যাক্সি ড্রাইভার আরেকজন ঈমান বিহীন ট্যাক্সি ড্রাইভারের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা হবে।

ঈমানদারদের করণীয়

একজন ব্যক্তি মুসলিম হওয়ার পর তার সর্বপ্রথম দায়িত্ব ঈমানের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া। ঈমানদারদের উপর আল্লাহর হক (অধিকার) কী কী তা জেনে নেয়া। জীবনের সঠিক লক্ষ্য ঈমানের আলোকে ঠিক করে নেয়া, সফলতা ও ব্যর্থতার মাপকাঠি আল্লাহর দেয়া সংজ্ঞার আলোকে নির্ধারণ করা, ঈমানের সাথে সংগতি রেখে আনন্দ ও বেদনার সীমা জেনে নেয়া, ঈমানের মেজাজে বন্ধু ও শত্রুর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা, প্রতিবেশীর অধিকার ও তাদের প্রতি আচরণ ইত্যাদি জেনে তদনুযায়ী কাজ করা, অন্যের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হওয়া, ঈমানী চেতনাকে সবসময় সঙ্গে রাখা। বান্দার উপর আল্লাহর হকের ব্যাপারে, মাতা-পিতার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে, ওয়াদা করার সময়, আমানত রক্ষার ক্ষেত্রে, ওজন করার সময়, ঋণ নেয়া ও পরিশোধের সময় – অর্থাৎ সকল সময় ঈমানকে সতেজ ও স্মরণে রেখে কাজ করা জরুরী।

ঈমান সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত (নামায) আদায়কারী ব্যক্তির পক্ষে ওজনে কম দেয়া সম্ভব। ঈমানের মৌলিক জ্ঞান না থাকার কারণে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সিয়াম পালনকারীর পক্ষেও আমানতের খেয়ানত করা সম্ভব। হাজী হয়েও ওয়াদা খেলাফ করা

মামুলী ব্যাপার হতে পারে, সব আনুষ্ঠানিক ইবাদত সম্পাদন করেও মিথ্যা বলা সম্ভব। পিতামাতার সন্তুষ্টির প্রতি চরম অবহেলা, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের হক আদায়ে উদাসীনতা, গরীব আত্মীয়-স্বজনকে শুধু সুনামের জন্য দান-সদাকা করা, মিসকিনের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো এ ধরণের ব্যক্তিদের পক্ষে কঠিন কিছু নয়।

ঈমানের উপর টিকে থাকা

ঈমান এমন কোন বিষয় বা বস্তু নয় যা একবার অর্জন করলে এটা আর আমাকে ছেড়ে যাবে না। এ ঈমান না চাইলে তা সাধারণত কাউকে দেয়া হয় না এবং ধরে রাখতে না চাইলে তা থাকে না।

ঈমানকে সবসময় তাকওয়ার মাধ্যমে লালন ও শক্তিশালী করতে হয়। আমার এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে একবার ঈমান যখন এনেছি এটা আমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমার সাথে সাথে থাকবে। ঈমানের উঠা-নামা নির্ভর করে আমার প্রতিদিনের কর্মের উপর।

দ্বীনের স্বচ্ছ ধারণা

দ্বীন শব্দটির প্রচলিত কিন্তু অপূর্ণাঙ্গ অর্থ হচ্ছে ধর্ম। এতে দ্বীনের পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ পায়না। এর প্রকৃত অর্থ ব্যাপক। তবে সংক্ষেপে ও এককথায় দ্বীন শব্দের অর্থ ঃ জীবন-বিধান। আল কুরআনে দ্বীন শব্দটি কয়েক ধরণের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এর মধ্যে জীবনের সকল মৌলিক বিষয়ের নির্দেশনা পাওয়া যায়।

মুসলিম জনগোষ্ঠীর বেশীর ভাগই আজ দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা সত্ত্বেও দ্বীন জানার ভান করে নির্দ্বিধায় দ্বীন-বিরোধী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বরং কেউ বাধা দিলে চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে তর্ক শুরু করে দেয়। কেবল সলাত-সিয়াম পালনকে দ্বীন মনে করছে। আবার মুসলিস জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ দ্বীনের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ও অস্পষ্ট বিষয়গুলোকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট বিষয়াদির উপর স্থান দিয়ে বিকৃতির প্রতিযোগিতায় বিভোর রয়েছে।

সুতরাং কোন ব্যক্তিকে দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে জানানো ও বুঝানোর জন্য নূন্যতম ভূমিকা রাখাও যে কত বড় পূণ্যের কাজ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি

(Clear Knowledge & Understanding of Deen)

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যাকে কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন, তাকে তিনি দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও তা উপলব্ধি করার ক্ষমতা (clear knowledge & understanding) দান করেন। (মুসনাদে আহমাদ)

দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি লাভ আল্লাহর করুণা ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যে কেউ চাইলেই এটা পেতে পারে না। তবে অব্যাহত প্রচেষ্টা, প্রবল ইচ্ছা ও সর্বদা আল্লাহর অনুগত বান্দাগণের দ্বীনের জ্ঞান ও উপলব্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ধরনের ভাগ্যবানদের সাথে কথা বললেই বুঝা যায় যে তারা অন্যদের চাইতে কিছুটা ব্যতিক্রম। তারা দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে গতানুগতিক ব্যাখ্যা দেন না। তারা দ্বীনকে খুব সুন্দর করে মানুষের নিকট উপস্থাপন করতে পারেন। তারা দ্বীন সম্পর্কে এক শ্রেণীর মানুষের মাঝে যে ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে তা দূর করার চেষ্টা করেন। অজ্ঞ লোকদের থাবা থেকে বের করে দ্বীনকে গণমানুষের সামনে সহজ সরল ভাষায় তুলে ধরেন। এ ধরনের ঈমানদারদের মাধ্যমে আল্লাহ দ্বীনের সৌন্দর্য ও শোভা সমাজে, রাষ্ট্রে ও সমগ্র দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেন। খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে বেশী গুরুত্ব না দিয়ে বরং দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের প্রতি নজর দেয়াই থাকে তাদের প্রধান লক্ষ্য। তারা সবাইকে সংগঠিত করার দিকেও মন দেন। মুসলিমদের ঐক্য তাদের স্বপ্ন, বিশ্বমুসলিমের ভ্রাতৃত্ব অর্জন তাদের আকাঙ্ক্ষা, মুসলিমদের শিক্ষা তাদের কর্মসূচী। দ্বীনের বুঝ যিনি লাভ করেন তার মনের দুয়ার কখনো বদ্ধ থাকে না। জ্ঞানের পিপাসা ও জানার আগ্রহ তার অদম্য।
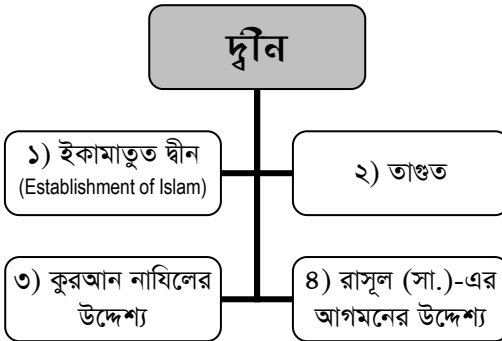
একজন প্রকৃত মুসলিমের উপরের এই বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা অবশ্য কর্তব্য। তা না হলে তার প্রতিটি কাজ-কর্মের মধ্যে গলদ ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সে কী কাজ করছে, কিসের জন্য করছে কিছুই ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারবে না। সারাক্ষণ একটা গোলকধাঁধার মধ্যে দিন কাটাবে। কারণ তার জীবনের vision এবং mission কোনটাই ঠিক নেই। এই দুটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটানোও খুব কঠিন কাজ। যারা নিজেদের জীবনে কাজে-কর্মে এই দুটি বিষয়ে সমন্বয় ঘটাতে পেরেছেন তারা খুবই ভাগ্যবান। এবং এটা মহান আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তার জন্য এক বিশেষ নিয়ামত।

বাস্তবে দেখা যায় যে, কেউ কেউ ইকামাতুদ দ্বীন (ইসলামি বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা) বোঝেন কিন্তু আকীদাগত (বিশ্বাস) দিক দিয়ে পরিষ্কার না। আবার কেউ কেউ আকীদাগত দিক দিয়ে পরিষ্কার কিন্তু ইকামাতুদ দ্বীন বোঝেন না। আল-কুরআন পড়ছি, কুরআন গবেষণা করছি, হাদীস পড়ছি, ইবাদত-বন্দেগী করছি, কুরআনের তাফসীর করছি কিন্তু গোটা কুরআন থেকে ইকামাতুদ দ্বীনকে বের করে দিয়েছি, আমার চোখে ইকামাতুদ দ্বীন ধরাই পড়ে না, পড়লেও এড়িয়ে যাই। আমরা জানি আল কুরআনে সলাত প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে ৮০ বারের মতো অথচ ইকামাতুত দ্বীনের কথা বলা হয়েছে ২০০ বারেরও বেশী। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হওয়া যাবে।

একটি বাচ্চা অসুখ হলে সাধারণত ট্যাবলেট খেতে চায় না। তাই মা এবার তাকে ট্যাবলেট খাওয়ানোর জন্যে একটি কৌশল অবলম্বন করেছে। বাচ্চাটি কলা খেতে খুব পছন্দ করে। তাই মা ট্যাবলেটটি তার কলার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কলাটি সম্পূর্ণ খাওয়া শেষ হওয়ার পর মা বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করছে যে 'বাবা কলা খেয়েছো?' বাচ্চা উত্তরে বলছে, 'মা কলা খেয়েছি কিন্তু বিচিটা খাইনি ফেলে দিয়েছি।' তাই আমরা অনেকেই দ্বীন পালন করি কিন্তু নিজের জীবন থেকে, পারিবারিক জীবন থেকে, সামাজিক জীবন থেকে, রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে আল কুরআনের মূল লক্ষ্য (objective) ইকামাতুদ দ্বীন বাদ দিয়ে দিয়েছি।

তাই একজন প্রকৃত মুসলিম হিসেবে আমাকে জানতে হবে কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় কী? কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য কী? রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমনের উদ্দেশ্য কী? রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার মক্কী জীবনের ১৩টি বছর মানুষের আকীদা পরিষ্কার করেছেন। আল কুরআনের মক্কী সূরাগুলো নাযিল হয়েছে আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে। আর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার মাদানী জীবনের ১০টি বছর ইকামাতুদ

দ্বীনের কাজ করেছেন। আল কুরআনের মাদানী সূরাগুলো ইকামাতুদ দ্বীন বিষয়ে নাযিল হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ২৩ বছর নবুয়ত জীবনে উপরের এই দু'টি কাজ করেছেন। এবং আল-কুরআনও নাযিল হয়েছে মূলতঃ এই দু'টি বিষয়ের জন্য। আমরা নিম্নে আল-কুরআনের আলোকে দ্বীন ও তাগুত সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছুটা জেনে নেই।

কুরআনের আলোকে 'দ্বীন' এর অর্থ

আমরা একটু আগেই আলোচনা করেছি দ্বীন শব্দটির প্রচলিত কিন্তু অপূর্ণাঙ্গ অর্থ হচ্ছে ধর্ম এবং এক কথায় দ্বীন শব্দের অর্থ ঃ জীবন-বিধান। আল কুরআনে দ্বীন শব্দটি কয়েক ধরণের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এর মধ্যে জীবনের সকল মৌলিক বিষয়ের নির্দেশনা পাওয়া যায়। যেমন ঃ

১. সূরা আল ফাতিহার ৩ ও সূরা আল ইনফিতর ৯ আয়াতে এর অর্থ **প্রতিদান বা বদলা বা বিনিময়**।

২. সূরা আলে ইমরান ৮৩, সূরা আয যুমার ২, সূরা আল বাকারা ১৯৩ আয়াতগুলিতে দ্বীন শব্দের অর্থ বুঝানো হয়েছে **আনুগত্য বা আত্মসমর্পণ**।

৩. সূরা আলে ইমরান ১৯, ৮৫, সূরা আশ শূরা ১৩, সূরা আস সফ ৯, আয়াতগুলিতে বুঝানো হয়েছে **আনুগত্যের বিধান**।

৪. সূরা আল মুমিনুন ২৬, সূরা ইউসুফ ৭৬, সূরা আন নূর ২, সূরা তাওবা ২৯ আয়াতগুলিতে বুঝানো হয়েছে **রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও আইন বিধান** ইত্যাদি।

আল্লাহর দ্বীন মানব জীবনের সকল মৌলিক দিকের পথনির্দেশনা দান করে। ইসলামই একমাত্র দ্বীন যা আদম (আলাইহিস সালাম) হতে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে মানুষের জন্য দিকনির্দেশনা (গাইডলাইন) হিসেবে আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। শারীয়াহ হলো দ্বীন অনুসরণ ও বাস্তবায়নের বিস্তারিত পন্থা। মানুষের স্বভাব, প্রয়োজন, স্থান, কাল ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে শারীয়ার পরিবর্তন হয়েছে। বিভিন্ন নবীর শারীয়ার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু আল্লাহ এর পরিপূর্ণতা বিধান করেছেন শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে।

মানুষের কল্যাণের জন্যই মহান আল্লাহ এ সুন্দর, সহজ ও গতিশীল বিধানের ব্যবস্থা করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

ইসলামের অর্থ

ইসলাম শব্দের অর্থ আনুগত্য করা, কোন কিছু মাথা পেতে নেয়া। পারিভাষিক অর্থে একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ও রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদর্শিত জীবন-পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং এর বিপরীত সমস্ত মত ও পথ পরিহার করে চলাকেই বলা হয় ইসলাম। মূলতঃ মানুষ ইসলামি আদর্শ কবুলের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাথে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তির ফলে আল্লাহর কিছু হক বান্দার উপর ফরয হয় এবং বান্দার কিছু হক আল্লাহর উপর ফরয হয়। এটা খুব সুন্দরভাবে রসূল (সা.) একটি হাদীসে বর্ণনা করেছেন। মুআয (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেন, তুমি কি যান বান্দার উপর আল্লাহর হক কি? তিনি (সা.) বলেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো বান্দা শুধু আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং ইবাদতে কোন অংশীদার সাব্যস্ত করবেনা। রসূল (সা.) আরো বলেন, তুমি কি যান আল্লাহর উপর বান্দার হক কি যদি সে তা করে (অংশীদারবিহীন শুধু আল্লাহর ইবাদত)? তিনি বান্দাকে শস্তি দেবেন না। (সহীহ বুখারী)

ইসলাম হলো মানুষের ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির একমাত্র উপায়। কিন্তু সে শান্তি নিছক নীতিকথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কিংবা নয় নিছক কিছু শান্তি-মূলক উপদেশবাণীর মধ্যেও সীমাবদ্ধ। ইসলাম শান্তি এই অর্থে যে, মানুষের জীবন ও সমাজের সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করছে ইসলাম না থাকার কারণে। অন্য কথায় আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামীর পরিবর্তে মানুষ মানুষের দাসত্ব ও গোলামীতে নিমজ্জিত আছে বলেই মানুষের সমাজে অশান্তির আগুন জ্বলছে। সর্বশক্তি নিয়োগ করে, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে মানুষের সমাজকে এই অশান্তির কবল থেকে মুক্ত করার জোর তাকিদ ইসলামে রয়েছে বলেই ইসলাম শান্তির বাহক। এই শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক দাবী অনুসারে ইসলামকে শক্তির অধিকারী হওয়া একান্তই অপরিহার্য। এভাবে ইসলামের নিজস্ব পরিচয়ের মাঝে মানুষের সমাজে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটানোর উপাদান নিহিত রয়েছে।

ইসলাম মানুষের জন্যে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্বত্র এই জীবনবিধানের প্রতিষ্ঠা লাভই এর অন্তর্নিহিত দাবী। মানব সমাজকে মানুষের প্রভুত্বের যাঁতাকল থেকে মুক্ত করে আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে মানুষকে সুখী ও সুন্দর জীবনযাপনের সুযোগ করে

দেয়াই ইসলাম। কাজেই মানুষের প্রকৃত শান্তি, মুক্তি ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার নামই ইসলাম।

আল্লাহর পথ কী? দুনিয়ায় মানুষের জীবনযাপনের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা যে পথ ও পন্থা নবী-রসূলদের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিয়েছেন আল্লাহর পথ বলতে সেটাকেই বোঝায়। এই পথে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানোর অর্থ এই পন্থা ও পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করা।

ইকামতে দ্বীন

ইকামতে দ্বীন অর্থ দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। আর দ্বীন প্রতিষ্ঠা বলতে বুঝায় কোন একটা জনপদে দ্বীন ইসলাম একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণ বিধি-বিধান অনুসরণ ও বাস্তবায়নের পথে কোন প্রকারের বাধা ও অন্তরায় না থাকা। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা শূরায় ঘোষণা করেছেন ঃ

"তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের সেই নিয়মকানুন নির্ধারণ করে দিয়েছেন যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর যা এখন তোমার প্রতি হিদায়াত ওহীর মাধ্যমে প্রদান করছি, আর সেই হিদায়াত যা আমি ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে প্রদান করেছিলাম। (সব নির্দেশের সার কথা ছিল) তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা কর এই ব্যাপারে পরস্পর দলাদলিতে লিপ্ত হয়ো না।" (সূরা আশ শূরা ঃ ১৩)

এভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানোটাই হওয়া উচিত প্রতিটি মুসলিমের জাগতিক লক্ষ্য। আর এরই মাধ্যমে অর্জিত হয় পারলৌকিক লক্ষ্য অর্থাৎ নাজাত (মুক্তি) ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দুনিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল কুরআনে যা বলা হয়েছে তারও সার কথা এটাই।

জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর হওয়া প্রয়োজন

জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা

জিহাদ সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এটি কুরআনের একটি শব্দ। ইসলামের শত্রুরা আধুনিক মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে মুসলিম-অমুসলিম সকলের মগজে জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছে যেমন ঃ

১. ইসলাম মানে টেররিজম (সন্ত্রাসবাদ);
২. মুসলিম মানে টেররিষ্ট (সন্ত্রাসী);
৩. ভাল মুসলিম মানে ফান্ডামেন্টালিষ্ট (মৌলবাদী);
৪. জিহাদ মানে সশস্ত্র যুদ্ধ;
৫. জিহাদ মানে নরহত্যা, ধ্বংস, রক্তপাত;
৬. জিহাদ মানে বোমা হামলা, আত্মঘাতী, বোমা মেরে ধ্বংস ঘটানো;
৭. জিহাদ মানে ধর্ম যুদ্ধ ইত্যাদি।

জিহাদ সম্পর্কে উপরের এই ৭টি ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল।

জিহাদ এর সঠিক ধারণা

'জিহাদ' শব্দের অর্থ প্রচেষ্টা বা struggle. কোন কিছু লাভ করার জন্য শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, বুদ্ধিবৃত্তিক সকল প্রকার প্রচেষ্টা এবং তার জন্যে সকল উপায়-উপাদান কাজে লাগানোকে জিহাদ বলে।

ফী সাবীলিল্লাহ অর্থ আল্লাহর রাস্তায়। আল্লাহর রাস্তায় সর্বদিক থেকে এবং সব উপায় অবলম্বন করে প্রচেষ্টা চালানোকে জিহাদ বলে। দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য জবান (মুখে কথা), লেখনী, প্রচার মাধ্যম, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক তৎপরতা, সম্পদ ব্যয়, সর্বোপরি নিজের জীবন বিলিয়ে দেবার নাম জিহাদ। দ্বীনের জন্য একটি বাক্য ব্যয় করা, এক কদম হেঁটে যাওয়া, একটি লাইন লেখা, কারো সাথে সুন্দর ব্যবহার ইত্যাদি সবই জিহাদের অংশ। দ্বীনকে সমুজ্জল করার জন্য যে কোন প্রচেষ্টাও জিহাদের অংশ। দ্বীনের কাজে লাগবে, মুসলিম জনতার উপকারে আসবে এমন সকল কাজই জিহাদের সমতুল্য।

জিহাদের অর্থ যুদ্ধ, ধ্বংস বা রক্তপাত নয়

জিহাদের অর্থ যুদ্ধ, ধ্বংস বা রক্তপাত নয়। যুদ্ধ হচ্ছে "হার্‌ব" (আরবী) এবং "কতল" (আরবী) হচ্ছে লোক হত্যা। ইসলাম কখনোই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে প্রশ্রয় দেয় না এবং ইসলাম এসেছেই সন্ত্রাস দূর করার জন্য। কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে কোন অন্যায় করে থাকে সেটা তার অন্যায় আর এজন্য তার শাস্তি হওয়া উচিত এবং ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিগত কার্যকলাপের সাথে ইসলামকে কোনভাবেই জড়ানো যাবে না। কোন জঙ্গি দল যদি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করে সেটা তাদের অপরাধ, এর সাথে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম সব সময় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, আর জিহাদ হলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। জিহাদের বাস্তবায়ন হলো যেখানেই অন্যায় সেখানেই প্রতিবাদ করা। আমার কোন নিকট আত্মীয় যদি অন্যায় করে তাকে গিয়ে বলতে হবে যে আপনি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাচ্ছেন। আর একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, Communism, Capitalism, Secularism ইত্যাদি বলতে যেমন কিছু বিষয় রয়েছে কিন্তু দ্বীন ইসলামে Islamism বলতে কোন শব্দ নেই, এটা মিডিয়ার নতুন আবিষ্কার। ইসলাম কোন 'ইজমে' বিশ্বাস করে না।

জিহাদের উপর একটি বাস্তব উদাহরণ

আমাদের অজ্ঞতার কারণে জিহাদের সাথে যুদ্ধের যে সংমিশ্রণ আমরা করে ফেলি সে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। যেমন, আমরা ক্যানাডায় থাকি এবং এই দেশের শান্তি প্রিয় দেশপ্রেমিক নাগরিক। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, আশেপাশের কোন একটি দেশ এসে হঠাৎ একদিন ক্যানাডাকে দখল করার জন্য আক্রমণ করে বসলো, দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে গেল। তখন আমি কি হাত-পা গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকবো? নাকি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বো? একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে অবশ্যই তখন আমাকে শত্রুর বিরুদ্ধে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য, দেশকে বাঁচানোর জন্য, দেশের সম্পদ রক্ষার জন্য, নিরীহ দেশবাসীর জন্য যুদ্ধ করতে হবে। এটা তখন আমার ঈমানী দায়িত্ব, আমার নাগরিক দায়িত্ব। কেউ যদি আমাকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে তা প্রতিরক্ষার জন্য সংগ্রাম করাও জিহাদ। ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জীবনে যতগুলো যুদ্ধ করেছিলেন তা ছিল সবই প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ অর্থাৎ শত্রুপক্ষ আগে আক্রমণ করেছিল বা আক্রমনের পরিকল্পনা করেছিল বিধায় তিনি নিজেদেরকে প্রতিরক্ষা করেছিলেন। কখনোই কাউকে গিয়ে আগে আক্রমণ করার জন্য যুদ্ধ করেননি।

জিহাদ দুই ধরণের হতে পারে

১. আল্লাহর পথে জিহাদ।

২. শয়তানের পথে জিহাদ।

আমার যে প্রচেষ্টা দ্বীনের উপকারে আসবে তাই আল্লাহর পথে জিহাদ। আর আমার যে প্রচেষ্টা দ্বীনের কোন উপকারে আসবে না রবং দ্বীনের ক্ষতি করবে তা হচ্ছে শয়তানের পথে জিহাদ। যেমন অনেক মুসলিম নামধারী বুদ্ধিজীবী আছেন তারা আল্লাহর দেয়া ঐ বুদ্ধিকে আল্লাহরই বিরুদ্ধে কাজে লাগাচ্ছেন। তারা বিভিন্ন রকম গবেষণা করে বের করার চেষ্টা করছেন যে কুরআনে কী কী ভুল ভ্রান্তি আছে, ইসলামে কী কী shortcomings আছে বা ইসলামের কোন কোন বিষয়গুলো ঠিক নয় বা ইসলামের কোন কোন দিকগুলো backdated। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জীবনে কী কী কাজ ঠিক করেননি। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সব হাদীস সঠিক নয়, যেমন বুখারী-মুসলিম। আল্লাহ কুরআনে যে বিষয়গুলোকে হারাম করেছেন তারা তার থেকে কিছু কিছু বিষয় যুক্তি দিয়ে হালাল করার চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ আবার কুরআনকে revise করার জন্য প্রস্তাব দিচ্ছেন। তারা তাদের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে কুরআন-হাদীসের বাইরে তাদের চোখে দেখা ইসলামের ভুল-ভ্রান্তির সমাধান পেশ করছেন, ইসলামকে আধুনিক করার চেষ্টা করছেন। তাদের এই অক্লান্ত প্রচেষ্টাও এক প্রকারের জিহাদ আর তা হচ্ছে শয়তানের পথে জিহাদ এবং আল্লাহ ও রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে জিহাদ।

জিহাদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন

- *"আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন, আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি।" (সূরা হাজ্জ ২২ ঃ ৭৮)*
- *"হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছো! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের কথা বলবো যা তোমাদেরকে কঠিন আযাব হতে রক্ষা করবে? তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে, নিজেদের মাল-সম্পদ ও নিজেদের জীবন দ্বারা। এটিই তোমাদের জন্যে অতীব উত্তম, যদি তোমরা তা বুঝতে পার।" (সূরা সফ ৬১ ঃ ১০-১১)*

- *“আল্লাহ তো ভালবাসেন সেই লোকদেরকে যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা দুর্ভেদ্য এক প্রাচীর।” (সূরা সফ ৬১ ঃ ৪)*
- আবু যার গিফারী (রাদিআল্লাহু আন্‌হু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী! কোন আমলটি [আল্লাহর নিকট] সবচেয়ে উত্তম? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং তার পথে জিহাদ করা। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

জিহাদ সম্পর্কে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ

- নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের [দ্বীনের] মূল সূত্র, তার স্তম্ভ এবং সর্বোচ্চ চূড়ার সন্ধান দেব না? তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, দ্বীনের মূল হল ইসলাম, খুঁটি হল সলাত এবং তাঁর সর্বোচ্চ চূড়া হল জিহাদ। (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)
- রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদে শরীক হল না কিংবা জিহাদ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনাও করল না আর এই অবস্থায়-ই মারা গেল, সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করল। (সহীহ মুসলিম)

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ হচ্ছে আল্লাহর কাজ। এই ফরয কাজ থেকে যখন কোন মুসলিম সম্প্রদায় বিরত থাকবে, তখন সেই সম্প্রদায়ের উপর বিভিন্ন শাস্তি নেমে আসবে। যেমন মুসলিম জনগণের উপর দুষ্ট প্রকৃতির চরিত্রহীন ও অত্যাচারী লোকদের কর্তৃত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়া, আল্লাহর রহমত নাযিল বন্ধ হয়ে যাওয়া, আল্লাহর নিকট দু'আ কবুল না হওয়া, আযাবের পর আযাব এসে বিভিন্ন জনপদকে ধ্বংস করে দেয়া ইত্যাদি।

একজন অমুসলিমের প্রশ্ন - সূরা তাওবার আয়াত

ক্যানাডার টরন্টো শহরের সবচেয়ে ব্যস্ততম জায়গা Heart of the Downtown-এ আমরা প্রত্যেক শনিবার এবং রবিবার দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত অমুসলিম টুরিষ্টদের মাঝে স্ট্রিট দাওয়াতী কাজ করে থাকি। সেই বুথ

(booth) থেকে আমরা অমুসলিমদের মধ্যে হাজার হাজার কুরআনের কপিসহ বিভিন্ন ভাষায় ইসলামের দাওয়া সংক্রান্ত বই-পুস্তক বিতরণ করে থাকি। একদিনের একটি ঘটনা। একজন অমুসলিম আক্রমণাত্মক ভংগিতে কুরআনের একটি ইংলিশ ট্রান্সলেশনের কপি এনে সূরা তাওবার ৫নং আয়াত quote করে অভিযোগ করছেন যে, এখানে বলা হয়েছে - "অমুসলিমদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর"। এবং সে কুরআনের এই ধরণের উক্তির ব্যাপারে খুবই রাগান্বিত। এখানে দুই পক্ষের জন্যই একটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। সর্বপ্রথমে ঐ অমুসলিমের তথ্যে কিছুটা ফাঁক রয়েছে (ইনফর্মেশনের গ্যাপ) ফলে সে কুরআনের আয়াতটির আংশিক কোট করেছে। শুধু সেখানেই শেষ নয়, সূরা তাওবায় একটি যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই আয়াতটি ঐ যুদ্ধের ভিতরের একটি নির্দেশের অংশ। পুরো বিষয়টি জানতে হলে এই ৫নং আয়াতের আগের এবং পরের আয়াতগুলোও বিস্তারিত পড়তে হবে তাফসীরসহ। তা না হলে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হবে। কারণ আল-কুরআন নাযিল হয়েছে গোটা মানব জাতির কল্যাণের জন্য, সে মুসলিম কি অমুসলিম সেটা ধর্তব্য বা বিবেচ্য নয়।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে সূরা তাওবার ৫নং আয়াতটি বুঝার চেষ্টা করি। আমেরিকা এবং ভিয়েতনামের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে। এখন যদি আমেরিকান আর্মি জেনারেল তার সৈন্যদেরকে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অর্ডার দেন যে 'যুদ্ধের মাঠে যেখানেই ভিয়েতনামীদের পাবে হত্যা করবে' তাহলে কি ভুল হবে? হ্যাঁ, ভুল হবে তখনই যদি ঐ জেনারেল যুদ্ধ ছাড়া অন্য সময়ে বলেন 'ভিয়েতনামীদের যেখানে পাবে সেখানেই হত্যা করবে'।

সূরা তাওবার ৫নং আয়াতের আগের ও পরের আয়াতগুলো যদি আমরা ভালো করে পড়ি তাহলে দেখবো যে, এটি যুদ্ধকালীন নির্দেশ এবং তার পরের আয়াতেই বলা হয়েছে যে "তারা যদি আত্মসমর্পণ করে তা হলে তাদেরকে হত্যা করার প্রশ্ন তো উঠেই না বরং তাদেরকে সসম্মানে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিবে। যাহোক এই ঘটনাটি এজন্য তুলে ধরা হলো যে, অমুসলিম দেশে দ্বীন ইসলামের দাওয়াতী কাজের বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা (মিসইন্টারপ্রেট) করা যাবে না। কুরআনের বা হাদীসের কোন অংশ নিয়ে ভুল-বুঝাবুঝির সৃষ্টি করা যাবে না এবং ইসলাম-বিদ্বেষীরাও যেন এই সুযোগ না পায় সেদিকে আমাদের সচেতন থাকতে হবে।

আমরা কি কালিমা বুঝে মুসলিম?

মানুষ একটি কালিমা পাঠ করে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে থাকে। "*লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ*" এ কয়টি শব্দ মুখে উচ্চারণ করলেই মানুষ একেবারে বদলে যায়। পূর্বে সে নাপাক ছিল, কিন্তু এখন সে পাক হয়ে গেল। পূর্বে তার উপর আল্লাহর আযাব আসতে পারতো, কিন্তু এখন সে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে গেল। প্রথমে সে জাহান্নামে যাবার যোগ্য ছিল, এখন জান্নাতের দরজা তার জন্য খুলে গেল। শুধু এটুকুই নয়, এ 'কালিমা'র দরুন মানুষের মাঝে বড় ব্যবধান সৃষ্টি হয়। এ 'কালিমা' যারা পড়ে তারা এক উম্মাত আর যারা এটা অস্বীকার করে তারা হয় আলাদা এক জাতি। পিতা যদি 'কালিমা' পড়ে আর পুত্র যদি তা অস্বীকার করে তবে পিতা আর পিতা থাকবে না, পুত্র আর পুত্র বলে গণ্য হবে না, পিতার সম্পত্তি হতে সেই পুত্র কোনো অংশই পাবে না। পক্ষান্তরে একজন বিধর্মী যদি কালিমা পড়ে, আর ঐ ঘরের মেয়ে বিয়ে করে, তবে সে এবং তার সন্তান ঐ ঘর হতে সম্পত্তি পাবে। কিন্তু নিজ ঔরসজাত সন্তান শুধু এ 'কালিমা'কে অস্বীকার করার কারণেই একেবারে পর হয়ে যাবে। এটা দ্বারা বুঝতে পারা যায় যে, এ 'কালিমা' এমন এক জিনিস যা পরকে আপন করে একত্রে মিলিয়ে দেয়, আর আপন লোককে পর করে পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন করে।

কালিমা তাইয়্যিবার প্রকৃত অর্থ

এই 'কালিমা'র অর্থ কী? তা পড়ে মানুষ কী কথা স্বীকার করে, আর তা স্বীকার করলেই মানুষ কোন বিধান মত চলতে বাধ্য হয়? "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার রসূল।" কালিমার মধ্যে যে 'ইলাহ' শব্দটি রয়েছে এর অর্থ হচ্ছে মালিক, সৃষ্টিকর্তা, মানুষের জন্য বিধান রচনাকারী, মানুষের দু'আ যিনি শোনেন এবং গ্রহণ করেন– তিনিই ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত সত্বা।

এখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়লে তার অর্থ হবে যে, আমি প্রথম স্বীকার করলাম ঃ এ দুনিয়া আল্লাহর আদেশ ছাড়া সৃষ্টি হতে পারেনি, এর সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই বর্তমান আছেন, আর সেই সৃষ্টিকর্তা একাধিক নন– মাত্র একজন। তিনি ছাড়া আর কারোও প্রভুত্ব কোথাও নেই। দ্বিতীয়ত 'কালিমা' পড়ে আমি স্বীকার করলাম যে, সেই এক আল্লাহ-ই মানুষের ও সারা জাহানের মালিক। আমি ও আমার প্রত্যেকটি জিনিস এবং দুনিয়ার প্রত্যেকটি বস্তুই তাঁর। সৃষ্টিকর্তা তিনি,

রিযিকদাতা তিনি, জীবন ও মৃত্যু তাঁরই হুকুম মত হয়ে থাকে। সুখ ও বিপদ তাঁরই কাছ হতে আসে। মানুষ যা কিছু পায়, তাঁরই কাছ হতে পায়– সকল কিছুর দাতা প্রকৃতপক্ষে তিনি। আর মানুষ যা হারায়, তা প্রকৃতপক্ষে তিনিই কেড়ে নেন। শুধু তাঁকেই ভয় করা উচিত, শুধু তাঁরই কাছে প্রার্থনা করা উচিত, তাঁরই সামনে মাথা নত করা উচিত। কেবলমাত্র তারই ইবাদত ও বন্দেগী করা কর্তব্য। তিনি ছাড়া আমাদের মনিব, মালিক ও শারীআতের আইন রচনাকারী আর কেউই নেই। একমাত্র তাঁরই হুকুম মেনে চলা এবং কেবল তাঁরই আইন অনুসারে কাজ করা এবং জীবনযাপন করা আমাদের আসল ও একমাত্র কর্তব্য।'কালিমা' লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়ে আমি আল্লাহর কাছে এ ওয়াদা-ই করে থাকি, আর সারা দুনিয়া এ মৌলিক অঙ্গীকারের সাক্ষী হয়ে থাকে।

এর বিপরীত কাজ করলে আমার জিহ্বা, আমার হাত-পা, আমার প্রতিটি লোম এবং আকাশ ও পৃথিবীর এক একটি অনু-পরমাণু যাদের সামনে আমি এ ওয়াদা করেছিলাম আমার বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে সাক্ষ্য দেবে। আমার যুক্তি প্রমাণ করার জন্য একটি সাক্ষী কোথাও পাবো না। কোনো উকিল কিংবা ব্যারিষ্টার আমার পক্ষ সমর্থন করার জন্য সেখানে থাকবে না।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলার পর বলতে হয় 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'। এর অর্থ এই যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যস্থতায়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর শারীআতের আইন মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন– একথা আমরা স্বীকার করেছি। আল্লাহকে নিজেদের মনিব, মালিক ও বাদশাহ স্বীকার করার পর একথা অবগত হওয়ার একান্ত দরকার ছিল যে, সেই বাদশাহর আইন ও হুকুম কী? আমরা কোন্ কাজ করলে তিনি খুশী হবেন, আর কোন্ কাজ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন? কোন্ আইন অনুসরণ করলে তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন, আর কোন্ আইনের বিরোধিতা করলে তিনি আমাদেরকে শাস্তি দেবেন? এসব জানার জন্য আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তাঁর দূত নির্দিষ্ট করেছেন। তাঁর মধ্যস্থতায় তিনি আমাদের প্রতি তাঁর কিতাব পাঠিয়েছেন এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আল্লাহর হুকুম মেনে কিভাবে জীবনযাপন করতে হয়, তার বাস্তব উদাহরণ নিজের জীবনে দেখিয়ে গেছেন।

কাজেই আমরা যখন বলি, 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' তখন এর দ্বারা আমরা একথাই স্বীকার করে নিই যে, যে আইন এবং যে নিয়ম মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুসরণ করতে বলেছেন, আমরা তা মেনে চলবো। এ ওয়াদা

করার পর যদি আমরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রচারিত আইনকেই ছেড়ে দেই, আর দুনিয়ার নিয়ম অনুসরণ করে চলি তবে আমাদের চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী আর কেউ নেই। কারণ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রচারিত আইনকে একমাত্র সত্য আইন মেনে এবং তাকে অনুসরণ করে চলার অঙ্গীকার করে আমরা ইসলামের সীমার মধ্যে এসেছি।

আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর মালিক একথার অর্থ কী?

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এবং প্রত্যেক জিনিসেরই মালিক একথা আমরা স্বীকার করেছি। কিন্তু এর অর্থ কী? এর অর্থ এই যে, আমাদের জান-মাল আমাদের নিজ দেহ আল্লাহর। আমাদের হাত, কান এবং আমাদের দেহের কোনো একটা অঙ্গও আমাদের নিজের নয়। যে জমি আমরা চাষাবাদ করি, যেসব পশু দ্বারা আমরা কাজ করাই, যেসব জিনিস-পত্র আমরা সবসময় ব্যবহার করি, এদের কোনোটাই আমাদের নিজের নয়। সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার মালিকানা এবং আল্লাহর দান হিসেবেই এগুলো আমরা পেয়েছি। একথা স্বীকার করার পর আমাদের একথা বলার কি অধিকার থাকতে পারে যে, জান-প্রাণ আমার, শরীর আমার, মাল আমার, অমুক জিনিস আমার? অন্য একজনকে কোনো জিনিসের মালিক বলে ঘোষণা করার পর তার জিনিসকে আবার নিজের বলে দাবী করা সম্পূর্ণ অর্থহীন।

যদি বাস্তবিকই আল্লাহকে দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের মালিক মনে করি, তবে তা হতে আপনা আপনি দু'টি জিনিস আমাদের উপর এসে পড়ে।

প্রথম এই যে, আল্লাহ-ই যখন মালিক আর তিনি তাঁর মালিকানার জিনিস আমানত স্বরূপ আমাদেরকে দিয়েছেন, তখন সেই মালিকের হুকুম মতোই আমাদের সে জিনিসগুলো ব্যবহার করতে হবে। তাঁর ইচ্ছার বিপরীত কাজ যদি এর দ্বারা করি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা আমানতের খিয়ানত করছি। আমাদের হাত-পা পর্যন্ত সেই মালিকের ইচ্ছার বিপরীত কাজে ব্যবহার করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। আমাদের চোখ দ্বারাও কোন নিষিদ্ধ জিনিস দেখতে পারি না, যা তাঁর ইচ্ছার বিপরীত। আমাদের এ জমি-জায়গাকে মালিকের বিধানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার কোনোই অধিকার আমাদের নেই। আমাদের যে স্ত্রী এবং সন্তানকে নিজেদের বলে দাবী করি, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন বলেই তারা আমাদের আপন হয়েছে, কাজেই তাদের সাথে আমাদের ইচ্ছামত নয়– মালিকেরই আদেশ মত ব্যবহার করা কর্তব্য। তাঁর মতের উলটা যদি ব্যবহার করি, তবে আমরা অবাধ্য বলে অভিহিত হবার

যোগ্য। পরের জিনিস হরণ করলে, পরের জায়গা শক্তির বলে দখল করলে আমরা তাকে বলি যালিম; সেরূপ আল্লাহর দেয়া জিনিসকে নিজের মনে করে নিজের ইচ্ছা কিংবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোও ইচ্ছামত যদি ব্যবহার করি, তবে সেই যুলুমের অপরাধে আমরাও অপরাধী হবো।

দ্বিতীয় কথা এই যে, মালিক যে জিনিসই আমাকে দান করেছে, তা যদি সেই মালিকের কাজেই ব্যবহার করি, তবে তার দ্বারা কারোও প্রতি কোনো অনুগ্রহ হতে পারে না– মালিকের প্রতিও নয়। এ পথে যদি আমরা কিছু দান করলাম, কোনো খেদমত করলাম, কিংবা আমাদের প্রিয়বস্তু কুরবান করলাম, তবে তা কারোও প্রতি আমাদের একবিন্দু অনুগ্রহ নয়। আমাদের প্রতি মালিকের যে 'হক' ছিল এর দ্বারা শুধু তাই আদায় করলাম মাত্র। এতে গৌরব বা অহংকার করার মত কিংবা তারীফ বা প্রশংসা পাবার মতো কিছু নেই। মনে রাখতে হবে যে একজন খাঁটি মুসলিম মালিকের পথে কিছু খরচ করে কিংবা তার কিছু কাজ করে কিছুমাত্র গৌরব বোধ করে না, বরং সে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে কারণ গৌরব বা অহংকার ভাল কাজকে নষ্ট করে দেয়। যে ব্যক্তি প্রশংসা পাবার আশা করে এবং শুধু সে উদ্দেশ্যেই ভাল কাজ করে তার উদ্দেশ্য হলো যে সে তার কাজের প্রতিফল এ দুনিয়াতেই পেতে চাচ্ছে।

এখন নিজের সম্বন্ধে নিজে চিন্তা করি। যে ব্যক্তি আল্লাহকে নিজের প্রভু ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আল্লাহর রসূল মুখে মুখে স্বীকার করে এবং আখিরাতের উপর বিশ্বাস আছে বলে দাবী করে কিন্তু তার দৈনন্দিন জীবনে কাজকর্ম আল্লাহর কুরআন ও রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহীহ হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারায় চলে, তার সম্বন্ধে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, তার ঈমান আসলে খুবই দুর্বল।

কালিমার দু'টি অংশ

এ কালিমার দু'টি অংশ। একাংশে বলা হয়েছে **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ**। এই অংশে অন্যের নয়, শুধু মাত্র আল্লাহরই সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয় এবং অপর অংশে বলা হয়েছে **মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ**। এই অংশে স্বীকার করা হয় এবং যে মুহাম্মাদই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পাঠানো Appointed Authority. যেসব ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ক্ষমতা প্রদান করেছেন সেসব ক্ষেত্রে অন্যের কিছুই বলার অধিকার নেই।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'– কালিমার এ অংশের অর্থ জেনে একে মানলে নিম্নলিখিত কাজগুলো অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় ঃ

১. আল্লাহ ছাড়া আর কাকেও সাহায্যকারী, বিপদ হতে উদ্ধারকারী ও মুক্তিদাতা বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করব না।

২. আল্লাহ ছাড়া কেউ ক্ষতি-উপকার করতে পারে বলে মনে করতে পারব না, সকল ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করব।

৩. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট দু'আ করতে এবং সাহায্যের প্রার্থনা করতে পারব না।

৪. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত বা বন্দেগী করব না এবং কারও নামে মানত করব না।

৫. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে প্রভু, আইনদাতা ও বিধানদাতা এবং বাদশাহ বা সার্বভৌম বলে স্বীকার করব না– অন্য কারও আইন মানব না (এমন আইন মানব না যা মূলত আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে ও এটার সীমার মধ্যে রচিত হয়নি)।

৬. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও বান্দা বা দাস হয়ে থাকব না এবং নিজের প্রবৃত্তির কামনা ও দেশে চলতি প্রথাসমূহ অন্ধভাবে অনুসরণ করব না।

৭. জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহর বিধানকে একমাত্র ভিত্তি বলে মানব ও সে অনুযায়ী প্রত্যেকটি কাজ করবো।

৮. জীবনের প্রত্যেক কাজের জবাবদিহি কেবল আল্লাহর নিকট করতে হবে– এ বিশ্বাস হৃদয়-মনে সদা জাগ্রত রাখব, এবং যেকাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন সে কাজ করতে ও যেকাজে তিনি অসন্তুষ্ট হন তা হতে বিরত থাকতে সর্বদা চেষ্টা করব।

'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'– কালিমার এ শেষ অংশে উচ্চারণ এবং স্বীকার করলে মানতে হবে ঃ

১. মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ নবী ও রসূল।

২. তাঁর মাধ্যমে যে জীবনবিধান ও হিদায়াত আল্লাহর তরফ হতে এসেছে তাই সত্য এবং শাশ্বত।

৩. তাঁর প্রদর্শিত/বর্ণিত আদর্শ ও তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার বিরোধী যা কিছু আছে তার সবই ভুল এবং অবশ্য পরিত্যাজ্য।

৪. তিনি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিই মানুষের 'স্বাধীন নেতা' হতে পারে না। তিনিই কালিমাতে বিশ্বাসীদের একমাত্র চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ নেতা।

৫. অতএব মানব জীবনের প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সহীহ হাদীস তথা সুন্নাহ অনুসারে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬. এমন একটি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে যা এ কালিমা অনুযায়ী আল্লাহর সার্বভৌমত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আইন-বিধান রচনার মৌলিক অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই স্বীকৃত ও ঘোষিত।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আসল দায়িত্ব

আল্লাহ তা'আলা যে রাসূলের উপর কুরআন নাযিল করেছেন তাঁকে দুনিয়ার কোন্ দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তা কুরআনেরই তিনটি সূরায় স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

"তিনিই ঐ সত্তা, যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, যাতে (রসূল) ঐ দ্বীনকে অন্য সব দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন।" (সূরা তাওবা ঃ ৩৩, সূরা ফাত্হ ঃ ২৯ ও সূরা সফ ঃ ৯)

এ আয়াত থেকে জানা গেল, কুরআনই ঐ হিদায়াত ও সত্য দ্বীন (দ্বীনে হক), যাকে মানুষের মনগড়া মত, পথ ও বিধানের উপর বিজয়ী করার কঠিন ও মহান দায়িত্ব দিয়ে শেষ নবীকে পাঠানো হয়েছিল। এ দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে 'দ্বীন' শব্দের আসল অর্থ জানতে হবে। 'দ্বীন' শব্দের মূল অর্থ আনুগত্য বা মেনে চলা ছাড়া মানুষের উপায় নেই। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনসহ ছোট-বড় সব ব্যাপারেই কতক নিয়ম, আইন ও বিধান মেনে চলতে হয়। এসব আইন বানানোর সুযোগ যারা পায়, তারা সবার প্রতি ইনসাফপূর্ণ বিধান তৈরি করতে পারে না। সঠিক জ্ঞানের অভাবে বা দলগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের কারণে এসব বিধানের দ্বারা মানুষ শোষণ, যুলুম ও অশান্তি ভোগ করে। মানবরচিত এসব বিধানকেও ঐ আয়াতে

দ্বীন বলা হয়েছে। কেননা, সব বিধানই মানুষের নিকট আনুগত্য দাবি করে এবং মানুষ তা মেনে চলতে বাধ্য হয়।

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে মানুষের দ্বীনের শোষণ, অত্যাচার ও অশান্তি থেকে মুক্তি দেয়ার দায়িত্ব দিয়েই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে 'দ্বীনে হক'সহ পাঠিয়েছিলেন। মানুষ যেন আল্লাহর দ্বীনকে মেনে চলার সুযোগ পায় এবং অন্য কোনো দ্বীনের আনুগত্য করতে যেন বাধ্য না হয়, সে মহান উদ্দেশ্যেই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে পাঠানো হয়েছিল। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দীর্ঘ ২৩ বছরের কঠোর সাধনা, ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে অত্যন্ত সফলতার সাথে এ কঠিন দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। ইতিহাসই এর উজ্জ্বল সাক্ষী।

কুরআন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনেরই গাইড বুক

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে যে বিরাট, কঠিন ও মহান দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন, সে দায়িত্ব সঠিকভাবে ও সাফল্যের সাথে পালন করার জন্য যখন যতটুকু হিদায়াত দরকার ততটুকুই ওহীযোগ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জানানো হয়েছে। এভাবে সে কাজটিকে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় হিদায়াত সমাপ্ত হতেও পুরো ২৩ বছরই লেগেছে। কুরআন ঐসব হিদায়াতেরই সমষ্টি। এ কারণেই কুরআনকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সংগ্রামী জীবনের পথের দিশারি বা গাইড বুক বলা হয়।

যে কাজটি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ২৩ বছরে সমাধা করেছেন তা এমন ধরনেরই কাজ ছিল, যা তাঁর জীবনকে সংগ্রামী জীবনে পরিণত করেছে। জনগণকে কিছু মানুষের গোলামী থেকে মুক্তি দিয়ে একমাত্র আল্লাহর গোলাম হিসেবে জীবনযাপন করার সুযোগ দেওয়ার কাজই তিনি করেছেন। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, গাছ-পালা, নদী-নালা, আগুন-পানি, পাহাড়-পর্বত, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গসহ গোটা সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর বিধান মেনে চলে বলেই শান্তিতে আছে। মানুষও যদি তাঁরই বিধান মেনে চলার সুযোগ পায় তবেই তারা সত্যিকার শান্তি পেতে পারে। কিন্তু কিছু মানুষ তাদের মনগড়া নিয়ম-কানুন জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়ে আইন-শৃঙ্খলার নামে জনগণকে তাদের গোলাম বানিয়ে রাখে এবং অশান্তি ভোগ করতে বাধ্য করে।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের এ গোলামী থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রকে মুক্তি দেয়ার দায়িত্ব দিয়েই যুগে যুগে নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন। তাই দেখা যায়, সব

নবীকেই ঐসব লোক পদে পদে বাধা দিয়েছে, যারা জনগণের উপর মনিব সেজে বসেছিল। তারা নিজেদের স্বার্থেই কিছু বিধি-বিধান ও রসম-রেওয়াজ সমাজে চালু করেছে। এসবকে অমান্য করে আল্লাহর আইন মানার দাওয়াত যখনই কোনো নবী দিয়েছেন তখনই ঐসব স্বার্থবাদীরা বাধা দিয়েছে। এ কারণেই সব নবীদেরকে জীবনে বড়ই কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। বহু নবীকে এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সংগ্রামী জীবনের পটভূমি

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কার সমাজের দুর্দশা, মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও জোর-যুলুম দেখে দুঃখবোধ করতেন। যুবক বয়সে আরো কয়েকজন যুবককে নিয়ে 'হিলফুল ফুযূল' নামে এক সমিতির মাধ্যমে সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করতে গিয়ে সমাজের সমস্যা সম্পর্কে আরো বেশি করে জানতে পেরেছিলেন। সমিতির মাধ্যমে বিধবা ও ইয়াতীমদেরকে সাহায্য করা, ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করা, যালিমদের যুলুম থেকে মযলুমদের রক্ষা করা ইত্যাদি কাজ করতে গিয়ে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষের দুঃখে খুব কষ্ট পেতেন।

তিনি যে রসূল হবেন সে কথা তো ওহী নাযিল হওয়ার পরই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন; কিন্তু যে আল্লাহ তাঁকে রসূল নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি তো আগেই জানতেন। তাই আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে যোগ্য করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই সমাজসেবার মাধ্যমে তাঁকে সমাজ-সচেতন করে তোলেন। কারণ, যে কাজটি তাঁকে করতে হবে তা সমাজ বিপ্লবেরই কাজ। মানুষের প্রচলিত সমাজ ও মনগড়া রাষ্ট্রব্যবস্থার বদলে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সর্বক্ষেত্রেই যে পরিবর্তন আনতে হবে তা এত বড় বিপ্লবী কাজ, যার জন্য বিরাট দরদি মন দরকার। তাই পরম মানবদরদি হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে (সা.) গড়ে তুলেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার একটা মূলনীতি উল্লেখ করা প্রয়োজন। আল্লাহ যাঁকে নবী বা রসূল বানাতে চান তাঁকে তিনি জন্ম থেকেই সে উদ্দেশ্য গড়ে ওঠার সুযোগ দেন। আল্লাহ নিজেই তাঁর শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। মানুষের সমাজে বাস করলেও সমাজের কোন মানুষকে তাঁর শিক্ষক হতে দেয়া হয় না। কারণ শিক্ষক হিসাবে মানুষের কাছ থেকে ভালো ও মন্দ দু'রকমের

শিক্ষাই পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই একমাত্র আল্লাহই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষক।

নবুওয়াতী জীবনের ২৩ বছর

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন ৪০ বছর তখন হেরা গুহায় সূরা আ'লাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে ৬৩ বছর বয়সে দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়া পর্যন্ত মোট ২৩ বছর নবী হিসেবে তাঁর কর্মজীবন গণনা করা হয়।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সূরা মুদ্দাসসিরের প্রথম সাত আয়াতে প্রথম কর্মসূচী দেয়া হয়েছিল। তিনি সে অনুযায়ী পরিচিত মহলে দাওয়াত দিতে থাকেন। ধীরে ধীরে ঈমানদারদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তিন বছর পর্যন্ত গোপনেই দাওয়াত পৌঁছাতে থাকেন। তখনো তেমন কেউ বাধা দেয়নি বলে অনেকেই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যক্তিত্ব ও দাওয়াত এবং কুরআনের ভাষা ও বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তখন কুরাইশ নেতারাসহ সবার কাছেই জানাজানি হয়ে গেল, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন সব আকীদা-বিশ্বাস এবং মত ও পথের প্রচার করছেন, যা সমাজের প্রচলিত মত ও পথের বিরোধী।

নবুওয়াতের তৃতীয় বছরের শেষ দিকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাফা পাহাড়ের উপর থেকে জোর গলায় এমন আওয়াজ দিয়েছিলেন যে কুরাইশ সর্দাররাসহ মক্কাবাসীরা পাহাড়ের পাশে জমা হয়ে গিয়েছিল। তখন জনসভা ডেকে বক্তব্য রাখার এটাই নিয়ম ছিল। ঐদিনই তিনি প্রকাশ্যভাবে প্রথম তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। এরপর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এই প্রথম জনসভায় স্পষ্ট ভাষায় অতি দরদী সুরে ও আবেগের সাথে কালিমায়ে তাইয়্যিবার বিপ্লবী দাওয়াত পেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে কুরাইশ সর্দার আবূ জাহিল চিৎকার করে এর প্রতিবাদে প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু করেছিল।

মক্কার নেতারা বুঝতে পেরেছিল, মুহাম্মাদের (সা.) মতো জনপ্রিয় নেতার পেছনে জনগণ যেভাবে সাড়া দিচ্ছে, তা চলতে দিলে তাদের নেতাগিরি খতম হয়ে যাবে। সমাজব্যবস্থা বদলে যাবে। নতুন নেতা নতুন আইন জারি করবে। তাদের কর্তৃত্ব, স্বার্থ, সুযোগ-সুবিধা সব হারাতে হবে। ধর্মীয় নেতারা আরও বেশি খেপে গিয়েছিল। এভাবেই ইসলামের বিরোধিতা শুরু হয়েছিল।

প্রথমে সব নেতা মনে করেছিল মুহাম্মাদ (সা.) নেতৃত্ব চাচ্ছেন। অর্থাৎ, তাদের নিজেদের ধ্যান ধারণা অনুযায়ী দুনিয়ায় মানুষের যেসব কামনা বাসনা চাওয়া পাওয়া থাকতে পারে তা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল এবং সমাজে নতুন কথা বলে সমস্যা সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছিল। তারা বলেছিল, 'তোমাকে বাদশাহ মেনে নেব, যত ধন-দৌলত চাও সবাই দেব, যত সুন্দরী নারী চাও তাও দেব, তুমি এ আন্দোলন বন্ধ কর।'

তিনি যখন এ প্রস্তাব মেনে নেননি তখন তারা হাজারো অপপ্রচার চালিয়েছিল, যাতে জনগণ তাঁর দলে যোগ না দেয়। এতেও যখন কাজ হয়নি, তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল তাদের উপর সব রকমের অত্যাচার চালিয়েছিল। নবুওয়াতের পঞ্চম বছর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় রজব মাসে ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা সাহাবী রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুমতি নিয়ে মক্কা থেকে হিজরত করে হাবশায় (বর্তমানে ইরিত্রিয়ায়) চলে গিয়েছিলেন। ক্রমেই যুলুমের মাত্রা বাড়তে থাকায় আরো ৮৮ জন পুরুষ ও ১৫ জন মহিলা সাহাবী হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

নবুওয়াতের সপ্তম থেকে নবম বছর পর্যন্ত রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিজ বংশ গোটা বনূ হাশিমকে মক্কাবাসীরা বয়কট করে রেখেছিল। 'শিআবে আবী তালিব' নামক উপত্যকায় পূর্ণ তিনটি বছর তাদেরকে অনাহারে অর্দ্ধাহারে বন্দিজীবন কাটাতে হয়। বাইরে থেকে সেখানে পানি পর্যন্ত নিতে দেয়া হয়নি। গাছের পাতা খেয়ে তাদের দিন কাটাতে হয়েছিল। দশম বছরে বন্দিদশা কেটে গেলেও বিরোধিতা আরো বেড়ে যায়। দশম বছরেই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচা আবূ তালিব ও স্ত্রী বিবি খাদীজা (রাদিআল্লাহু আন্হা) ইন্তিকাল করার পর শত্রুদের অত্যাচার এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হত্যার পরিকল্পনা পর্যন্ত করা হয়েছিল। এর পরের তিন বছর বড়ই কঠিন সময় ছিল। মক্কায় দাওয়াত প্রচারের সাফল্য থেকে নিরাশ হয়ে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তায়েফ গিয়েছিলেন। সেখানকার সর্দাররা তো দাওয়াত কবুল করেইনি বরং একদল ছোকরাকে লেলিয়ে দিয়েছিল, যারা পাথর মেরে রক্তাক্ত করে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

মক্কা ও এর আশপাশে কোথাও কোথাও সামান্য আশার আলোও দেখা গিয়েছিল। এ তিন বছরের প্রথম বছর ৬ জন, দ্বিতীয় বছর ১২ জন ও শেষ

বছর ৭৫ জন লোক ইসলাম কবুল করে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মদীনায় নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। আল্লাহর অনুমতিতে তিনি মদীনায় হিজরত করেন।

ইসলাম একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠায় কুরাইশ নেতারা সারা আরবের জাহেলি শক্তিকে সংগঠিত করে মদীনার ছোট ইসলামি রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বারবার আক্রমণ করছিল, কিন্তু আল্লাহর সাহায্যে এবং রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যোগ্য নেতৃত্বে মুসলিম জাতির ঈমানী শক্তি ও শাহাদাতের আবেগ বিজয়ী হয়েছিল। দ্বিতীয় হিজরীর রমাদান মাসে বদর যুদ্ধ, তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে ওহুদ যুদ্ধ এবং পঞ্চম হিজরীর যিলকদ মাসে হুদাইবিয়ার সন্ধি হয়েছিল। অষ্টম হিজরীর রমাদান মাসের যুদ্ধে কুফর-মুশরিক শক্তির চূড়ান্ত পরাজয় ও ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় হয়েছিল। নবম হিজরীর রজব মাসে তাবুকে রোম সম্রাটের সাথে যুদ্ধের জন্য মুসলিম বাহিনী হাজির হলেও রোমান বাহিনী পিছিয়ে যাওয়ায় সারা আরবে এর এমন প্রভাব পড়েছিল যে, দলে দলে বিভিন্ন গোত্র ইসলাম কবুল করেছিল।

এভাবে দীর্ঘ ২৩ বছরে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বলিষ্ঠ ও বিপ্লবী নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামি আন্দোলন মানবজাতিকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে সত্যিকার আদর্শের নমুনা পেশ করেছিল। এ আদর্শ যুগে যুগে ইসলামি আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে এবং কুরআনই এ আন্দোলনের গাইড বুক হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতিকে পরিচালনা করতে থাকবে। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ সংগ্রামী জীবন চিরকাল পৃথিবীর দেশে দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দিয়ে যাবে। কারণ, তিনিই কিয়ামত পর্যন্ত এ আন্দোলনের চিরস্থায়ী নেতা। সুতরাং তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে সফল হওয়া সম্ভব।

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ

১. নবী মুহাম্মাদের নাম মুখে নিলে অথবা অন্য কাউকে বলতে শুনলে সঙ্গে সঙ্গে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলে দুরূদ পড়তে হবে, কারণ এটা আল্লাহর আদেশ যা কুরআনের সূরা আহযাব (৩৩) এর ৫৬ নম্বর আয়াতে দেখতে পাওয়া যাবে। এই বাক্যটি একটি দু'আ যার অর্থ ঃ 'আল্লাহর রহমত ও শান্তি মুহাম্মাদের উপর বর্ষিত হোক'। এটার ইংরেজী অনুবাদ হচ্ছে ঃ Blessings and peace be upon him

(bpuh). যদিও pbuh (Peace be upon him) কথাটাই অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে কিন্তু সেটা Arabic text-এর সঠিক অনুবাদ নয়। আরবী ভাষায় এটাকে বলা হয় ‘সলা-ত ওয়া সালাম’।

২. যথাস্থানে রসূল মুহাম্মাদের উপর দুরূদ পাঠ করা অত্যাবশ্যক হওয়ার আরো একটি কারণ এই যে রসূলুল্লাহের সহীহ হাদীসে এসেছে যে, তিনি বলেছেন ঃ জিবরাঈল (আ.) বললেন সে ব্যক্তি আল্লাহর রহমাত থেকে বঞ্চিত হোক যার কাছে আপনার নাম উচ্চারণ করা হলো, অথচ সে আপনার উপর সলাত (দরূদ) পাঠ করলোনা, তখন আমি বললাম, আমীন। (হাকীম, ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে খুযাইমা)

‘দুরূদ’ কথাটা আরবী নয়, এটা ফার্সি ভাষার শব্দ।

পূর্ণ মুসলিম কিভাবে হওয়া যায়?

আসুন একটু চিন্তা করে দেখি যে, আমরা সদাসর্বদা যে ‘মুসলিম’ শব্দটি ব্যবহার করে থাকি, এর অর্থ কী? মানুষ কি মায়ের গর্ভ হতেই ইসলাম ধর্ম সাথে করে নিয়ে আসে? মুসলিম ব্যক্তির পুত্র হলেই কি মুসলিম হওয়া যায়? ব্রাহ্মণের পুত্র হলেই যেমন ব্রাহ্মণ, চৌধুরীর পুত্র হলেই যেমন চৌধুরী হওয়া যায়, তেমনিরূপে মুসলিম নামধারী ব্যক্তির পুত্র হলেই কি মুসলিম হতে পারে? ‘মুসলিম’ কি কোন বংশ বা কোনো শ্রেণীর নাম? এসব প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো ‘না’, ‘মুসলিম’ তাকে বলে না। মায়ের গর্ভ হতেই মুসলিম হয়ে কেউ জন্মে না, বরং ইসলাম গ্রহণ করলেই মুসলিম হওয়া যায় এবং ইসলাম ত্যাগ করলেই মানুষ আর মুসলিম থাকে না। যে কোনো লোক - সে ব্রাহ্মণ হোক কিংবা ইংরেজ হোক সে যখন ইসলাম গ্রহণ করবে তখনই সে মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ‘মুসলিম’ সমাজে জন্মগ্রহণ করেও ইসলামের বিধি-বিধান পালন করে চলে না, সে মুসলিম রূপে গণ্য হতে পারে না।

আমরা জানি যে, আল্লাহ তা’আলার সবচেয়ে বড় নিয়ামত -- মুসলিম হওয়ার নিয়ামত -- যা আমি লাভ করেছি, এটা জন্মগত জিনিস নয়, এটা আমি মায়ের গর্ভ হতে জন্ম হওয়ার সাথে সাথেই লাভ করতে পারি না। আজীবন এর প্রতি লক্ষ্য করি আর নাই করি তা আমার সাথে সর্বদা লেগে থাকবে এমন জিনিসও এটা নয়। এটা একটি চেষ্টালভ্য নিয়ামত; তা লাভ করতে হলে আমাকে রীতিমত চেষ্টা করতে হবে। আর এর প্রতি যদি মোটেই খেয়াল না করি, তবে

এর সৌন্দর্য হতে বঞ্চিত হবো। অতএব, প্রমাণিত হলো যে, ইসলাম গ্রহণ করলেই মানুষ মুসলিম হয়। কালিমা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করলে মানুষ ঈমানদার হয় এবং আল-কুরআন ও সুন্নাহর প্রত্যেকটা বিধান মেনে চললে মুসলিম হয়।

ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ কী?

মুখে মুখে যে ব্যক্তি 'আমি মুসলিম' বা 'আমি মুসলিম হয়েছি' বলে চীৎকার করবে, তাকেই কি মুসলিম মনে করতে হবে? অথবা পূজারী ব্রাক্ষণেরা যেমন না বুঝে কতকগুলো সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করে, তেমনিভাবে আরবী ভাষায় কয়েকটি শব্দ না বুঝে মুখে উচ্চারণ করলেই কি মুসলিম হওয়া যাবে? ইসলাম গ্রহণ করার তাৎপর্য কি এটাই? এর জবাবে আমরা এটাই বলবো যে, ইসলাম গ্রহণের অর্থ এটা নয়। ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যবস্থাকে বুঝে আন্তরিকতার সাথে সত্য বলে বিশ্বাস করা, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও আদর্শ হিসেবে এটাকে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা; এটাই ইসলাম গ্রহণ করার তাৎপর্য । কাজেই যিনি এরূপ করবেন না তার তো মুসলিম বলে গণ্য হওয়ার কথা নয়। অতএব আমরা বুঝতে পারলাম প্রথমত ইসলামের এজেন্ডা বা কর্মসূচী জেনে ও বুঝে নেয়া এবং এরপর এই কর্মসূচীকে কাজে পরিণত করার নাম ইসলাম গ্রহণ।

কেউ কিছু না জেনেও ব্রাক্ষণ হতে পারে, কারণ সে ব্রাক্ষণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে, অতএব সে ব্রাক্ষণ থাকবে কেউ কিছু না জেনেও চৌধুরী হতে পারে, যেহেতু সে চৌধুরীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু ইসলামকে না জেনে কেউ মুসলিম হতে পারে না, ইসলামকে জেনে বুঝে বিশ্বাস করে কাজ করলে তবেই মুসলিম হওয়া যায়।

মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য কী?

একজনের নাম রামপ্রসাদ, এজন্য সে হিন্দু এবং আর একজনের নাম আবদুল্লাহ, অতএব সে মুসলিম, তা কি হতে পারে? পরন্তু কাফির ও মুসলিমের মধ্যে শুধু পোশাকের বা নামের পার্থক্যই আসল পার্থক্য নয়। কাজেই একজন ধুতি পরে বলে সে হিন্দু এবং অন্যজন পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে বলে সে মুসলিম বিবেচিত হতে পারে না। বরং মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে আসল পার্থক্য হচ্ছে উভয়ের ইলম বা জ্ঞানের পার্থক্য। এক ব্যক্তি কাফির এই জন্য যে, সে জানে না তার সৃষ্টিকর্তার সাথে তার কী সম্পর্ক এবং তার বিধান অনুসারে জীবন-যাপনের

প্রকৃত পথ কোনটি। কিন্তু একজন মুসলিম সন্তানের অবস্থাও যদি এরূপ হয়, তবে তার ও কাফির ব্যক্তির মধ্যে কোন্ দিক দিয়ে পার্থক্য করা যাবে? এবং এ দুজনের মধ্যে পার্থক্য করে আমি একজনকে কাফির ও অপরজনকে মুসলিম বলবো কেমন করে? কথাগুলো বিশেষ মনোযোগ সহকারে ভেবে দেখা আবশ্যক।

আল্লাহ তা'আলার যে মহান নিয়ামতের (ইসলামের) জন্য আমরা শোকর আদায় করছি, একে লাভ করা এবং রক্ষা করা এ দুটি কাজই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ইলম বা জ্ঞানের উপর। ইলম বা জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা না করলে মানুষ তা পেতে পারে না -- সামান্য পেলেও তাকে বাঁচিয়ে রাখা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সবসময়ই তাকে হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা থাকে। যে ব্যক্তি একেবারেই জানে না যে, ইসলাম ও কুফরের মধ্যে এবং ইসলাম ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য কী, সে তো অন্ধকারাচ্ছন্ন পথের পথিকের মত; সরল রেখার উপর দিয়ে চলতে চলতে আপনা আপনি তার পা দুখানা কখন যে পিছলিয়ে যাবে বা অন্য পথে ঘুরে যাবে, তা সে জানতেই পারবে না। এমনও হতে পারে যে, পথিমধ্যে কোনো ধোঁকাবাজ শয়তান এসে তাকে বলবে -- "মিঞা তুমি তো অন্ধকারে পথ ভুলে গিয়েছ, আমার সাথে চল, আমি তোমাকে তোমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেব।" বেচারা অন্ধকারের যাত্রী নিজের হাত কোনো শয়তানের হাতে সঁপে দিয়ে তার অনুসরণ করতে আরম্ভ করবে এবং সে তাকে পথভ্রষ্ট করে কোথা হতে কোথা নিয়ে যাবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা থাকবে না। তার নিজের হাতে আলো নেই এবং সে নিজে পথের রেখা দেখতে ও চিনে চলতে পারে না বলেই তো সে এতবড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু তাঁর কাছে যদি আলো থাকে, তবে সে পথও ভুলবে না, আর অন্য কেউও তাকে পথভ্রষ্ট করে বিপথে নিয়ে যেতে পারবে না।

এ কারণেই বলা যেতে পারে যে, ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়া এবং কুরআনের উপস্থাপিত বিধান ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রদত্ত শিক্ষা ভাল করে না জানা মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে বড়ই বিপদের কথা। এ অজ্ঞতার কারণে সে নিজেও পথভ্রষ্ট হতে পারে এবং শয়তানও সহজে তাঁকে বিপথগামী করতে পারে। কিন্তু যদি তার কাছে জ্ঞানের আলো থাকে, তবে সে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে এবং প্রতি ধাপে ইসলামের সরল পথ দেখতে পাবে। প্রতি পদেই কুফরি, পথভ্রষ্টতা, পাপ, জ্বিনা প্রভৃতি যেসব বাঁকা পথ ও হারাম কাজ সামনে আসবে, তা সে চিনতে এবং তা হতে বেঁচে থাকতে পারবে। আর যদি কোনো পথভ্রষ্টকারী তার কাছে আসে তবে তার দু-চারটি কথা শুনেই তাকে

চিনতে পারবে। এবং এ লোকটি যে পথভ্রষ্টকারী ও এর অনুসরণ করা যে কিছুতেই উচিত নয়, তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে।

মুসলিম হওয়া ও মুসলিম থাকা

ইলম বা জ্ঞানের উপরই আমাদের ও আমাদের সন্তান-সন্ততির মুসলিম হওয়া ও মুসলিম থাকা একান্তভাবে নির্ভর করে। এটা সাধারণ বস্তু নয়, একে অবহেলা করা যায় না। কৃষক তার ক্ষেত-খামারের কাজে অলসতা করে না, ক্ষেতে পানি দিতে এবং ফসলের পরিচর্যা করতে গাফলতি করে না। কারণ এসব ব্যাপারে অলসতা করলে তার বৈষয়িক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু মুসলিম হওয়া ও মুসলিম থাকা যে জ্ঞানের উপর নির্ভর করছে, তা লাভ করতে মানুষ কেন এত অবহেলা করছে? এতে কি ঈমানের মত অতি প্রিয় ও মূল্যবান নিয়ামত নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় নেই? ঈমান কি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় নয়? মুসলিমগণ প্রাণ রক্ষার ব্যাপারে যতটা সময় ব্যয় ও পরিশ্রম করে, এর দশ ভাগের এক ভাগও কি ঈমান রক্ষার কাজে ব্যয় করতে পারে না?

মুসলিম হওয়ার জন্য স্কলার হওয়া বা মাদ্রাসায় যাওয়া বা বড় কোনো ডিগ্রী লাভ করার কোনো আবশ্যকতা নেই। আমরা রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মাত্র এক ঘন্টা সময় authentic source থেকে দ্বীনি জ্ঞান (ইসলামি বিদ্যা) শিখার কাজে ব্যয় করি। অন্ততপক্ষে প্রত্যেক মুসলিম বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলেরই এতটুকু ইলম বা জ্ঞান অর্জন করা দরকার, যা তারা পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য জানতে পারবে, তা ভালরূপে বুঝতে পারবে। আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেসব অন্যায় কুসংস্কার দূর করতে এবং সেই স্থানে যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা স্থাপন করতে এসেছিলেন, তাও উত্তমরূপে জানতে পারবে।আল্লাহ তা'আলা মানুষের জীবন যাপনের জন্য যে বিশেষ নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার সাথে তারা ভাল করে পরিচিত হতে পারবে। এটুকু জ্ঞান অর্জন করার জন্য খুববেশী সময়ের দরকার পড়ে না। আর ঈমান যদি বাস্তবিকই কারো প্রিয় বস্তু হয়, তবে এ কাজে একটা ঘন্টা ব্যয় করা তার পক্ষে এতটুকুও কঠিন কাজ নয়।

ইসলামে জ্ঞান ও কাজের গুরুত্ব

মুসলিমকে কাফির হতে পৃথক করা যায় মাত্র দুটি জিনিসের ভিত্তিতেঃ প্রথম, ইলম বা জ্ঞান; দ্বিতীয়, আমল বা কাজ। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিমকে প্রথমেই জানতে হবে যে, তার প্রকৃত মালিক কে? কী তাঁর আদেশ ও নিষেধ? তাঁর

মর্জিমত চলার উপায় কী? কিসে তিনি সন্তুষ্ট হন আর কিসে তিনি অসন্তুষ্ট হন -- এসব বিস্তৃতভাবে জেনে নেয়ার পর নিজেকে প্রকৃত মালিকের একান্ত অনুগত বানিয়ে নেবে, তাঁর ইচ্ছামত চলবে, নিজের স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করবে। তার মন যদি 'মালিকের' ইচ্ছার বিপরীত কোনো বস্তুর কামনা করে তবে সে নিজের মনের কথা না শুনে 'মালিকের' কথা শুনবে। কোনো কাজ যদি নিজের কাছে ভালো মনে হয়, কিন্তু মালিক সে কাজটিকে ভালো না বলেন, তবে তাকে মন্দই মনে করবে। আবার কোনো কাজ যদি নিজের মনে খুব মন্দ বলে ধারণা হয়, কিন্তু মালিক সে কাজটিকে ভালো মনে করে এবং কোনো কাজ যদি নিজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে হয় অথচ, 'মালিক' যদি তা করার হুকুম দেন, তবে তার ও সম্পদের যতই ক্ষতি হোক না কেন, তা সে অবশ্যই করবে। আবার কোন কাজকে যদি নিজের জন্য লাভজনক মনে করে, আর 'মালিক' তা করতে নিষেধ করেন তবে তাতে দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পত্তি লাভ করতে পারলেও তা সে কখনই করবে না।

ঠিক এই ইলম ও এরূপ আমলের জন্যই একজন মুসলিম আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা। তার উপর আল্লাহ তা'আলার রহমত বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মান দান করেন। কিন্তু উল্লিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে একজন কাফির কিছুই জানে না এবং এ জ্ঞান না থাকার দরুনই তার কার্যকলাপও তদনুরূপ হয় না এ জন্য যে, সে আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ এবং তাঁর অবাধ্য বান্দা। ফলে সে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হয়।

ইসলাম কোনো জাতি, বংশ বা সম্প্রদায়ের নাম নয়

ইসলাম কোনো জাতি, বংশ বা সম্প্রদায়ের নাম নয়। ব্রাক্ষ্মণের পুত্র মূর্খ এবং চরিত্রহীন হলেও কেবলমাত্র ব্রাক্ষ্মণের পুত্র বলেই সে ব্রাক্ষ্মণের মর্যাদা পেয়ে থাকে এবং উচ্চ বংশ বলে পরিগণিত হয়। আর চামারের পুত্র জ্ঞানী ও গুণী হয়েও নীচ ও হীন থেকে যায়। কারণ সে চামারের মত নীচ জাতির ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু ইসলামে এসব বংশ বা গোত্রীয় মর্যাদার বিন্দুমাত্র স্থান নেই।

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) একজন মূর্তি-পূজারীর ঘরে জন্ম লাভ করেছিলেন; কিন্তু তিনি আল্লাহ তা'আলাকে চিনতে পেরে তাঁর আদেশ পালন করলেন; এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সমস্ত জগতের নেতা বা ইমাম করে দিয়েছিলেন। নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর পুত্র একজন নবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিল; কিন্তু সে আল্লাহ তা'আলাকে চিনতে পারল না বলে তাঁর অবাধ্য হয়ে

গেল। এজন্য তার বংশমর্যাদার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হলো না। অতএব বুঝা গেল, আল্লাহ তা'আলার কাছে মানুষে-মানুষে যা কিছু পার্থক্য হয়ে থাকে, তা কেবল ঈমান, ইলম ও আমলের কারণে। দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর অনুগ্রহ কেবল তারাই পেতে পারে, যারা তাঁকে তাঁর প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী চিনে এবং তাঁর অনুসরণ করে। কিন্তু যাদের মধ্যে এ গুণ নেই, তাদের নাম আবদুল্লাহই হোক, দীননাথই হোক, আর ডেভিডই হোক, আল্লাহ তা'আলার কাছে এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য বা গুরুত্ব নেই -- এরা কেউই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ পাবার অধিকার পেতে পারে না।

কেউ কাউকে যেন ভুল না বুঝি

একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, এই আলোচনায় মুসলিমকে কাফির বলা হচ্ছে, কারণ তা কখনও উচিত নয়। আসুন আমরা এ সম্বন্ধে চিন্তা করি। আমরা আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হচ্ছি কেন, চারিদিক হতে আমাদের উপর কেন এত বিপদরাশি এসে পড়ছে? যাদেরকে আমরা 'কাফির' বলে জানি তারা আমাদের উপর সকল ক্ষেত্রে বিজয়ী কেন? আর আমরা যারা আল্লাহর আদেশ পালনকারী বলে দাবী করি, তারাই বা সব জায়গায় পরাজিত কেন? এর কারণ সম্বন্ধে আমরা যতই চিন্তা করি, ততই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আমাদের ও কাফিরদের প্রতি বর্তমানে শুধু নামেই পার্থক্য রয়ে গিয়েছে। কার্যত আমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি অবহেলা, ভয়হীনতা এবং অবাধ্যতা দেখাতে কাফিরদের চাইতে মোটেই পিছিয়ে নেই। তাদের ও আমাদের মধ্যে সামান্য কিছু প্রভেদ অবশ্যই আছে কিন্তু তা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

যেমন আমরা জানি যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলার কিতাব, অথচ আমরা এর সাথে অমুসলিমদের ন্যায়ই ব্যবহার করছি। আমরা জানি, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের পথপ্রদর্শক, অথচ আমরা কাফিরদের মতই তাঁর অনুসরণ করা বন্ধ করেছি। আমরা জানি যে, মিথ্যাবাদীর প্রতি আল্লাহ তা'আলা লানত করেছেন এবং ঘুষখোরদের ও ঘুষদাতা উভয়ই নিশ্চিতরূপে কবীরাহ গুনাহ করছে বলে ঘোষণা করেছেন, সুদখোর ও সুদদাতাকে জঘন্য পাপী বলে অভিহিত করেছেন। চোগলখোরী ও গীবতকারীকে আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন, অশ্লীলতা ও লজ্জাহীনতার জন্য কঠিন শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু এ সমস্ত কথা জানার পরও আমরা অমুসলিমদের মতোই বেপরোয়াভাবে এসব কাজ করে যাচ্ছি। মনে হয়, যেন আমাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই। এজন্য কাফিরদের তুলনায় আমরা কিছুটা

‘মুসলিম’ হয়ে থাকলেও আমাদের জীবনে তার কোনো প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি না; বরং কেবল শাস্তিই পাচ্ছি নানাভাবে এবং নানাদিক দিয়ে। আমাদের উপর কাফিরদের জয়লাভ এবং সর্বত্র আমাদের পরাজয় এ অপরাধেরই শাস্তি। ইসলাম নামক এক মহান নিয়ামত আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, অথচ আমরা তার বিন্দুমাত্র কদর করছি না।

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য

কুরআন বুঝা সকলের জন্যই সহজ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

আমি উপদেশ নেয়ার জন্য কুরআনকে সহজ উপায় বানিয়ে দিয়েছি। এখন উপদেশ নেয়ার মতো কি কেউ আছে? (সূরা কামার ৫৪ ঃ ১৭)

[কুরআনের বাণীর গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে সূরা কামারে আল্লাহ এই আয়াতটি একে একে ছ’বার পুনরাবৃত্তি (repeat) করেছেন।]

আল্লাহ নিজে বলেছেন কুরআন বুঝা সহজ। কিন্তু আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মুসলিম মসজিদের মধ্যে বসে আলোচনা করেন এবং বলেন কুরআন আমাদের বুঝার কাজ না। আমরা সাধারণ পাবলিক। আমরা কুরআনের বুঝবো কি? কুরআন বুঝবে আলিমরা, কুরআন বুঝবে বড় বড় মুহাদ্দিস বা মুফাসসিররা, আমরা এসব বুঝবোও না।

কিন্তু এখানে ভেবে দেখার বিষয়টা এই যে – আমরা যদি কুরআন না পড়ি তাহলে আমরা বুঝবো কি করে যে তাদের কথাটা সঠিক না ভুল? যারা এ ধরনের কথা বলেন যে কুরআন আমাদের বুঝার কাজ না, শুধু আলিমরা বুঝবে, তারা শয়তানের বড় ধরনের প্ররোচনায় পড়ে বিরাট ভুলের মধ্যে আছেন। আল্লাহ কি কুরআন এজন্য নাযিল করেছেন যে, কুরআন শুধু আরবী শিক্ষিত মাওলানারা বুঝবেন, আর যারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ইউনিভার্সিটি গ্যাজুয়েট তারা এটা বুঝবেন না? আল্লাহ কি কুরআনকে এমন একটা দুর্বোধ্য কিতাব হিসাবে নাযিল করেছেন যে কেউ এটা বুঝতেই পারবে না? অথচ কুরআনে আল্লাহ বলছেন ঃ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا

সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর বান্দার উপর এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং এর মধ্যে কোনো বক্রতা রাখেননি। (সূরা কাহফ ১৮ ঃ ১)

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে অঙ্ক অবশ্যই একটা কঠিন সাবজেক্ট? তবে যে ছেলে অঙ্ক বুঝে তার কাছে এটা পানির মত, আর যে বুঝে না তার জন্য পাহাড়ের মত। কিন্তু যে ছেলে অঙ্ক বুঝে সে তো চেষ্টা করেই বুঝেছে। জন্মগ্রহণ করেই কোন চেষ্টা ছাড়াই তো অঙ্ক করা শিখেনি। তাই কুরআন বুঝার জন্য একদিনও চেষ্টা করলাম না শুধু নিরাশাবাদীরা কি বলে তাই শুনে দিন কাটালাম, তা হলে হবে কী করে?

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন আমাকে ভয় করে আমার পথে যে চলতে চায় তার জন্য আমার রাস্তা খুলে দেই, চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবে। আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন দুর্বোধ্য কিতাব হিসেবে নয় বরং একটি সহজ সরল কিতাব যার মাঝে নেই কোন বক্রতা এবং যা বুঝার সব মানুষের জন্যই সহজ, আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আপনি বলুন আমার রবের কালিমার ব্যাখ্যা লিখার জন্য সারা পৃথিবীর সমুদ্র আর মহাসমুদ্রের পানিগুলি যদি কালি বানানো হয় আর তাই দিয়ে যদি আমার রবের কালিমার ব্যাখ্যা লেখা শুরু হয়ে যায়, লেখতে লেখতে সারা পৃথিবীর পানিগুলি শেষ হয়ে যাবে আমার আল্লাহ তা'আলার কালিমার ব্যাখ্যা লেখা শেষ হবে না। এ হচ্ছে সেই কুরআন। অনেকে মনে করেন কুরআনের চাইতে বিজ্ঞান উন্নত। এই ধারণা ভুল। কুরআন হচ্ছে বিজ্ঞানের উৎস। আমেরিকার নাসাতে (NASA) চারজন বিজ্ঞানীকে রাখা হয়েছে যাদের ফুলটাইম অফিসিয়াল কাজ হচ্ছে শুধু কুরআন পড়া, কুরআন নিয়ে গবেষণা করা।

বিজ্ঞানীরা আজ যা আবিষ্কার করছেন তা কুরআনের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ১৪শত বছর আগে বলে রেখেছেন। যেমন কিছু দিন আগে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন ব্ল্যাক-হোল (Black Hole)-এর কথা, কিন্তু আল্লাহ এই কথা বলে রেখেছেন অনেক আগেই। কুরআনের মধ্যে বিজ্ঞান আছে, দর্শন আছে, রাজনীতি আছে, এর মধ্যে অঙ্ক আছে, ভুগোল আছে, ইতিহাস আছে। এর মধ্যে স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, শিক্ষানীতি, যুদ্ধনীতি, বন্দিনীতি, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জ্যোতি

বিজ্ঞান, কী নেই? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন সব কিছু খুলে খুলে আমি কুরআনের মধ্যে বর্ণনা করে দিয়েছি।

তবে কুরআনের মধ্যে বিজ্ঞান আছে বলে এটা বিজ্ঞানের কোন বই নয়। কুরআনের মধ্যে ইতিহাস আছে বলে এটা ইতিহাসের বই নয়। কুরআনের মধ্যে ভূগোল আছে বলে এটা ভূগোলের বই নয়। এর মধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি আছে বলে এটা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির বই নয়। এর মধ্যে ফৌজদারী, দন্ডবিধি, জুডিসিয়াল ল' আছে বলে এটা কোন পিনাল কোডের (Penal code) বই নয়। তবে এটা কী?

পৃথিবী পরিচালনা করার জন্য, গোটা মানবগোষ্ঠী পরিচালনা করার জন্য যত নীতির প্রয়োজন সমস্ত নীতির মূলনীতি এই কিতাবের মধ্যে রয়েছে। আমরা কুরআন যদি বুঝি তাহলে সব বুঝা হবে। আমরা নানারকম পড়াশোনা করে নানা প্রফেশনাল হই, অবসর সময় পেলে গল্প-উপন্যাস-কবিতা পড়ি কিন্তু শুধুমাত্র কুরআন পড়ি না আর বুঝার চেষ্টাও করি না, অথচ বলি, আমি সব জানি।

আইনস্টাইন সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'জীবনের শেষে জ্ঞান সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সামান্য বালুকণা নিয়ে নাড়াচাড়া করে গেলাম কিন্তু অকুল জ্ঞানসমুদ্রের কিছুই দেখতে পারলাম না। এটা হলো জ্ঞানীদের কথা। আর আমাদের যাদের জ্ঞান কম তারা বলি সব জানি, সব বুঝি। আসলে আমরা কিছুই জানি না, বুঝিনা। সত্যিকার জ্ঞানীরা কখনো দাবী করেন না সব বুঝেন। জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ কুরআনে শিখিয়ে দিয়েছেন, বল, "রব্বী যিদনী ইলমা" "হে আল্লাহ! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও"। যে জ্ঞান দিয়ে আল্লাহকে অস্বীকার করা হয় তা আবু জাহিলের জ্ঞান আর যে জ্ঞান দিয়ে আল্লাহকে চেনা যায় তা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জ্ঞান।

কুরআন তো এসেছিল মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন "(হে নবী!) আমি আপনার উপর এ কুরআন এ জন্য নাযিল করিনি যাতে আপনি কষ্টে পড়ে যান" (সূরা ত্ব-হা ২০ ঃ ২)। যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর মুসলিমগণ কুরআনকে সম্মান করেছে, ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর মুসলিমরা সম্মানিত ছিল। আর যখন কুরআন ত্যাগ করেছে, তখন তাদের উপর নেমে এসেছে অশান্তি এবং চরম শাস্তি।

কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক আজ তাবিজের সম্পর্ক। কুরআনের কাছে কখন যাই? যখন কিছু চুরি হয়ে যায় ঘরে। তখন মৌলভী সাহেবের কাছে যাই। হুজুর আমার তো ঘরে থেকে সোনা চুরি হয়ে গেছে। চোর ধরার জন্যে চাল পড়া দেন অথবা একটা তাবিজ লিখে দেন। এতে মনে হচ্ছে কুরআন এসেছে চাল পড়া বা তাবিজ লিখার জন্য, চোর ধরার জন্য। কুরআন শরীফের কোন আয়াত পড়ে চালে ফুঁ দিয়ে সে চাল পড়া দিয়ে যদি চোর ধরা যেত, তাহলে পৃথিবীতে মুসলিম দেশগুলোতে পুলিশের চাকুরী থাকত না। ঐখানে সব চাকুরী হতো মৌলভী সাহেবদের। তাদের বস্তায় বস্তায় চাল দেয়া হতো আর বলা হতো, হুজুররা আপনারা শুধু চাল পড়বেন আর চোর ধরবেন। এটাই আপনাদের কাজ।

কুরআন শরীফ চোর, ডাকাত, হত্যাকারীকে ধরার জন্য আসেনি। তাহলে কুরআন কেন এসেছে? কুরআন এসেছে চোর ধরার জন্য নয়, বরং চুরিকে চিরকালের জন্য বন্ধ করতে এসেছে। কুরআন ডাকাত ধরতে আসেনি, বরং ডাকাতিকে বন্ধ করার জন্যে এসেছে। হত্যাকারীকে ধরতে আসেনি, অবৈধ রক্তপাতকে চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেবার জন্য কুরআন এসেছে। কুরআন স্বৈরাচারীকে ধরতে আসেনি, স্বৈরাচারের কণ্ঠকে চিরকালের জন্য নীরব করে দিতে এসেছে। আমরা এসব কথা ভাবিওনা, বুঝিওনা।

আমরা কুরআনকে চুমা দেবো, মাথায় লাগাবো, কিন্তু কুরআন বুঝিও না, পড়তেও পারি না, সে অনুযায়ী আমলও করি না। চুমা দিয়ে কাজ হবে? ডাক্তার আমাকে প্রেসক্রিপশন দিল, আমি প্রেসক্রিপশন নিয়ে মাথায় লাগালাম, বুকে লাগালাম, অথবা গ্লাসের মধ্যে পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেলাম, অথবা পুটলি বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখলাম, তাহলে কি রোগ ভাল হবে? যদি কোন রোগী এমন ব্যবহার করে আমরা তাকে কী বলবো? পাগল নয় কি? আর কুরআনের সাথে আমরা কী করছি? আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দেয়া এই মহা প্রেসক্রিপশন। আল্লাহ মহান চিকিৎসক। গোটা পৃথিবীব্যাপী মানসিক রোগ, শারীরিক রোগ, সামাজিক রোগ, রাজনৈতিক রোগ থেকে মুক্ত হয়ে সর্বত্র শান্তি আর আখিরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের একটি পথ নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা করেছেন এই কুরআনের মধ্য দিয়ে।

মৌলভী সাহেবের কাছে যাওয়া হলো, কোন আলেম সাহেব, ইমাম সাহেবের কাছে যাওয়া হলো, উনি লাল কালি দিয়ে কতগুলি আয়াত লিখে দিলেন, আর আমি তা পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে ৪১ দিন খেলাম! আস্তাগফিরুল্লাহ! কী

অন্যায়! অথবা তাবিজ বানিয়ে রূপার মাদুলীর মধ্যে ঢুকিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখলাম! মহা অন্যায়! আল্লাহর কুরআনের সাথে এ ব্যবহার করার জন্য এই কুরআন নাযিল করেননি। আমরা অন্যায় করছি।

হ্যাঁ, কুরআন থেকে ইচ্ছে করলে কেউ ঝাড়ফুঁক দিতে পারেন। এটা জায়েয আছে কিন্তু ভুল বুঝা যাবে না, কুরআন ঝাড়ফুঁকের জন্য নাযিল করা হয় নাই। ঝাড়ফুঁকের জন্য সূরা ফাতিহা এবং সূরা ফালাক আর সূরা নাস ব্যবহার করা যেতে পারে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঝাড়ফুঁক করেছেন। সাহাবারা করেছেন। কিন্তু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাবিজ লিখেন নাই। তাবিজের অনুমতি দেন নাই। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর লক্ষাধিক সাহাবীর একজন সাহাবীও জীবনে তাবিজ লিখেন নাই। অথচ আমরা কুরআনকে তাবিজ বানিয়েছি। এই তাবিজের ফাঁদ থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে। এই ধরণের শিরক থেকে মুক্ত হতে হবে। কুরআন পড়তে শিখতে হবে এবং বুঝতে হবে। কুরআন বুঝা নিজের জন্য ফরয বানিয়ে নিতে হবে। কুরআন শিক্ষা করা আমাদের জন্য ফরয। এই ফরয কুরআন শিক্ষা বাদ দেয়ার কারণেই আজ পৃথিবীর মুসলিমদের এই অবনতি, এই দুর্দশা।

কুরআন শুধু মাথা ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে তিলাওয়াত করার জন্য আসেনি। আবার তিলাওয়াতের অর্থও আমরা ঠিক মতো জানি না। তিলাওয়াত আরবী শব্দ, এর আভিধানিক অর্থ আবৃত্তি বা recitation নয়। আরবী ডিকশনারী অনুযায়ী তিলাওয়াত অর্থ to follow বা অনুসরণ করা। অর্থাৎ তিনটি বিষয়ের combination হচ্ছে তিলাওয়াত। ১) যা পড়া হবে তা শুদ্ধ করে পড়া ২) যা পড়া হবে তা বুঝা এবং ৩) যা বুঝা হবে তা জীবনে বাস্তবায়ন করা। আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহু)-র ছেলে আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেছিলেন, সূরা বাকারা পড়তে তার আড়াই বছর সময় লেগেছে। অথচ তার ভাষা ছিল আরবী। শুধু সূরা বাকারা পড়তে তার এতো সময় লাগলো কেন তার ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন যে, তিনি এটা পড়েছেন, বুঝেছেন এবং নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন।

অথচ আমরা এই কিতাব না বুঝে শুধু খতমের পর খতম দেই। বিশেষ করে রমাদান মাসে তো খতমের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়, কে কত খতম দিল! আবার দেখা যায় সবার ঘরেই কুরআন আছে কিন্তু অনেকেই তা মখমলের কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে শেলফের উপরের তাকে খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছেন যেন

তা সহজে কেউ স্পর্শ করতে না পারে। দিনের পর দিন এভাবে পরে থেকে তার উপর ধুলা জমে। আর এই কিতাব কখন নামানো হয়? কখন কাপড়ের গিলাপ থেকে বের করা হয়? যখন কেউ মারা যায়। তখন মৃতের কোন কোন আত্মীয়-স্বজন বসে যান তিলাওয়াত করার জন্য, লাশকে সূরা ইয়াসীন পড়ে শুনানো হয়। এছাড়া মসজিদ-মাদ্রাসা থেকে হুজুর ভাড়া করে আনা হয় কুরআন খতম করার জন্য। কী আশ্চর্যের বিষয় কুরআন তিলাওয়াত করে শুনানো হচ্ছে মৃত লাশকে (মৃত দেহকে)! অথচ আল-কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও মৃত মানুষের জন্য একটি আয়াতও নেই ।

কুরআন মানব জাতির সঠিক হিদায়াতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে। তাই এর নাম হলো কিতাবুল্লাহ বা আল্লাহর কিতাব। এ কিতাব শেষ নবী ও শ্রেষ্ঠতম রসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে অহীযোগে নাযিল করা হয়েছে। এ কিতাব শুদ্ধভাবে পড়ে শুনানো এবং এর সঠিক অর্থ বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপরই দেয়া হয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা এ কিতাবের রচয়িতা এবং রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাখ্যাদাতা। মানব জাতির পার্থিব শান্তি ও পরকালীন মুক্তি এ কিতাবের শিক্ষার উপরই নির্ভরশীল। তাই এ কিতাব সব মানুষের পক্ষেই বুঝতে পারা সম্ভব। অবশ্য সবাই এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করার যোগ্য না-ও হতে পারে। আল্লাহ পাক কুরআন সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"এটা মানুষের জন্য এক স্পষ্ট বর্ণনা (বায়ান) এবং মুত্তাকিদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৮)

কুরআন থেকে হিদায়াত পাওয়ার জন্য কুরআনকে বুঝতে পারাই হলো প্রথম শর্ত। বোঝার সাথে সাথে তাকওয়ার শর্তও থাকতে হবে। কুরআন যা মানতে বলে তা মানতে রাজী হওয়া এবং যা ছাড়তে বলে তা ছাড়তে প্রস্তুত থাকাই হলো তাকওয়া। কিন্তু যে কুরআন বুঝে না সে কী করে তাকওয়ার পথে চলবে? তাই সবাইকেই প্রথমে কুরআন বুঝতে হবে।

কিন্তু যারা সীমিত সময়ের পার্থিব জীবন থেকে ৩০-৪০ বছর শুধু রুজি রোজগারের জন্যই বিভিন্ন শিক্ষায় খরচ করে, তারা যদি কুরআনকে ভালভাবে বুঝবার চেষ্টা না করে তাহলে আখিরাতে আল্লাহর কাছে কী কৈফিয়ৎ দেবে?

দুনিয়াতে এত বিদ্যা শিখেও কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা সত্যিই চরম লজ্জার বিষয়।

যারা কিছু লেখাপড়া জানে তাদের পক্ষে কুরআন বুঝা সম্ভব এবং একটু মনোযোগ দিলে এটা সহজও বটে। আরবী ভাষা যারা মোটামুটি বুঝে তারা কুরআন বুঝতে যে বেশী তৃপ্তি বোধ করে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কুরআন বুঝবার জন্য আরবী জানা শর্ত নয়। আরবী না জানলেও কুরআনের বক্তব্য বুঝা সম্ভব। ইংরেজী, বাংলা, উর্দু, হিন্দি- সব ভাষাতেই কুরআনের অনুবাদ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) বাজারে পাওয়া যায়।

মুনাফিকী স্বভাব সৎ আমল নষ্ট করে দেয়

রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সহীহ হাদীসে আছে যে, মুনাফিকের চরিত্রে ৪ ধরনের আচরণ লক্ষ্যনীয় ঃ

১. সে যখন কথা বলে তখন মিথ্যা কথা বলে।
২. সে যখন প্রতিশ্রুতি দেয় তখন তা ভঙ্গ করে।
৩. তার নিকট যখন কোন জিনিস আমানত রাখা হয় তখন সে তার খিয়ানত করে। (অর্থাৎ তার কাছে গচ্ছিত মাল ও অর্থ সে আত্মসাৎ করে, ফেরত দেয় না।)
৪. যখন একে অপরে ঝগড়া লাগে তখন সে কুৎসিৎ ভাষায় গালাগালি করে।

যারা মুসলিম নাম ধারণ করে মুনাফিকের মত আচরণ করে তারা কাফিরের চাইতেও খারাপ। তারা যেকোন সময় মানুষকে যেকোন ধরনের ফাঁদে ফেলতে পারে। তারা কথা বলার সময় ভাল কথা বলে আর আচরণ করার সময় খারাপ আচরণ করে। এ জন্যই কুরআনে বলা হয়েছে ঃ *“মুনাফিকের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে।” (সূরা আন নিসা ঃ ১৪৫)।*

মুনাফিকদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল মিথ্যা কথা বলা। তারা যেকোন সময় যেকোন ধরনের সত্য গোপন করতে দ্বিধা করে না। বিপদে পড়লে তারা মিথ্যা বলতে পারে। আর আমাদের সমাজে এ ধরনের লোকের কোন অভাব নেই। অসংখ্য লোক রয়েছে যারা স্বার্থের কারণে সকাল-বিকাল মিথ্যা কথা বলছে। মানুষ যখন একবার মিথ্যা কথা বলে তখন সে সহজে মিথ্যা ছাড়তে পারে না। সে মিথ্যা কথা ছাড়তে চায় কিন্তু মিথ্যা তাকে ছাড়তে চায় না। আর আমাদের সমাজের

অধিকাংশ লোকই হল লোভী। আর লোভের কারণেই মানুষ বেশি মিথ্যা কথা বলে থাকে। এ জন্য বলা হয়, 'মিথ্যা সকল পাপের মূল'। মিথ্যা হতে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ বলেনঃ

"তোমরা প্রতিমা পূজার অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক।" (সূরা হাজ্জ ঃ ৩০)

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ ঐ ব্যক্তির জন্য কঠোর শাস্তি যে শুধু মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে। (আবু দাউদ)

প্রত্যেক মানুষকে অবশ্যই ঈমান নিয়ে চলতে হলে মিথ্যা ত্যাগ করতে হবে। কারণ মিথ্যা যদি সে ত্যাগ করতে পারে তাহলে তার মধ্যে হিংসা, লোভ, অহংকার, চুগোলখোরী, রিয়া ইত্যাদি থাকবে না।

মুনাফিকের ২য় বৈশিষ্ট্য হল, সে যখন প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তখন তা ভঙ্গ করে। মুনাফিকরা ওয়াদা পালনে সচেতন নয়। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে ওয়াদার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা চুক্তিসমূহ পূরণ কর।"
(সূরা আল মায়িদা ঃ ১)

"তোমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলবে, কারণ প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (সূরা বনী ইসরাইল-৩৪)।

"হে মুমিনগণ, তোমরা যা পালন কর না এমন কথা বল কেন?"
(সূরা সাফ-২)।

ওয়াদা ভঙ্গ করা জঘন্যতম অপরাধ। এ বিষয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা) বলেন, 'যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তার দ্বীন নেই', আর মুনাফিকের এটা হল একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য।

মুনাফিকের ৩নং বৈশিষ্ট্য হল সে আমানত খিয়ানতকারী, অর্থাৎ তার কাছে কোন কিছু জমা রাখলে সে সেই গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করে থাকে। আর যে খিয়ানত করে থাকে তাকে বলা হয় আত্মসাৎকারী। যে ব্যক্তি খিয়ানত করে তাকে কেউ ভালবাসে না। সবাই তাকে ঘৃণা করে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলাও তাকে ঘৃণা করে থাকেন।

তার চতুর্থ নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো সে কারো সংগে ঝগড়া করার সময় কুৎসিত ভাষায় গালি দেয়। এটা অতি জঘণ্য চরিত্রের লক্ষণ।

সলাতে (নামাযে) সুফল পাওয়া যায় না কেন?

বর্তমান যুগে সলাত আদায় করার পরেও মুসলিম এত লাঞ্ছিত ও দুর্বল কেন, তাদের চরিত্র উন্নত হচ্ছে না কেন, একটি অপরাজেয় শক্তিধর আল্লাহর সেনাবাহিনীতে পরিণত হচ্ছে না কেন, দুনিয়ার মধ্যে কাফিরদের বিপক্ষে তারা এত শক্তিহীন ও অবহেলিত কেন? এটা সত্যিই একটি কঠিন প্রশ্ন।

এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর এ হতে পারে যে, মুসলিমগণ আসলে সলাতই আদায় করে না, আর করলেও ঠিক সেভাবে এবং সেই নিয়মে আদায় করে না, যেভাবে আর যে নিয়মে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদায় করতে আদেশ করেছেন। যদিও সলাত ঈমানদার ব্যক্তিকে উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছাতে পারে, আজকের মুসলিমগণ সলাত হতে সেরূপ সুফল লাভের আশা করতে পারে না। বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক।

এই যে (মসজিদে) দেয়াল ঘড়ি ঝুলছে, আমরা জানি যে, এতে অনেক যন্ত্রাংশ রয়েছে, একটি অন্যটির সাথে জড়িত রয়েছে। এতে যখন চাবি দেয়া হয় বা ব্যাটারী লাগানো হয়, তখন প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশ নিজ নিজ কাজ শুরু করে এবং সেই সাথে বাইরের কাঁটায় ভিতরের যন্ত্রাংশগুলোর কাজের ফল প্রকাশ হতে থাকে। অর্থাৎ দু'টি কাঁটা ঘুরে ঘুরে সেকেন্ডের পর সেকেন্ড মিনিটের পর মিনিট বানিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বানাতে থাকে। এখন চিন্তা করে দেখি, ঘড়ি বানাবার উদ্দেশ্য কী? ঠিকভাবে সময় জানানই যে তার একমাত্র উদ্দেশ্য, সেকথা আমরা সকলেই জানি। এজন্যই সঠিক সময় নির্দেশ করতে পারে এমন সব ছোট ছোট যন্ত্রাংশ এর মধ্যে একত্র করা হয়েছে। তারপর সেগুলোকে পরস্পর জুড়ে দেয়া হয়েছে। যেন সবগুলো মিলে যথারীতি চলতে থাকে এবং প্রত্যেকটি অংশ যেন সঠিক সময় জানাবার জন্য যতটুকু কাজ করা দরকার ঠিক ততটুকু কাজ করে- বেশীও নয়, কমও নয়।

আবার তাতে চাবি দিবার নিয়ম করা হয়েছে অথবা ব্যাটারী শেষ হয়ে গেলে নতুন ব্যাটারী লাগাতে হয়। তাই নির্দিষ্ট সময়ের পরে চাবি দিয়ে অথবা নতুন ব্যাটারী লাদিয়ে তাকে গতিশীল রাখতে হয়। ফলে সবগুলো যন্ত্রাংশ চলতে শুরু করে। এবং যে উদ্দেশ্যে তা তৈরী হয়েছে তা অর্থাৎ সঠিক সময় এ ঘড়ি

দ্বারা লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু যদি ঠিকমত চাবি দেয়া না হয় বা সময় মতো ব্যাটারী পরিবর্তন না করা হয়, তবে তা ঠিকভাবে সময় নির্দেশ করতে পারবে না। যদি চাবি দেয়াও হয় বা ব্যাটারী পরিবর্তন করাও হয়, কিন্তু নিয়মানুসারে না করা হয়, তা হলে ঘড়ি বন্ধ হয়ে যাবে কিংবা চললেও ঠিকমত সময় নির্দেশ করতে পারবে না।

আর যদি ঘড়ির কোনো অংশ বের করে সেখানে সিঙ্গার সেলাই মেশিনের অংশ লাগিয়ে দেয়া হয় এবং চাবি দেয়া হয়, তথাপি তা সময় নির্দেশ করতে পারবে না; ওদিকে কাপড় সেলাই করার কাজও তার দ্বারা সম্ভব হবে না। এর সবগুলো যন্ত্রাংশ যদি একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করে এর মধ্যে রাখা হয়, তবে পাওয়ার দিলেও তা চলবে না। প্রকাশ্যভাবে দেখতে গেলে তো বলতে হবে যে, ঘড়ির সব যন্ত্রাংশই এর মধ্যে আছে, কিন্তু যন্ত্রাংশ কেবল এর মধ্য থাকলেই তো আর এর উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে না। কারণ, এদের পরস্পরের সাথে কোন যোগ নেই এবং শ্রেণীবিন্যাস করে সেগুলোকে ঠিকমত সাজানও হয়নি। তাই সেগুলো পরস্পর চলতে পারছে না। এখানে যেসব অবস্থার কথা বলা হলো তাতে যদিও ঘড়িটি কোনো কাজ করবে না এবং তাতে চাবি বা পাওয়ার দেয়া নিষ্ফল হবে তবুও বাইরের লোক তা দেখে কিছুই বুঝতে পারবে না যে, এটা দেখতে ঠিক ঘড়ির মতোই এবং সে জন্য ঘড়ি দ্বারা যে উদ্দেশ্য লাভ হয়, তাই পাওয়ার আশা করবে। ভিতরে যন্ত্রপাতি ঠিক না থাকলে বাইরে থেকে যত সুন্দর ঘড়িই মনে হোক এটা দিয়ে কি কোন কাজ হবে? এর দ্বারা আসল ঘড়ির কাজ পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

ঘড়ির যে উদাহরণ এখানে আলোচনা করা হলো, তা দ্বারা আমরা সমস্ত বিষয়টা পরিস্কারভাবে বুঝতে পারলাম। ইসলামকে এ ঘড়ির মত মনে করি, ঘড়ির উদ্দেশ্য যেমন সঠিক সময় নির্দেশ করা, তেমনি ইসলামেরও উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ এ দুনিয়াতে আল্লাহর খলীফা- আল্লাহর সৈনিকরূপে বসবাস করবে। নিজেরা আল্লাহর হুকুম অনুসারে চলবে, অন্যকেও আল্লাহর বিধান অনুসারে পরিচালিত করবে। কুরআনে একথাটি পরিস্কার বলা আছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط - عمران

“তোমরা সেই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে সমগ্র মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের কাজ এই যে, তোমরা সকল মানুষকে ন্যায় কাজের

আদেশ করবে, সকল অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে ফিরাবে এবং আল্লাহর প্রতি মযবুতভাবে ঈমান রাখবে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ وَّسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

"আর এরূপে আমরা তোমাদেরকে (সর্বশ্রেষ্ঠ) জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা সকল মানুষ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পার।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ النُّوْر

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে তাদের কাছে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি তাদের যমীনের (পৃথিবীর) বুকে তাঁর খলীফা বানাবেন।" (সূরা আন নূর ঃ ৫৫)

এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ঘড়ির যন্ত্রাংশের ন্যায় ইসলামেও অনেক কলকব্জা জমা করা হয়েছে। ইসলামের আসল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সেগুলো যেমন দরকারী, তেমনি পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলামের মৌলিক মতবাদ, আকায়েদ, নৈতিক চরিত্রের নিয়ম-নীতি, কাজ-কারবার, আদান-প্রদানের নিয়ম-কানুন, আল্লাহর হক, মানুষের হক, নিজের হক, আয়-রোযগার এবং খরচ করার রীতিনীতি, যুদ্ধ-নীতি, সন্ধি-সমঝোতার নিয়ম প্রণালী, রাষ্ট্র পরিচালনার বিধান-পদ্ধতি এবং ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করে বসবাস করার নিয়ম-এসবগুলোই ইসলামের অঙ্গ-ইসলামের ছোট ছোট যন্ত্রাংশ এবং এগুলোকে ঘড়ির যন্ত্রাংশের ন্যায় একটির সাথে অন্যটিকে এমনভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে যে, চাবি দিলেই বা ব্যাটারী লাগালেই তার সবগুলো ঠিকভাবে চলতে শুরু করে-আর এগুলো মিলিতভাবে চলার ফলে এর আসল উদ্দেশ্য ইসলামের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব এবং দুনিয়ায় আল্লাহর বিধানের প্রতিষ্ঠা এমন সুন্দর ও ধারাবাহিকভাবে অজান্তে হতে থাকে, যেমন ঘড়ির যন্ত্রগুলো ঠিকমতো চলার ফলে বাইরের সময় নির্দেশকারী কাঁটা সঠিক সময় জ্ঞাপন করে।

ঘড়ির বিভিন্ন অংশগুলোকে পরস্পর জুড়ে দেবার জন্য কয়েকটি লোহার পাত ও ছোট ছোট লোহার কাঁটা ব্যবহার করা হয়েছে। ঠিক তেমনি ইসলামের বিভিন্ন কাজকে পরস্পরকে সাথে যুক্ত রাখার জন্য এবং সেগুলোর সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রেণী বিন্যাস করার জন্য জামায়াত বা দল গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুসলিমদের এ জামায়াতের এমন একজন নেতা হবে যার মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান

ও বোধশক্তি এবং তাকওয়া-পরহেযগারীর বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকবে; দলের কর্মীগণ তার কথা মেনে চলবে, তার কথা অনুসারে কাজ করবে। নেতা তাদের মিলিত শক্তির সাহায্যে লোকদের ওপর ইসলামি আইন জারী করবে এবং তাদের ইসলামি আইনের বিরোধিতা হতে বিরত রাখবে। এভাবে ইসলামের সবগুলো অংশ যখন পরস্পর যুক্ত হবে সেগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রেণীবিন্যাস কায়েম করা হবে, তখন তাতে গতি আনার জন্য সেগুলোকে ঠিকমত চালাবার জন্য তাতে চাবি দেয়া আবশ্যক হয়।

বস্তুত ইসলামি জীবনব্যবস্থায় সলাত বা নামায সেই চাবির কাজ করে। দিনরাত পাঁচবার করে এ চাবি দেয়ার কাজ করতে হয়। তারপর এ ঘড়িকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করাও দরকার। সে জন্য সিয়াম ফরয করা হয়েছে। বছরে একবার করে ত্রিশ দিনের জন্য এটা সেই কাজ সমাধা করে। এ ঘড়িতে তেল দেয়া আবশ্যক, বছরে একবার যাকাত আদায় করে এ তেল দেয়ার কাজ করা হয়। এ তেল বাইরে থেকে আমদানী করা হয় না, এ ঘড়িরই কোনো অংশ এটা তৈরি করে এবং অন্যান্য শুকনা অংশগুলোকে চলাবার যোগ্য করে দেয়। ঘড়িকে মাঝে মাঝে ওভারহল করাও দরকার হয়, জীবনে একবার হজ্জ করলে এ ওভারহলিং এর কাজ সম্পন্ন হয়।

এখন সকলেই বুঝতে পারি, এ চাবি দেয়া, পরিস্কার করা, তেল দেয়া এবং ওভারহলিং করা ঠিক তখনি সার্থক হতে পারে, যখন এ ঘড়ির মধ্যে কেবল ঘড়িরই অংশগুলো পরস্পর যুক্ত ও সুবিন্যস্ত থাকবে, যেভাবে ঘড়ির নির্মাতা তা সাজিয়ে দিয়েছে। ঠিক এমন অবস্থায় চাবি দিলেই তা সঠিকভাবে চলতে পারে এবং ঠিকমত সময় নির্দেশ করতে পারে।

একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবো যে, বর্তমান সময় ইসলামের অবস্থা এদিক দিয়ে বড়ই খারাপ। প্রথমত যে জামায়াত গঠনের মাধ্যমে ইসলামের সমস্ত অংশ পরস্পর জুড়ে দেয়া হয়েছিল, সেই জামায়াতের অস্তিত্ব এখন নেই। ফলে সব অংশগুলোই আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। ঐক্য শক্তি বিলুপ্ত হয়েছে। এখন যার যা ইচ্ছা সে তাই করে যাচ্ছে। কেউ বাধা দেবার নেই, সঠিক পথ দেখাবার কেউ নেই। ইচ্ছা হলে ইসলামের আইন মেনে চলে, না হয় ইসলাম ত্যাগ করে ভিন্ন পথ অনুসরণ যন্ত্রাংশ বের করে নিজ নিজ ইচ্ছামত অনেক বাইরের যন্ত্রাংশ এতে যোগ করেছে, যা কোনক্রমেই এ ঘড়ির অংশ হতে পারে না। কেউ সিঙ্গার মেশিনের অংশ ঢুকিয়ে দিয়েছে, কেউ কম্পিউটারে যন্ত্র তাতে লাগিয়ে দিয়েছে, আবার কেউ কেউ মোটর গাড়ীর কতক অংশ তাতে লাগিয়ে দিয়েছে। এখন এর

একদিকে মুসলিম, অন্যদিকে সুদী কারবার চালাচ্ছে, ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে জীবন বীমা করেছে, কুরআনের আইনের বিপরীত আইনের ভিত্তিতে গড়া আদালতে মিথ্যা মোকদ্দমা চালাচ্ছে। নিজেদের মেয়ে, বোন আর স্ত্রীদেরকে ফ্যাশনের নামে বেপর্দা করছে। নিজেদের সন্তানদেরকে জড়বাদী শিক্ষা দান করছে। এদিকে মার্কস ও লেলিনের অনুকরণ করাচ্ছে। মোটকথা, ইসলাম-বিরোধী অসংখ্য জিনিস এনে স্বয়ং মুসলিমগণই ইসলামের এ ঘড়ির সাথে জুড়ে দিয়েছে।

এসব অবাঞ্ছনীয় কাজ করার পরও যদি কেউ আশা করে যে, চাবি দিলেই ঘড়ি ঠিকমত চলবে, আর যে উদ্দেশ্যে ঘড়ি বানানো হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যও এটা দ্বারা সফল হবে, আর পরিচ্ছন্ন করে তেল দেয়া এবং ওভারহলিং করায় যে ফল পাওয়া উচিত, তাও যদি কেউ এটা দ্বারা পেতে চায়, তবে তাকে চরম নির্বোধ ছাড়া কি-ই বা বলা যেতে পারে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই অনায়াসে বুঝা যায় যে, বর্তমানে এ ঘড়ির (ইসলামের) যে দশা হয়েছে, তাতে জীবন ভর চাবি দিলে, পরিষ্কার করলে এবং তেল দিতে থাকলেও এর আসল উদ্দেশ্য কিছুতেই হাসিল হতে পারে না। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য মেশিনের অংশগুলো এর মধ্যে থেকে বের করা না হবে এবং সেই স্থানে এর আসল অংশগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত ঠিকভাবে সাজিয়ে দেয়া না হবে-প্রথম ঘড়ি প্রস্তুত করার সময় যেমন সাজান হয়েছিল-ততক্ষণ পর্যন্ত এর দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য লাভ করার কোনো আশাই করা যায় না।

- বিষয়টি খুব ভাল করে বুঝে নেয়া আবশ্যক। মুসলিমদের সলাত, সিয়াম, হজ্জ ও যাকাত ঠিকমতো কাজ না হওয়ার এটা একটা বড় কারণ। প্রথমত তাদের যাকাত দেয় ও হজ্জ করে। জামায়াতী বন্ধন ও শৃঙ্খলা চূর্ণ হয়ে যাওয়ার ফলে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ একেবারে স্বেচ্ছাচারী হয়ে গিয়েছে। ইসলামের এ ফরযগুলো কেউ আদায় করছে কিনা তা জিজ্ঞেস করার কেউ নেই। অতঃপর যারা তা আদায় করে তারাই বা কিভাবে আদায় করে? আজ জামায়াতের সাথে সলাত আদায় করার প্রচলন প্রায় নেই, বেশীর ভাগ মসজিদগুলোতে ফজর, যোহর, আসর ওয়াক্তে ঠিকমতো মুসল্লীদের এক কাতারও হয় না। কোথাও জামায়াতের ব্যবস্থা থাকলেও সেখানকার মসজিদে এমন লোককে ইমাম নিযুক্ত করা হয়, যার দ্বারা দুনিয়ার অন্য কোনো কাজ সমাধা হতে পারে না-সেই যোগ্যতাও তার নেই। যারা মসজিদকে ফিতনার জায়গা বানিয়েছে, যারা জ্ঞান ও ইলমের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ, নৈতিক শক্তিহীন এবং চরিত্রের দিক দিয়ে বড় অনগ্রসর,

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এধরণের লোকেরাই মসজিদ কমিটির মেম্বার চেয়ারম্যান হচ্ছেন। এসব কমিটি থেকে এমন লোকদের ইমাম পদে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে যারা সকল মুসলিমকে আল্লাহর খাঁটি খলীফা আর দুনিয়ায় আল্লাহর সৈনিকে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সঠিক নেতৃত্ব দেবার যোগ্য নন। এভাবে সলাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্জের যে অবস্থা আজকাল হয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়।

আজ মুসলিমদের দ্বীনি কাজকর্ম নিষ্ফল হচ্ছে কেন? বর্তমান দুরবস্থার জন্য মুসলিমদের মনে নিশ্চয়ই দুঃখ আছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাও সত্য যে, বর্তমান মুসলিমদের মধ্যে হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন লোক রয়েছে যারা এ দুরবস্থা দূর করার জন্য চেষ্টা করতে মোটেই রাজি নয়। ইসলামের এ ঘড়ির ভিতরের কলকব্জা পরষ্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকেই নিজেদের মর্জী মত এক একটা নূতন অংশ এতে লাগিয়ে দিয়েছে, একে সংশোধন করতে অর্থাৎ অন্য মেশিনের অংশগুলো বের করে এবং এর আসল অংশগুলোকে যথাযথ সাজিয়ে একে ঠিক করতে আজ মুসলিমগণ সম্পূর্ণ নারাজ। এমনকি, কেউ তা করতে চাইলেও এরা তাকে সহ্য পর্যন্ত করতে পারে না।

কারণ অন্য মেশিনের জিনিসগুলো যখন এর মধ্যে থেকে বের করা হবে, তখন প্রত্যেকের প্রিয় জিনিস বের হয়ে যাবে। এজন্য অনেকে চায় যে, এ ঘড়ি যেমন আছে তেমনি ঝুলতে থাকুক, আর দূর হতে লোকেরা দেখে এটাকে ঘড়ি মনে করে প্রতারিত হতে থাকুক তাতে কিছু যায় আসে না। পক্ষান্তরে যারা অকর্মণ্য ঘড়িকে অত্যন্ত ভালবাসে, তারা এতে খুব ঘন ঘন চাবি দিতে আর একে পরিষ্কার করতেই মশগুল। কিন্তু কোনো দিন ভুলক্রমে এর অংশগুলো ঠিকমত সাজাতে এবং অন্য মেশিনের জিনিসগুলো বের করে ফেলতে প্রস্তুত হবে না, এটা সত্যই দুঃখের কথা।

বর্তমান অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের সাথে তাহাজ্জুদ প্রভৃতি সলাতও যদি পড়া হয়, পাঁচ ঘণ্টা করে দৈনিক কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, রমাদান ছাড়াও বছরে অবশিষ্ট এগার মাসের সাড়ে পাঁচ মাসও যদি নফল সিয়াম রাখা হয় তবুও কোনো ফল হবে না। তবে ঘড়ির মধ্যে তার আসল কলকব্জা ঠিকমত লাগিয়ে সামান্য একটু চাবি দিলেই তা চলতে থাকবে, আর সঠিকভাবে সময়ও নির্দেশ করতে পারবে। তখন খানিকটা পরিষ্কার করা আর কয়েক ফোঁটা তেল দিলেও অনেক সুফল লাভ করা যাবে। অন্যথায় সারাজীবন ভরে চাবি দিলেও এ ঘড়ি কখনো চলবে না এবং এর দ্বারা আসল উদ্দেশ্য লাভ করাও যাবে না।

সলাতে মন এদিক-সেদিক কেন যায়?

মনোবিজ্ঞানীদের ভাষ্যমতে আমাদের মন সরাসরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। আমাদের শরীর সরাসরি আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। ইচ্ছে করলেই আমরা পারি আমাদের হাতকে উর্ধ্বমুখী করতে, আবার খেয়াল-খুশি মত নিম্নে নামাতে। সহজ ভাষায় বলা যায় আমাদের মনোভাব অনুযায়ী সব আদেশ নিষেধ শরীর গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু আমাদের চালিকা শক্তি মন আমাদের নিয়ন্ত্রণ খুব একটা গ্রাহ্য করে না। আমরা অধিকাংশ মানুষ হয়তো লক্ষ্য করে থাকবো মন স্থির নয়, বরং সর্বদা চলমান।

উদাহরণস্বরূপ ঃ সদ্য পরীক্ষায় অংশ নেয়া একজন ছাত্রের কথা বলা যায়। যখন ছাত্রটি পরীক্ষা শেষ করে সলাতে দাঁড়ায়, তার মাথার মধ্যে আপনা- আপনি পরীক্ষা মূল্যায়নের বিষয়টি চলে আসে। সে সলাতের মধ্যে চোখ বুলায় প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্রের দিকে। মিলিয়ে নেয় কি চাওয়া হয়েছে আর সে কি লিখেছে। সর্বোপরি সে তার পুরো পরীক্ষার উপর একটি সার্বিক মূল্যায়ন করে নেয়। অনুরূপভাবে একজন ব্যবসায়ী যখন সলাতে দাঁড়ায় তার মনোযোগ চলে যায় ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে। 'আজ কত বিক্রি হল' অথবা 'আজকের লভ্যাংশটা বেশ ভালই'। সম্ভবতঃ একথাগুলোই সে অবচেতন মনে আউড়ে যায়। এ ধারার বাইরে কেউ নয়; এমনকি একজন গৃহবধু, সে-ও সলাতে দাঁড়িয়ে ভাবে "তাহলে আজকে কি রান্না করা যায়; ভাত, পোলাও নাকি বিরিয়ানী?"

এভাবে সার্বিকভাবে বলা যায়- যখনই আমরা সলাতে দাঁড়াই, আমাদের মন তখনই উড়াল দেয় এখানে-সেখানে। কিন্তু প্রশ্ন আসে কেন এমন হয়? কেন আমরা পারি না মনকে বেঁধে রাখতে? উত্তরটা হলো মনের শূন্যতা। আরো খোলাসা করে বলা যায়, যখন আমরা সলাতে দাঁড়াই মনকে তখন কোন কাজ দিই না। কিন্তু মন কোন কাজ ছাড়া থাকতে পারে না। তাই মন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়।

সলাত মনকে কিভাবে স্থির রাখা যায়?

বেশির ভাগ সলাত আদায়কারী সলাতের মধ্যে যে অংশগুলো তিলাওয়াত করে থাকে যথা সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরার অংশ, সেগুলো তারা পুরোপুরি মুখস্ত করে ফেলে, এমনকি তারা ঘুমের মধ্যেও পড়ে যেতে পারে।

একজন মুসলিম সূরা ফাতিহা অবচেতন মনেও অবলীলায় অতি দ্রুত তিলাওয়াত করতে পারে। এই যে যান্ত্রিকতা বা স্বতঃস্ফূর্ততা এর কারণে তেলাওয়াতের

সময় তার মস্তিষ্কের খুব ক্ষুদ্র অংশ ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু বেশিরভাগ মুসলিম সলাতের মধ্যে যে অংশগুলো তিলাওয়াত করে সে অংশসমূহের কোন অর্থ জানে না। যেহেতু তারা আরবি জানে না এবং অর্থও বুঝে না, সে কারণে অবচেতনভাবেই তার মন এদিক-সেদিক চলে যায়।

এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজন মনকে কাজ দেয়া বা ব্যস্ত রাখা। তাই সলাতে পবিত্র কুরআন থেকে যখন যে অংশ তিলাওয়াত করা হয়, তার অর্থ ও বিশ্লেষণের কাজে মনোনিবেশ একটি উত্তম প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করতে পারে। যদি আমি কথা বলি ইংরেজিতে তাহলে সূরার অর্থ করবো ইংরেজিতে, আর যদি বাংলায় কথা বলি তাহলে অর্থ করবো বাংলাতে। অনুরূপভাবে যে ভাষাটি আমি সবচেয়ে বেশি বুঝি সেই ভাষায় তিলাওয়াতকৃত অংশটুকু অনুবাদ করা। উদাহরণস্বরূপ ফাতিহা তিলাওয়াতের সময়—

"পরম করুণাময় অশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সারা জাহানের রব।
২. যিনি পরম করুণাময়, অশেষ দয়ালু।
৩. বিচার দিনের মালিক।
৪. আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি। আর একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য চাই।
৫. আমাদের সহজ সরল-সঠিক পথ দেখাও।
৬. ঐসব লোকের পথ, যাদের তুমি নিয়ামত দিয়েছ।
৭. তাদের পথ নয় যারা অভিশপ্ত এবং পথহারা।"

এভাবে যদি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত এর সাথে সাথে তার অর্থটি অনুধাবনের প্রয়াস চালানো হয়, তবে আমাদের মস্তিষ্ক কাজ পাবে। যখন মস্তিষ্ক তিলাওয়াতকৃত অংশটুকু অনুবাদের কাজে ব্যস্ত থাকবে, তখন সে আর এদিক সেদিক ছুটাছুটি করবে না।

এক কথায় বলা যায় মস্তিষ্ক কুরআন তিলাওয়াত ও এর অনুবাদ এ দু'টি কাজে নিবদ্ধ করে অর্থের প্রতি শতভাগ মনোযোগ নিবদ্ধ করলে আল্লাহ চাহেতো স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মনের বেখেয়ালি চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে।

৯ম পরিচ্ছেদ

আমাদের তরুণ প্রজন্ম কি জানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদীর চরিত্র

একজন আমেরিকান গবেষক এবং লেখক মাইকেল. কে. হার্ট ‘দি হান্ড্রেস্’ (The Hundrends) নামে একটি বই লিখেছেন। তিনি আদম (আ.) থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যতো মানুষ পৃথিবীতে এসেছে তাদের মধ্যে কোয়ালিটির দিক দিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে গবেষণা (এনালাইসিস) করে একটি তালিকা (লিস্ট) করেছেন এবং সেখানে ১০০ জন ব্যক্তিত্বের স্থান পেয়েছেন। তার মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে তালিকার প্রথমে আছেন আমাদের শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.)। আসুন আমরা তাঁর চরিত্র সম্পর্কে কিছু দিক আমাদের তরুণ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরি।

রসূল (সা.)-এর স্বভাব চরিত্র

- রসূল (সা.)-এর গোটা জীবনই সৎ চরিত্রের নামান্তর।
- তিনি সবার চেয়ে ন্যায়পরায়ণ, দানশীল ও বীর ছিলেন।
- সারা জীবনেও কাউকে কোন কষ্ট দেননি।
- অন্যদের অত্যাচারের কোন প্রতিশোধ নেননি।
- সবাইকে সবসময় ক্ষমা করেদিয়েছেন।
- তিনি জীবনে কোনদিন মিথ্যা কথা বলেননি।

- জীবনে কোনদিন কোন অন্যায় করেননি।

রসূল (সা.)-এর কথা বার্তা

- মেযাজে গাম্ভীর্য যেমন ছিল, তেমনি ছিল হাসি তামাসা ও রসিকতা। পরস্পর বিরোধী গুণাবলীতে তাঁর বিস্ময়কর ভারসাম্য ছিল।
- তিনি মনগড়া কিছু বলতেন না।
- কথা বলার সময় প্রতিটি শব্দ ধীরে ধীরে ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন যে, শ্রোতা তা সহজেই মুখস্থ করে ফেলতো।
- বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না।
- প্রয়োজনের চেয়ে কথা বেশীও বলতেন না, কমও বলতেন না। বেশী সংক্ষিপ্তভাবেও বলতেন না, অতিরিক্ত লম্বা করেও বলতেন না।
- কথার উপর জোর দেয়া, বুঝানো এবং মুখস্থ করার সুবিধার্থে বিশেষ বিশেষ কথা ও শব্দকে তিনবার করে উচ্চারণ করতেন।
- অশোভন, অশ্লীল ও নির্লজ্জ ধরনের কথাবার্তাকে ঘৃণা করতেন। কথাবার্তার সাথে সাধারণত একটি মুচকি হাসি উপহার দিতেন।
- কোন কথা বুঝানোর ব্যাপারে হাত ও আংগুলের ইশারা দিয়েও সাহায্য নিতেন।

রসূল (সা.)-এর বক্তৃতার নমুনা

- এ কথা কি সত্য নয় যে, তোমরা প্রথমে পথভ্রষ্ট ছিলে;
- অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের সুপথে পরিচালিত করলেন?
- তোমরা কতটা বিচ্ছিন্ন ছিলে;
- আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন?
- তোমরা দরিদ্র ছিলে;
- আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের স্বচ্ছল বানিয়েছেন?

- (প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে আনসারগণ বলছিলেন, নিঃসন্দেহে আমাদের উপর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনেক দান রয়েছে ।) (সহীহ বুখারী)

রসূল (সা.)-এর সামাজিক যোগাযোগ

সমাজের ব্যক্তিবর্গের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রক্ষা করতেন । জন বিচ্ছিন্নতা, ধাম্ভিকতা বা রুক্ষতার নামগন্ধও তাঁর মধ্যে ছিল না ।

সালামের প্রচলন

- তাঁর রীতি ছিল পথে যার সাথে দেখা হোক প্রথমে সালাম দেয়া ।
- কাউকে কোন খবর দিতে হলে সেই সাথে সালাম পাঠাতে ভুলতেন না ।
- তাঁর কাছে কেউ কারো সালাম পৌঁছালে সালামের প্রেরক ও বাহক উভয়কে পৃথক পৃথকভাবে সালাম দিতেন ।
- বাড়ীতে প্রবেশকালে ও বাড়ী থেকে বেরুবার সময় পরিবার পরিজনকে সালাম দিতেন ।
- বন্ধুবান্ধবদের সাথে হাতও মিলাতেন, কোলাকুলিও করতেন । হাত মিলানোর পর অপর ব্যক্তি হাত না সরানো পর্যন্ত তিনি হাত সরাতেন না ।

বৈঠকের আদব

- যখন বৈঠকাদিতে যেতেন, তখন সাহাবীগণ তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়াক, এটা পছন্দ করতেন না । বৈঠকের এক পাশেই বসে পড়তেন । ঘাড় ডিংগিয়ে ভেতরে ঢুকতেন না ।
- কেউ তাঁর কাছে এলে তাঁকে নিজের চাদর বিছিয়ে বসতে দিতেন । আগন্তুক নিজে না ওঠা পর্যন্ত তিনি বৈঠক ছেড়ে উঠতেন না ।
- বৈঠকের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ দিতেন, যাতে কেউ অনুভব না করে যে, তিনি তার উপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দিচ্ছেন ।

অসুস্থ ব্যক্তি (রোগী)-কে দেখতে যাওয়া

- রোগী দেখতে যেতেন যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ।

- শিয়রে বসে জিজ্ঞাসা করতেন তুমি কেমন আছ?
- রুগ্ন ব্যক্তির কপালে ও ধমনীতে হাত রাখতেন। কখনোবা বুকে, পেটে ও মুখমন্ডলে স্বস্নেহে হাত বুলাতেন।
- রোগী কী খেয়েছে জিজ্ঞাসা করতেন।
- সে কোন কিছুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করলে তা ক্ষতিকর না হলে এনে দিতেন।
- সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলতেন ঃ 'চিন্তার কোন কারণ নেই, আল্লাহ্ চাহেন তো অচিরেই তুমি রোগমুক্ত হবে।'
- রোগ মুক্তির জন্য দু'আ করতেন।

মৃত ব্যক্তির প্রতি যা করতেন

- কেউ মারা গেলে সেখানে চলে যেতেন।
- মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে সমবেদনা জ্ঞাপন করতেন।
- ধৈর্যের উপদেশ দিতেন এবং চিৎকার করে কাঁদতে নিষেধ করতেন।
- সাদা কাপড়ে কাফন দিতে তাগিদ দিতেন এবং দাফন কাফন দ্রুত সম্পন্ন করতে বলতেন।
- দাফনের জন্য লাশ নিয়ে যাবার সময় সাথে সাথে যেতেন।
- মুসলিমদের জানাযা নিজেই পড়াতেন এবং গুনাহ্ মাফ করার জন্য দু'আ করতেন।
- তিনি প্রতিবেশীদের উপদেশ দিতেন মৃতের পরিবারের জন্য খাবার পাঠাতে।

শিশুদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা

- শিশুদের সাথে রসূল (সা.)-এর খুবই ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল।
- শিশু দেখলেই তার মাথায় হাত বুলাতেন, আদর করতেন, দু'আ করতেন।
- একেবারে ছোট শিশু কাছে পেলে তাকে কোলে নিয়ে নিতেন।

- শিশুদের নাম রাখতেন।
- কখনো কখনো শিশুদেরকে লাইনে দাঁড় করিয়ে পুরস্কারের ভিত্তিতে দৌঁড়ের প্রতিযোগিতা করাতেন যে, দেখবো কে আগে আমাকে ছুঁতে পারে। শিশুরা দৌঁড়ে আসতো।
- শিশুরা কেউ তার পেটের উপর আবার কেউ বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তো।
- শিশুদের সাথে হাসি তামাশা করতেন।
- প্রবাস থেকে আসার পথে যে শিশুকে পথে দেখতেন, সওয়ারীর পিঠে চড়িয়ে আনতেন। শিশু ছোট হলে সামনে এবং বড় হলে পেছনে বসাতেন।
- মৌসুমের প্রথম ফসল ফলমূল আনা হলে তা বরকতের দু'আসহ কোন শিশুকে আগে খেতে দিতেন।

বয়স্কদের ও অন্যান্যদের প্রতি ব্যবহার

- বুড়ো মানুষদের খুবই শ্রদ্ধা করতেন এবং সাহায্য করতেন।
- তিনি কখনো স্ত্রী বা চাকর চাকরানীদের মারেননি।
- তিন বিধবাদের সবসময় সাহায্য করতেন।

রসূল (সা.)-এর ব্যক্তিগত জীবন

- নিজের কাপড় চোপড়ের তদারকী নিজেই করতেন।
- ছাগলের দুধ নিজেই দোহাতেন এবং নিজের প্রয়োজনীয় কাজগুলো নিজেই করতেন।
- কাপড়ে তালি লাগাতে হলে নিজেই লাগাতেন, জুতো মেরামত করতেন।
- বোঝা বহন করতেন, পশুকে খাদ্য দিতেন।
- কোন চাকর থাকলে তার কাজে সাহায্য করতেন।
- কখানো কোন চাকরকে ধমক পর্যন্ত দেননি।

- বাজারে যেতে কখনো লজ্জা বোধ করতেন না, নিজেই বাজার সদাই করে আনতেন।
- আপন পরিবার পরিজনের সাথে সহৃদয় আচরণে তার কোন জুড়ি ছিল না।

রসূল (সা.)-এর আবেগ ও অনুভূতি

- রসূল (সা.)-এর মধ্যেও মানবীয় অনুভূতি সর্বোত্তম পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল।
- তিনি ছিলেন তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ।
- আনন্দে আনন্দিত ও দুঃখে বেদনায় ব্যথিত হতেন।
- মহিয়ষী জীবন সংগিনীদের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা ছিল।
- নিজের সন্তানদের প্রতিও স্নেহ মমতা ছিল অত্যন্ত গভীর।
- মেয়ে ফাতিমা (রা.)-এর দু'ছেলে হাসান ও হোসাইন (রা.)-কে অত্যধিক স্নেহ করতেন। তাদের কোলে নিতেন, ঘাড়ে উঠাতেন এবং নিজে ঘোড়া সেজে পিঠে চড়াতেন। সলাতের সময়ও তাদের ঘাড়ে উঠতে দিতেন।
- কোমল হৃদয় এবং এত আবেগভরা মন নিয়েও রসূল (সা.) কঠিন বিপদ মুসিবতে ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন।

রসূল (সা.)-এর কয়েকটি চমৎকার অভিরুচি

- কোন জিনিস দেয়া ও নেয়ার কাজ ডান হাত দিয়েই সম্পন্ন করতেন।
- চিঠি লিখতে হলে সর্বপ্রথম বিসমিল্লাহ লিখাতেন।
- রসূল (সা.) কল্পনা বিলাসিতা থেকে মুক্ত ছিলেন এবং কোন 'শুভ লক্ষণ' বা 'অশুভ লক্ষণে' বিশ্বাস করতেন না।
- ব্যক্তি ও স্থানের ভালো অর্থবোধক ও শ্রুতি মধুর নাম পছন্দ করতেন। খারাপ নাম পছন্দ করতেন না।
- হৈ চৈ ও হাঙ্গামা পছন্দ করতেন না।
- সব কাজে ধীর স্থির থাকা, নিয়ম শৃংখলা ও সময়ানুবর্তিতা ভালোবাসতেন।

রসূল (সা.)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট

রসূল (সা.)-কে 'জাওয়ামিউল কালিম' দ্বারা ভূষিত করা হয়েছিল। রসূল (সা.)-এর যে সংক্ষিপ্ততম বাক্যগুলো ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে তাকেই বলা হয় 'জাওয়ামিউল কালিম'। কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ

- মানুষ যাকে ভালোবাসে, কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে।
- মুসলিম হও শান্তিতে থাকতে পারবে।
- নিয়ত অনুসারে কাজের বিচার হবে।
- যে কাজ করে, সে কেবল আপন নিয়ত অনুযায়ীই তার ফল পাবে।
- দেখা ও শোনা এক কথা নয়।
- বৈঠকের জন্য বিশ্বস্ততা জরুরী।
- খারাপ কাজ বর্জন করাও একটা ভালো কাজ।
- জনগণের যিনি সেবা করেন, তিনিই তাদের নেতা।
- প্রত্যেক সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা হয়।
- ভালো কথা বলাও সৎ কাজের শামিল।
- যে দয়া করে না সে দয়া পায় না।

রসূল (সা.)-এর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ঃ ইসলাম কী?

উত্তর ঃ ভালো কথা বলা ও ক্ষুধার্তদের খাওয়ানো।

প্রশ্ন ঃ ঈমান কী?

উত্তর ঃ ধৈর্য ও দানশীলতা।

প্রশ্ন ঃ কার ইসলাম সর্বোত্তম?

উত্তর ঃ যার জিহ্বা ও হাতের বাড়াবাড়ি (অর্থাৎ মন্দ কাজ ও মন্দ কথা) থেকে মানুষ নিরাপদে থাকে ।

প্রশ্ন ঃ কার ঈমান উৎকৃষ্ট?

উত্তর ঃ যার চরিত্র ভালো তার ।

প্রশ্ন ঃ কি ধরনের সলাত উত্তম?

উত্তর ঃ যে সলাতে বিনয়ের সাথে দীর্ঘ সময় দাঁড়ানো হয় ।

প্রশ্ন ঃ কি ধরনের হিজরত উত্তম?

উত্তর ঃ তোমার প্রতিপালকের অপছন্দনীয় জিনিসগুলোকে চিরতরে পরিত্যাগ করা ।

প্রশ্ন ঃ কোন সময়টা সর্বোত্তম?

উত্তর ঃ রাতের শেষ প্রহর ।

প্রশ্ন ঃ প্রধানত কোন জিনিস মানুষের জন্য জাহান্নাম অনিবার্য করে তোলে?

উত্তর ঃ মুখ ও লজ্জাস্থান । (তিরমিযী)

বিদায় হাজ্জের ভাষণে মানব কল্যাণের জন্য মুহাম্মাদ (সা.)-এর শেষ নির্দেশ

১. জাহিলিয়াতের (অজ্ঞতার) যুগের সমস্ত অন্ধ বিশ্বাস এবং প্রথা, অনাচার, কুসংস্কার আমার পায়ের নীচে দলিত মথিত হলো ।

২. অজ্ঞতার যুগের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ আজ থেকে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল ।

৩. অজ্ঞতার যুগের সুদ প্রথাও বন্ধ করে দিলাম ।

৪. একজন অপরাধ করলে আরেকজনকে শাস্তি দেয়া তথা পিতার অপরাধের কারণে সন্তানকে বা সন্তানের অপরাধের কারণে পিতাকে কোন শাস্তি দেয়া যাবে না ।

৫. যদি কোন নাক কাটা কালো নিগ্রো গোলামকেও তোমাদের নেতা নির্বাচন করা হয় এবং সে যদি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে, তাহলে তোমরা তাঁর আনুগত্য করবে । তাঁর নির্দেশ পালন করবে ।

৬. সাবধান! দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে সীমা লংঘন করো না। এই সীমা লংঘনের কারণে অতীতে অনেক জাতি ধবংশ প্রাপ্ত হয়েছে।

৭. মনে রেখো, তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে হবে এবং সমস্ত কর্মের হিসাব তাঁর কাছে দিতে হবে।

৮. সাবধান! আমার পরে তোমরা পথ ভ্রষ্ট হয়ে কাফিরদের মত একে অপরের রক্তপাত করো না।

৯. সাবধান! তোমাদের পরস্পরের ধন-সম্পদ পরস্পরের কাছে আজকের পবিত্র দিনের মত, এই পবিত্র মাসের মত এবং এই পবিত্র মক্কার মতই পবিত্র।

১০. জেনে রেখো, আরবদের উপরে অনারবদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অনারবদের আরবদের উপরে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

১১. সবাই আদমের সন্তান আর আদম হলো মাটি থেকে সৃষ্টি। মনে রেখো, এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই এবং সমস্ত মুসলিমদের নিয়ে একটা অবিচ্ছেদ্য সমাজ।

১২. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না।

১৩. ন্যায়ের ভিত্তি ব্যতীত তোমরা কাউকে হত্যা করো না।

১৪. অপরের দ্রব্য আত্মসাৎ করো না।

১৫. ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না।

১৬. আমি তোমাদের কাছে যা রেখে যাচ্ছি, তা যদি দৃঢ়ভাবে ধারণ করে রাখো, তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব এবং আমার প্রদর্শিত পথ রেখে যাচ্ছি। (অর্থাৎ রসূলের সুন্নাত)

১৭. নারীদের সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করছি, তাদের সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করার ব্যাপারে আল্লাহর আযাবকে ভয় করো।

১৮. তোমরা তাদেরকে (তোমাদের স্ত্রীদেরকে) আল্লাহর জিম্মাদারীতে গ্রহণ করেছো। আল্লাহর নির্দেশের আওতায় তোমরা নিজেদের জন্য তাদেরকে বৈধ করে নিয়েছো।

১৯. তোমাদের স্ত্রীর উপর যেমন তোমাদের অধিকার রয়েছে, তেমনি তাদেরও তোমাদের উপর অধিকার রয়েছে। মনে রেখো, তোমরাই তাদের আশ্রয়।

২০. আমি তোমাদেরকে তোমাদের দাস-দাসী সম্পর্কে সাবধান করছি। তাদের উপরে কোন ধরণের নির্যাতন করবে না। তাদের সাথে এমন ব্যবহার করো না যে, তারা মনে আঘাত পায়। তোমরা যা আহার করবে, তোমরা যা পরিধান করবে তাদেরকেও তাই আহার করাবে এবং তাই পরিধান করাবে।

২১. হে উপস্থিত জনমন্ডলী! শয়তান হতাশ হয়েছে। কারণ আরবে সে আর কোনদিন পূজা লাভ করবে না। কিন্তু সাবধান! তোমরা যাকে ছোট মনে করো, তার ভেতর দিয়েই শয়তান তোমাদের মহাক্ষতি সাধন করে। তোমরা এ সম্পর্কে সতর্ক হও।

২২. হে মানুষ! আমার পরে আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না। তোমাদের পরে আর কোন নতুন উম্মত সৃষ্টি হবে না। এই বছরের পরে তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়ত আর হবে না। সুতরাং জ্ঞান অপসৃত হবার পূর্বেই আমার কাছে হতে শিক্ষা গ্রহণ করো।

আসুন নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনী বিস্তারিত পড়ে তাঁর সম্পর্কে জেনে নেই

- আর-রাহীকুল মাখতুম - আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী
- The Sealed Nectar - Allama Sofiur Rahman Mubarakpuri (Darussalam Publication)
- The Message - Movie : DVD
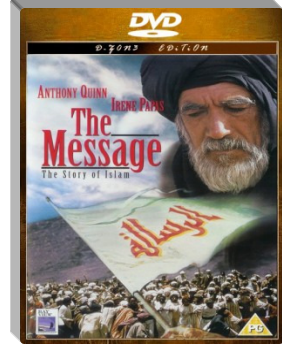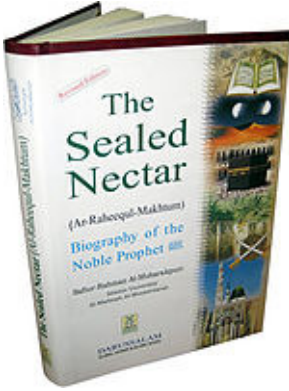
বিশেষ নোট ঃ বর্তমানে সারা বিশ্বে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিস্তারিত জীবনীর মধ্যে সবচেয়ে authentic গ্রন্থ হচ্ছে "আর-রাহীকুল মাখতুম"। সৌদি আরবে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনীর উপর একটি প্রতিযোগিতা হয়েছিল। সেখানে ১১৮২টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে সহীহ তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত এই "আর-রাহীকুল মাখতুম" "প্রথম" পুরষ্কার পায়। মূল বইটি আরবী ভাষায় লিখিত। তবে "আর-রাহীকুল মাখতুম"-এর অনুবাদ বিভিন্ন ভাষাতেই পাওয়া যায়। এর ইংলিশ সংস্করণ হচ্ছে The Sealed Nectar. এর বাংলা অনুবাদও পাওয়া যায়।

উপসংহার

শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলের মন এক চলমান মেশিন। এ মেশিন সর্বদা সচেতন ও অবচেতনমনে ইনপুট (Input) গ্রহণ করছে। সে ইনপুট প্রসেস (Process) হয়ে আউটপুট (Output) বেরোয় মানুষের কর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে। ফলে কেউ হয় দানশীল, কেউ উদ্ধত, কেউ হয় আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা আবার কেউ হয় বিপথগামী। আমার শিশু কোন না কোন কিছু শিখছে। প্রতিদিন সে নিত্য নূতন কায়দা রপ্ত করছে। এটা ভাবা যাবে না যে আমি যদি কিছু না শেখাই তাহলে কোথা হতে সে শিখবে? আসলে এই ধারণাটা ভুল। আশেপাশের পরিবেশ, টিভি, রেডিও, স্কুল-কলেজ, ইন্টারনেট, পত্র-পত্রিকা, আমার আচরণ, আমার স্ত্রীর আচরণ সবকিছু হতে প্রতিনিয়ত সে ইনপুট সংগ্রহ করছে।

সুতরাং আমি কি সতর্ক হবো না? আমি কি চাই না যে আমার শিশুর মনে ভাল উপাদানগুলি বেশী করে ঢুকুক? আমি কি চাই না যে আমার শিশু একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হোক? আমি কি চাই না যে সে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হয়ে পিতামাতার মুখ উজ্জ্বল করার পাশাপাশি কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে দ্বীনের উপর অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে অমুসলিমদের হিদায়াতের নূর দেখাক?

আসুন চোখ বন্ধ করে খানিক চিন্তা করি। হলিউড বলিউড বা এর অন্ধ অনুসারী অন্য টিভি চ্যানেলগুলি প্রতিনিয়ত মুভি আর বিচিত্র অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছে। বলিউডের প্রভাব এখন প্রযুক্তির আশীর্বাদে সর্বত্রই দৃঢ়ভাবে প্রসারিত। আমি এবং আমার সন্তানেরা প্রতিনিয়তই এগুলি হতে মনের খোরাক নিচ্ছি। শিশুরা অনুকরণ প্রিয় হবার কারণে এসব বিনোদনের মৌলিক বিষয়গুলির সাথে খুব সহজে পরিচিত হয়ে যাচ্ছে। এভাবেই তদের মননশীলতার উপর ঐসব উপাদানগুলির স্থায়ী প্রভাব পড়ছে। আসুন এবার চিন্তা করি এসব অখাদ্য কুখাদ্যের (অপসংস্কৃতির) বিপরীতে আমি নিজে ও আমার সন্তানরা কী ইনপুট নিচ্ছি? খোদ হলিউডের জন্মস্থান হতেই এখন এর কুরুচি আর বিকৃত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শ্লোগান উঠেছে। এর বদৌলতে ছেলেমেয়েরা বইয়ের চাইতে বন্দুকের প্রতি বেশী আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ড্রাগ, ভায়োলেন্স, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব, পারিবারিক বন্ধন শিথিল হওয়া ইত্যাদির অবদানে হলিউড সংস্কৃতি বেশ নাম করেছে।

হলিউড সংস্কৃতি আজ এমন এক টর্ণেডোর নাম যা সারা বিশ্বের আনাচে কানাচে লজ্জা শরমের অবশিষ্টাংশটুকুও ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে ফেলতে চায়। এক আমেরিকান আইডলই দুনিয়া কাঁপানোর জন্য যথেষ্ট। নিজেকে এবং আমার পরিবারকে এগুলি হতে বিরত রাখার দায়িত্ব আমারই। এটি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসের গভীরতার উপর নির্ভর করে। তবে সন্তানের চরিত্র গঠনে একটি ভারসাম্যপূর্ণ স্ট্রাটেজীর অংশ হিসেবে হলিউড-বলিউডের কুখাদ্যের পাশাপাশি যদি কিছু পুষ্টিকর ভালো খাবার সরবরাহ না করা হয় তাহলে এ সন্তানটি যে কি হবে তা এখন হয়তো আমরা বুঝবো না কিন্তু ভবিষ্যতে যখন বুঝবো তখন আর আমাদের করার কিছু থাকবে না। তখন চিন্তা করে বা চেষ্টা করেও কোন কুলকিনারা করা যাবে না। কারণ আমার শিশু তখন বড় হয়ে যুবক হয়ে গেছে। তার নিজস্ব মূল্যবোধ তৈরী হয়ে গেছে। এখন তার নতুন তাগুতি বিশ্বাস (conviction) ও মূল্যবোধের দাওয়াতী কাজের প্রথম টার্গেট হবো আমি নিজে ও আমার স্বামী/স্ত্রী। আমরা কবরে বসে তাদের কাছ থেকে কোন দু'আ পাবোনা।

হাইস্কুল পাস মেয়েরা আজকাল নিজেরাই একটা আদর্শ তৈরী করে নেয়। সেটি হতে পারে Rock n Roll এর আদর্শ, কিংবা আমেরিকান আইডলের আদর্শ, কিংবা ইন্ডিয়ান কোন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী গায়ক বা গায়িকার আদর্শ। শুধু তাই নয়, এর বাইরে সব কিছুকে তারা সেকেলে বা নিম্নস্তরের জিনিস বলে মনে করে। শুধু নিজেরা এই আদর্শ অনুসরণ করেই ক্ষান্ত হয়না, অন্যদেরকেও সে আদর্শের অনুসারী বানানোর চেষ্টা করে।

পিতামাতারা জেগে উঠুন, সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে, সঠিক ইসলামি শিক্ষায় নিজেদের ও সন্তানদের দীক্ষিত করার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। আর অবহেলা করবেন না।

সমস্যার সমাধান

আল কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

এটাই আমার সহজ পথ সুতরাং এ পথ ধরেই চল। অন্য পথে যাবে না। তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। (সূরা আন'আম ৬ ঃ ১৫৩)

যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদের অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সাথে থাকেন। (সূরা আনকাবুত ২৯ ঃ ৬৯)

যে কেউ আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্ম করে তার পুরষ্কার তার রবের (প্রতিপালকের) নিকট রয়েছে, এবং তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরা বাকারা ২ ঃ ১১২)

নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করে। (সূরা রা'দ ১৩ ঃ ১১)

মুমিনদের বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন তাদেরকে ফায়সালার জন্যে আল্লাহ ও রাসূলের (বিধানের) প্রতি ডাকা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর এরূপ লোকেরাই প্রকৃত সফলকাম। (সূরা নূর ২৪ ঃ ৫১)

যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার শক্তি দান করেন। (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ ঃ ১৭)

আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে (অনুগ্রহকে) সম্যকভাবে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম (মনোনীত করলাম)। (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৩)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও যার ইন্ধন (জ্বালানী) হবে মানুষ ও পাথর। (সূরা আত তাহরীম ঃ ৬)

সন্তানদেরকে এবং নিজ পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য পিতামাতাদের যে গাইডলাইন প্রয়োজন তা নিম্মের "ফ্যমিলি ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ" সংগ্রহ করে অনুসরণ করতে পারেন।

Family Development Package

(Social Engineering Series, Book 1 to 12)
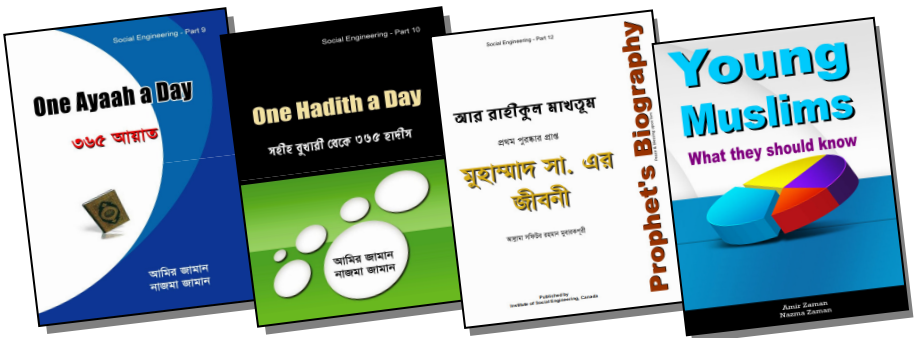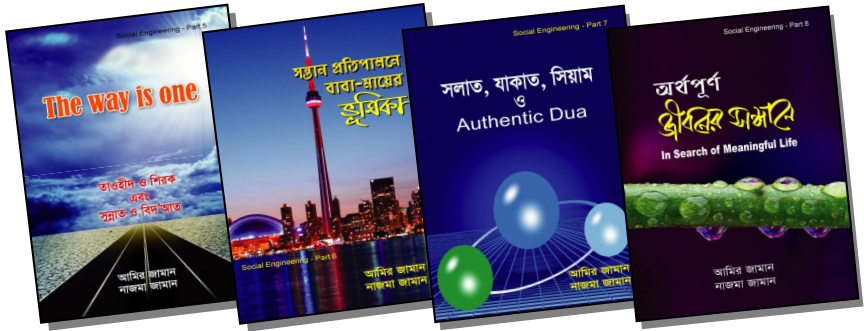
Acknowledgement

It is acknowledged that some of the texts were sourced online and from various other sources, and as such it was not possible to cite specific references. The sole objective of this book is Dawah in order to raise understanding and interfaith tolerance. There is no intent to achieve commercial or financial gains of any nature.

- কুফরীর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ - সালেহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান
- ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ইসলাম - ড. মানে‘ ইবন হাম্মাদ আল-জুহানী - অনুবাদ : মুহাম্মদ নূরুল্লাহ তারীফ
- নিফাকের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ - সালেহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান
- গান-বাদ্য ও এর কুপ্রভাব - আলী হাসান তৈয়ব
- পোশাক যখন বিপদের কারণ - আলী হাসান তৈয়ব
- অসহিষ্ণু মৌলবাদীর অপ্রিয় কথা - ড. আবু জাফর
- আবদুল আযীয ইবন মারযূক আত-ত্বারীফী
- সানাউল্লাহ নজির আহমদ
- শাহ আব্দুল হান্নান
- জাবেদ মুহাম্মাদ
- সারওয়ার কবীর শামীম
- ড. আবুল কালাম আজাদ
- আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান
- আব্দুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ
- ড. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া
- ড. এফ.এম.কামাল
- হায়াতুন্নবী চৌধুরী
- এনায়েত কবীর
- রাশেদ আহমেদ
- মিজানুর রহমান শামীম
- আবু সাইদ জিয়াউদ্দিন
- আব্দুর রাজ্জাক মিয়া
- এ.কে.এম. মনিরুজ্জামান
- শমশের আলী হেলাল
- www.islamhouse.com